মাসুদ রানা

ঝড়ের পূর্বাভাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

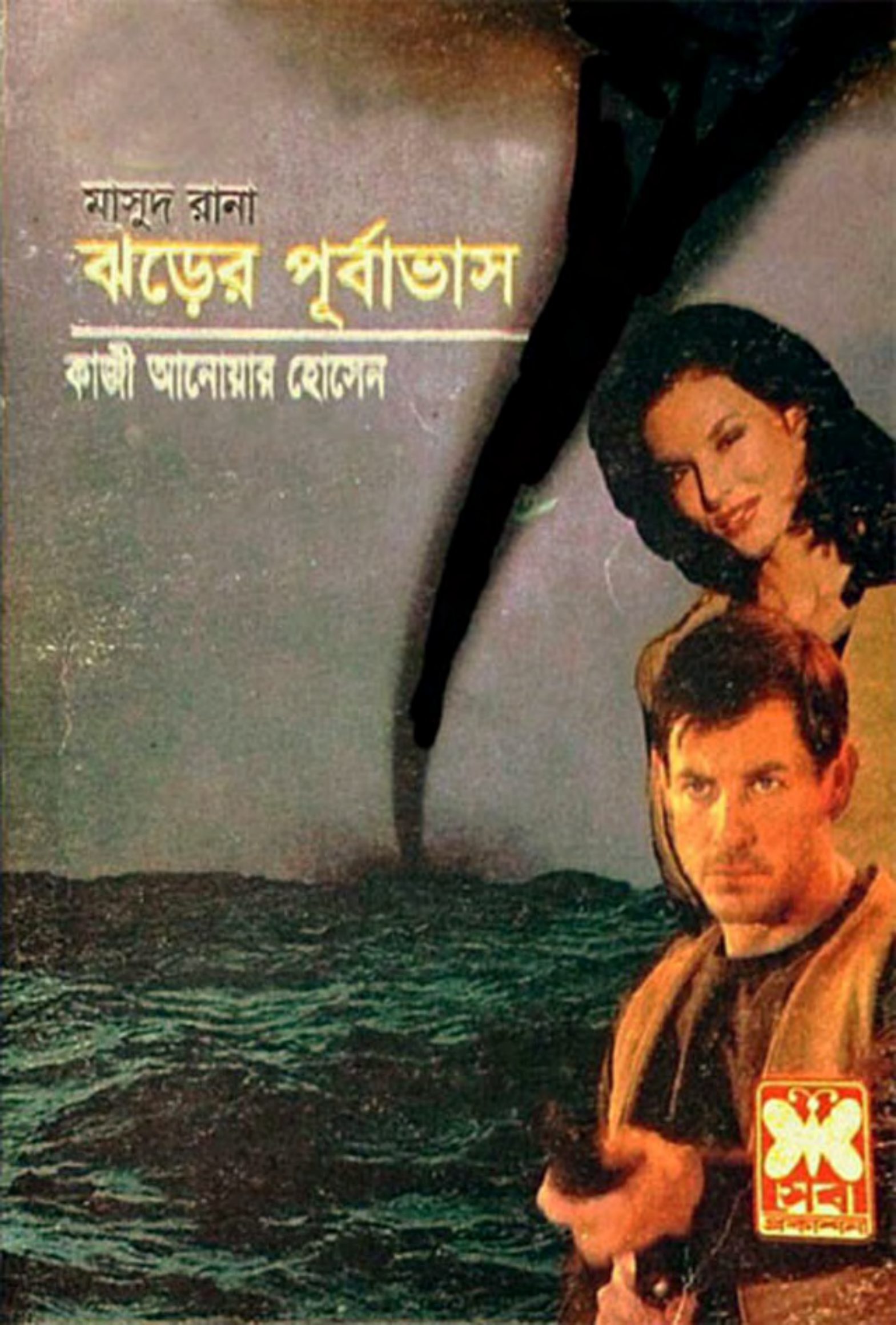

ঝড়ের পূর্বাভাস

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

ক্যারিবিয়ান সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ইউ. এস নেভির ছাপ মারা এক সুপার কনস্টিলেশন। গন্তব্য দক্ষিণ-পুবের কোথাও। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে চলেছে ওটা। নীল সাগরের বুকে আধখানা চাঁদের মত বিছিয়ে থাকা লেসার এন্টিলিস নামে পরিচিত সবুজ দ্বীপমালা পেরিয়ে চলেছে একটার পর একটা।

এ অঞ্চলের আবহাওয়া শান্ত। মেঘহীন ঝকঝকে আকাশ। তবে উপগ্রহের পাঠানো ছবি ও ডাটা বলছে—সামনের অবস্থা সুবিধের নয়।

আটলান্টিকের দিগন্তরেখার ওপাশে, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝামাঝি কোথাও অশান্তির বীজ মাথাচাড়া দিচ্ছে সাগরে। বিষুবরেখার উত্তরে। নাম হারিকেন। ওটা কতখানি শক্তিশালী, তার সুরতহাল টুকে আনতে যাচ্ছে কনস্টিলেশন। আকাশে উঠেছে খুদে ক্যারিবিয়ান দ্বীপ-রাষ্ট্র সান ফের্নান্দেজের আমেরিকান নৌ ঘাঁটি ক্যাপ সারাত থেকে।

পাইলট ইউ.এস নেভির এক লেফটেন্যান্ট কমান্ডার, নরম্যান লুইস। এখনও সে জানে না ঠিক কোথায় যেতে হবে তাকে, বা গন্তব্যে পৌঁছতে কত সময় লাগবে। পিছনের এক কম্পার্টমেন্টে বসা ওয়েদার স্পেশালিস্ট, ড্যানিয়েল জ্যাকবসনের নির্দেশে প্লেন চালাচ্ছে সে।

মানুষটা একে সিভিলিয়ান, তার ওপর আমেরিকানও নয়, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান। এমন একজনের নির্দেশ মেনে চলা কোন আমেরিকান নেভির লেফটেন্যান্ট কমান্ডারের জন্যে একটু কঠিনই বটে, তবে কাজটা যখন ওয়েদার মনিটরিঙ সম্পর্কিত, এবং জ্যাকবসন সে বিষয়ে ওস্তাদ বিশেষজ্ঞ, না মেনে উপায় কি? এ ক্ষেত্রে স্ট্যাটাস বড় নয়, বড় হচ্ছে উদ্দেশ্য সাধন। আগেও অনেকবার এ কাজ করতে হয়েছে লুইসকে। প্রথম প্রথম খারাপ লাগত, অস্বস্তি লাগত, এখন আর অতটা লাগে না। সয়ে গেছে।

আয়েশ করে নিজের সীটে বসে আছে সে, প্লেন চালাচ্ছে কো-পাইলট। নিচের লেসার এন্টিলিসের গাঢ় সবুজের সমারোহ দেখছে পাইলট দু'চোখ ভরে। ধীরগতিতে এক এক করে পিছিয়ে যাচ্ছে ওগুলো।

অনেকক্ষণ পর চোখ তুলল সে। দিগন্তে হালকা নীল আকাশের বুকে মেঘের আভাস দেখতে পেল। বেশ ঘন, পাহাড় সমান উঁচু। ঝুঁকে একটা সুইচ অন করল লুইস। 'জ্যাক, অশান্তির বীজের দেখা বোধহয় পাওয়া গেছে,' বলল শান্ত কণ্ঠে। 'কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েছে?'

জবাবে তার ইয়ারফোনে ক্যান ক্যান করে উঠল আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ জ্যাকবসন ওরফে জ্যাকের গলা, 'ডিসপ্লে চেক করে দেখছি।'

হেলান দিয়ে তলপেটের ওপর দু'হাত বাঁধল পাইলট, তাকিয়ে থাকল সামনে। মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে মেঘের পরিধি। দিগন্তরেখার এ-মাথা ও-মাথা ছেয়ে আছে ঘন কালো রঙের মেঘ–স্থির নেই, অনবরত মোচড় খাচ্ছে ড্রাগনের মত। ব্যস্তসমস্ত হয়ে পাশ ফিরছে, পাক খাচ্ছে।

ফ্লাইট ডেকের পিছনে বড় এক কম্পার্টমেন্ট। অতীতে যখন এ প্লেন প্যাসেঞ্জার লাইনার হিসেবে চলত, তখন ওটাকে বলা হত ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। এখন শুধুই কম্পার্টমেন্ট। নানান ইকুইপমেন্টে ঠাসা। কনসোল, রাডার, মনিটর, টেলিমিটারিঙ ডিভাইস, আরও কত কি! আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল জ্যাকবসন আর তার দুই সহকারী সামলায় ওসব। এমনিতে কম্পার্টমেন্টের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ইকুইপমেন্টে ঠাসা, তারই মধ্যে এদের তিনজনের বসার ব্যবস্থা করতে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে হাঁটাচলা করাও কঠিন।

ওর মধ্যে সুইভেল চেয়ারসমেত ঘুরতে গিয়ে বেখেয়ালে রাডার কনসোলের গায়ে ডান হাঁটুতে জোর গুঁতো খেলো জ্যাকবসন। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। এক হাতে জায়গাটা ডলতে ডলতে মনিটরের সুইচ অন করল সে। মুহূর্তে জ্যান্ত হয়ে উঠল বড় স্ক্রীন, সবুজ আলোর ছটায় চেহারা সবুজ হয়ে উঠল তার। পেশাদারী কৌতূহলের সাথে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে। নোট শীটে খস্‌খস্‌ করে কি লিখল, তারপর কিছু কাগজপত্র নিয়ে উঠে ফ্লাইট ডেকে চলে এল।

লুইসের কাঁধে টোকা দিয়ে বুড়ো আঙুল তুলে 'ওকে' সঙ্কেত দেখাল। সামনে তাকাল ঝুঁকে। চোখ কুঁচকে বেশ কিছুক্ষণ মেঘের গতি-প্রকৃতি লক্ষ করে মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, এটাই।' হাসল সে।

গলা দিয়ে ঘোঁৎ জাতীয় আওয়াজ করল পাইলট। 'হয়েছে! এরমধ্যে খুশি হওয়ার মত কিছু নেই।'

হাতের কাগজপত্রের ভেতর থেকে কয়েকটা ছবি বের করল জ্যাকবসন, লুইসের দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'দেখো। স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে এগুলো।'

ওপর থেকে তোলা আসন্ন ঝড়-বৃষ্টির ছবি ওগুলো। প্রত্যেকটাতে বড় বড় কিছু সাদাটে ঘূর্ণি দেখা যাচ্ছে। স্কেল দিয়ে ওগুলো মেপে দেখল পাইলট, মাথা ঝাঁকাল। 'মনে হয় বড় ধরনের কিছু নয়।'

'ঘূর্ণির আকার দেখে সে কথা বলার উপায় নেই। ওর মধ্যে বাতাসের চাপ কতখানি, না জেনে কিছু বলা যাবে না।'

'প্লেনের গতিপথ?'

'একই থাকবে,' বলল বিশেষজ্ঞ। 'ঝড়ের কেন্দ্রে ঢুকতে হবে আমাদের।'

গাল চুলকাল অন্যমনস্ক নরম্যান লুইস। 'তোমার যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে তো? দেখো, প্রথমবারেই সমস্ত তথ্য পেতে হবে কিন্তু। ওর মধ্যে তোমাকে নিয়ে দু'বার ঢুকতে পারব না আমি।'

'আমারও তেমন ইচ্ছে নেই।' নিজের জায়গায় ফিরে এল জ্যাকবসন। ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। সামনের আগুয়ান বিপদটা ছাড়া

আর সব ঠিকই আছে। নিজের দুই সহকারীকে দেখল সে। ওরা নেভির লোক, যথেষ্ট অভিজ্ঞ নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে। জানে এখন কি করতে হবে।

জ্যাককে ফিরতে দেখে সীটের সাথের ওয়েবিঙ স্ট্র্যাপ দিয়ে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে শুরু করে দিল তারা, প্লেন ঝড়ের মধ্যে বেমক্কা আচরণ শুরু করলে যাতে ছিটকে পড়তে না হয়। লোক দুটোর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের সীটে বসল জ্যাকবসন। নিজেকে বাঁধল সময় নিয়ে, তারপর একটা লিভার টেনে দিল। সীটের নড়াচড়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল এর ফলে। প্লেন যত যা-ই করুক, সীট নড়বে না একচুলও।

দু'হাত কাঁপছে তার অল্প অল্প। ভয় পেয়েছে। এরকম সময় প্রতিবারই এটা ঘটে। ফ্লাইটের অন্য সবার চেয়ে বেশি ভয় পায় জ্যাকবসন। এবার পেয়েছে বহুগুণ বেশি। কারণ ও জানে, সামনে প্রকৃতি যে প্রলয় নাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, এ অঞ্চলের ভয়ঙ্কর প্রাণ সংহারী ঝড় ওটা–হারিকেন। গ্রীষ্মের শেষ দিকে প্রায় প্রত্যেক বছরই উৎপত্তি হয় এর, একেক নামে। বাতাসের গতি অনুযায়ী নাম ওগুলোর–আইয়ন, লরা, ম্যাবেল, জেনেট, হিলডা ইত্যাদি।

যেটার দিকে এগোচ্ছে এখন সুপার কনস্টিলেশন, ওটার ব্যাপারে আগে থেকেই দুশ্চিন্তায় আছে সে। কারণ ক্যাপ সারাত ঘাঁটি থেকে আকাশে ওঠার আগে উপগ্রহের মাধ্যমে যে ছবিগুলো হাতে এসেছে, সেগুলো ভয়াবহ বিপদের বার্তাবাহী। সাদাটে ঘূর্ণি তার প্রমাণ। মিটিওরোলজিক্যাল সাইন্সের সিম্বল আর ফর্মুলার সাহায্যে বহুবার সে ওগুলোকে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করেছে, পারেনি মেলাতে। যেন ওটা সৃষ্টিছাড়া কিছু। এই জন্যেই আজ বেশি ভয় পাচ্ছে সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাজে মন দেয়ার চেষ্টা করল, ঠিক তখনই বাতাসের ধাক্কায় প্রথম ঝাঁকিটা খেলো প্লেন। রাডার স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, উপগ্রহের পাঠানো ছবির সাথে কোন পার্থক্য নেই ওখানে। রেকর্ডারের সুইচ অন করল, ওটার প্লাস্টিক ম্যাগনেটিক টেপ এখন হারিকেন সম্পর্কিত সমস্ত ডাটা রেকর্ড করতে লেগে পড়বে। মেইন কম্পিউটরের সাথে সংযোগ আছে রেকর্ডারের, ওটার সংগ্রহ করা সমস্ত ডাটা ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাবে তার মেমোরি ব্যাঙ্কে।

ওদিকে প্লেনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়েছে পাইলট, শক্ত হয়ে বসে আছে নিজের সীটে। চারদিক থেকে ঘিরে ধরে থাকা ঘন কালো মেঘের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। উন্মাতাল বাতাসে তীব্রবেগে এদিক-ওদিক ছুটছে মেঘ, কোথাও হ্যাঁচকা টান খেয়ে শতছিন্ন হচ্ছে তার ভীতিকর কালো দেহ, কোথাও পাহাড়ের আকৃতি নিয়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে মহাআক্রোশে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য–দেখে হাজারবার বুক কাঁপে, কিন্তু বর্ণনা করে বোঝানো যায় না একবারও।

বাতাসের চাপে প্লেনের পিছনদিক খানিকটা উঁচু হলো, গতি বেড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এয়ার স্পীড ইন্ডিকেটরের দিকে তাকাল লুইস। কাঁটা বলছে এখনও আগের ২২০ নট গতিতেই চলছে প্লেন, কিন্তু ওটা যা-ই বলুক, গ্রাউন্ড স্পীড যে ২৭০ নটের একচুলও কম নয় এ মুহূর্তে, তা সে বাজী ধরে বলতে পারে।

আচমকা নিম্নমুখী বাতাসের হ্যাঁচকা টানে নিচের দিকে ডাইভ দিল

কনস্টিলেশন, ছুঁড়ে দেয়া পাথরের মত হু-হু করে নামছে তো নামছেই। ওটাকে খাড়া রাখতে কন্ট্রোলের সাথে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ শুরু করল লুইস। যেমন শুরু হয়েছিল, একটুপর তেমনি আচমকা থেমে গেল পতন, এবং প্রায় একই মুহূর্তে শুরু হলো উত্থান। অলটিমিটারের কাঁটা ডায়ালের মধ্যে লাট্টুর মত ঘুরছে বন্ বন্ করে। উঠতে উঠতে একসময় প্রায় ওপরের বায়ুহীন স্তরে উঠে আসার জোগাড় করল প্লেন, অনেক কষ্টে ব্যাপারটা ঠেকাল পাইলট। প্রচণ্ড উদ্বেগে হাঁপিয়ে উঠেছে।

উইন্ডশীল্ডের পুরু কাঁচের ওপাশে বৃষ্টির ফোঁটা আর বাতাস সব ওপরদিকে ছুটছে দেখতে পেল সে। বিদ্যুচ্চমকের তীব্র নীলচে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। পিছনে, ডান উইঙ টিপে আগুন দেখে বুঝল বাজটা ওখানেই পড়েছে। এসব অবশ্য স্বাভাবিক, এ ধরনের মিশনে প্রায় সময়ই ঘটে। অ্যালুমিনিয়ামের টিপে হয়তো ছোটখাট ফুটোর সৃষ্টি হয়েছে ওখানে। মাটিতে ফিরতে পারলে দশ মিনিটে মেরামত করে ফেলা যাবে, অতএব চিন্তার কিছু নেই।

ঝড়ের মধ্যে অন্ধের মত ঘুরছে প্লেন, পাইলট ঘোরাচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের আরও গভীরে ঢুকে যাচ্ছে বাতাসের সর্বোচ্চ গতির খোঁজে। বিদ্যুৎ এখন অনবরত চমকাচ্ছে চারদিকে, মুহূর্তের জন্যেও থামছে না। বাজ পড়ার মুহুর্মুহু হুঙ্কারে নিজের ভাবনা চিন্তাও শুনতে পাচ্ছে না কেউ। কিন্তু তবু বসে নেই ওরা, যে যার কাজে ব্যস্ত।

নরম্যান লুইসও ব্যস্ত হিসেব কষতে। উপগ্রহের ছবির হিসেব অনুযায়ী হারিকেনের কেন্দ্র আরও সাড়ে তিনশো মাইল সামনে। আর তার পরিধি সাড়ে নয়শো মাইল। যেদিকে ঝড়ের তীব্রতা সবচেয়ে কম, সেদিকে পৌঁছতে হলে আরও দুইশো ত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে তাকে। এদিকে এয়ার স্পীড ইন্ডিকেটরের কাঁটা এত বেশি অস্বাভাবিক আচরণ করছে যে ওটার ওপর আর ভরসা করা যায় না। তবে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছে, এ মুহূর্তে তাদের গ্রাউন্ড স্পীড তিনশো নটের কিছু বেশিই হবে। অর্থাৎ ঘণ্টায় সাড়ে তিনশো মাইল বেগে ছুটছে কনস্টিলেশন।

আধঘণ্টা হলো ঝড়ের মধ্যে ঢুকেছে সে, তার মানে আরও আধঘণ্টা লাগবে ঠিক জায়গায় পৌঁছতে। কপালে ঘাম ফুটতে শুরু করল পাইলটের। ওখানে কি ঘটবে কে জানে!

ওদিকে কম্পার্টমেন্টে মুহূর্তের জন্যেও স্থির থাকতে পারছে না কেউ। স্ট্র্যাপের প্রচণ্ড টানে এরমধ্যেই দেহের এখানে ওখানে কালশিটে দাগ পড়ে গেছে জ্যাকবসনের। সামনের প্যানেলে ঝোলানো বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। আরও প্রায় একশো মাইল যেতে হবে, তারপর ঝড়ের কেন্দ্রে (Eye) ঢুকতে পারবে প্লেন। ওখানে পৌঁছলে একটু স্বস্তির দম ফেলা যাবে, কারণ একদম শান্ত থাকে হারিকেনের কেন্দ্র।

মিনিট পনেরো থাকবে ওরা ভেতরে, তার মধ্যে সমস্ত কাজ সেরে ফেলতে হবে জ্যাকবসনকে। বাতাসের চাপ, আর্দ্রতা, উত্তাপ রেকর্ড করতে হবে তখন। একই সময় জটিল ইন্সট্রুমেন্টের কিছু ক্যাপসুল ফেলে দেয়া হবে প্লেন থেকে।

মাটিতে পড়ুক বা সাগরে, রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে ঝড় সম্পর্কিত তথ্য অনবরত পাঠাতে থাকবে ওগুলো।

সময় হয়েছে বুঝতে পেরে মাউথ পীসের সাহায্যে সহকারীদের একের পর এক নির্দেশ দিতে আরম্ভ করল জ্যাকবসন। কাজে লেগে পড়ল তারা ঝটপট। একটু পর একেবারে আচমকা শান্ত হয়ে গেল সব, বন্ধ হয়ে গেল প্লেনের লাফঝাঁপ। বাতাসের সার্বক্ষণিক হুঙ্কার নেই, বিদ্যুতের চমক নেই, বজ্রপাতের আওয়াজ নেই–কিচ্ছু নেই। আছে কেবল কনস্টিলেশনের শক্তিশালী এঞ্জিনের মৃদু, স্বাভাবিক গুঞ্জন। এতক্ষণ ওসবে অভ্যস্ত কানে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগছে সবার।

নিজের ওয়েবিঙ স্ট্র্যাপ খুলে ফেলল জ্যাকবসন। সহকারীদের একজনের সামনে এসে দাঁড়াল। 'কি বুঝছ?'

'কিছুই না,' মাথা ঝাঁকাল সে। চেহারায় হতাশা। 'কোন ক্যাপসুলই এখন পর্যন্ত কোন সঙ্কেত পাঠায়নি। মনে হচ্ছে অকেজো হয়ে গেছে সব।'

'জানতাম,' বিড় বিড় করে বলল জ্যাকবসন। রেগে উঠছে। অন্যজনের দিকে ফিরল। 'তোমার কি অবস্থা?'

'মন্দ নয়,' বলল লোকটা। 'বাতাসের ফোর্স, আর্দ্রতা, উত্তাপ ইত্যাদি রেকর্ড করতে পেরেছি।'

'গুড। চালিয়ে যাও, আমি লুইসের সাথে কথা বলে আসি।'

প্লেনের দায়িত্ব আবার সহকারীর হাতে ছেড়ে দিয়েছে পাইলট। দুই হাত ঘন ঘন মুঠো করছে আর খুলছে সে। কন্ট্রোলের সাথে এতক্ষণ লড়াই করতে গিয়ে অবশ হয়ে গেছে। দু'জন হাসল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। 'ব্যাটা ভারি বদ,' মন্তব্য করল লুইস। 'তোমার খবর কি?'

'ভাল না। যন্ত্রপাতি কোনটাই কাজ করছে না।'

'আগে কখনও করেছে?'

'নাহ্! ভাবছি ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারে কড়া রিপোর্ট লিখতে হবে। এসব যন্ত্রপাতির পিছনে কেবল টাকার শ্রাদ্ধই হচ্ছে, কাজের কাজ হচ্ছে না কিছু।'

গম্ভীর হয়ে উঠল পাইলটের চেহারা। 'ফিরে যাব কি করে তাই ভাবছি আমি। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ বরাবর এত প্রচণ্ড ঝড় এই প্রথম দেখলাম জীবনে। এর মধ্যে দিয়ে উত্তরে যাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে।'

'তাহলে যে পথে এসেছি সেই পথেই চলো,' বলল জ্যাকবসন।

'সম্ভব নয়,' পাইলট মাথা দোলাল। 'তেল ফুরিয়ে আসছে। যেতে হলে শর্টকাট পথ ধরেই যেতে হবে। তবে ব্যাপারটা খুবই কঠিন হবে।'

শঙ্কিত হয়ে উঠল আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ। 'হ্যাঁ। কোন সন্দেহ নেই, ঝড়টা মারাত্মক।'

একটুপর ফিরতি পথ ধরল সুপার কনস্টিলেশন। কিসের ভেতর দিয়ে কিভাবে ঘাঁটিতে ফিরল ওটা, তা লুইসই জানে।

*

পরদিন। বিকেল চারটা।

রাজধানী সেন্ট পিয়েরের পনেরো মাইল দক্ষিণের মার্কিন নৌ ঘাঁটি ক্যাপ সারাত। জায়গাটা স্যান্টিগো উপসাগরের তীরে। নিজের অফিসে ঘাঁটির প্রধান আবহাওয়া কর্মকর্তা হুইটনি স্মিথের মুখোমুখি বসে আছে ড্যানিয়েল জ্যাকবসন। কালকের মিশনের খবর জানতে এসেছে চীফ। হাতে কিছু ছবি।

পঞ্চাশের মত বয়স স্মিথের। ছয় ফুটের কিছু বেশি হবে লম্বায়। মাথাজোড়া টাক। জ্যাকবসন তার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক খাটো, বয়স ত্রিশ। বুদ্ধিদীপ্ত সাধকের চেহারা। সাধারণ ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের মত কালো নয় সে, বরং শ্বেতাঙ্গদের মতই ফরসা। মা ব্রিটিশ ছিল জ্যাকবসনের। জন্ম এখানে, লেখাপড়া করেছে ইংল্যান্ডে।

'লুইস বলছিল কাল নাকি খুব খারাপ অবস্থায় পড়েছিলে!' বলল চীফ।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।'

হাতের ছবিগুলো এগিয়ে দিল কর্মকর্তা। 'দেখো। একটু আগে এসেছে এগুলো স্যাটেলাইট থেকে।' জ্যাকবসনের পিছনের দেয়ালে ঝোলানো নতুন এক চার্ট দেখে চোখ কোঁচকাল। 'লেটেস্ট?'

'হ্যাঁ। এইমাত্র শেষ করেছি।'

উঠে চার্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল চীফ। জ্যাকবসনের লেখা ফিগারগুলো দেখতে দেখতে চোখ কুঁচকে উঠল। 'ইন্সট্রুমেন্টস কাজ করেছিল তো ঠিকমত?'

'রেকর্ডারই যা কাজ করেছে,' চেহারায় বিরক্তি ফুটিয়ে বলল সে। 'ক্যাপসুল বেশিরভাগই অকেজো হয়ে গেছে।'

'হুম!' আনমনে মাথা দোলাল চীফ। 'এই ফিগারগুলো,' নাক দিয়ে চার্ট ইঙ্গিত করল। 'ভালমত চেক করে বসিয়েছ তো?'

'আমি আমার কাজ ভালই বুঝি, চীফ,' গলায় বিরক্তি ফুটিয়ে বলল জ্যাকবসন। 'আপনি তা জানেন।'

'নিশ্চই, নিশ্চই!' আরও কিছুক্ষণ নীরবে চার্ট পর্যবেক্ষণ করল কর্মকর্তা। 'এখানে দেখছি ঝড়ের চোখের বাইরে চাপের চাপ এক হাজার চল্লিশ মিলিবার!'

'ঠিকই আছে। ভেতরের দিকে চাপ আটশো সত্তর মিলিবার। ওটাই সবচে' কম। অবস্থা সুবিধের নয়। এই অবস্থায় আঘাত করলে ঝড়ের গতি হবে ঘণ্টায় একশো সত্তর মাইলের মত। বেশিও হতে পারে।'

'কমও তো হতে পারে,' ঘুরে তাকে দেখল চীফ।

'পারে। যদি বাতাসের চাপ কমে যায়।' চোখ কুঁচকে ভাবল জ্যাকবসন। 'তবে এ যাত্রা মনে হয় তা ঘটার চান্স নেই। বাতাসের গুমোট ভাব কালকের থেকে আজ বেড়েছে অনেক।'

'ঠিক বলেছ।' সঙ্গে নিয়ে আসা ছবিগুলো দেখাল স্মিথ। 'এগুলো দেখে মনে হয় গতি কম ঝড়টার। এলেও তাড়াতাড়িই আসছে না।'

জ্যাকবসন দেখল ওগুলো। 'ঘণ্টায় আট মাইল গতিতে এগোচ্ছে। তার মানে চব্বিশ ঘণ্টায় দুশো মাইল।'

'তার মানে পশ্চিমে, মানে এদিকে পৌঁছতে ওটার আরও দিন দশেক লাগবে। যদি আসে, কি বলো? যদি শেষ পর্যন্ত অন্যদিকে ঘুরে না যায়।'

'আমার মনে হয় এবার ঘুরবে না ওটা। এ পর্যন্ত কোন হারিকেন এত ধীর

গতিতে এগোয়নি এ অঞ্চলে। গত কয়েক বছরে যতগুলো ঘূর্ণিঝড় দেখেছি, তার প্রত্যেকটার গতি ছিল ঘণ্টায় পনেরো মাইল, কি তারও কিছু বেশি।'

'এখানকার আবহাওয়া অফিস ব্যাপারটা পছন্দ করবে না হয়তো।'

মাথা দোলাল জ্যাকবসন। 'আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু ওরা খবর জানাতে অনুরোধ করেছে চিঠি দিয়ে।'

হুইটনি স্মিথ মুখ বিকৃত করল। 'আগের রিপোর্ট দেখে গতানুগতিক একটা কিছু পাঠিয়ে দাও।'

'এখনই সেটা করা ঠিক হবে না। ওরা তাকে ধ্রুব সত্যি বলে ধরে বসে থাকবে, কোন পদক্ষেপই নেবে না সরকার। কিন্তু পরে যদি অন্যরকম কিছু ঘটে যায়, কত মানুষ মরবে কে জানে! '৫৫ সালে হারিকেন "আইয়ন" যেমন করেছিল, আসবে কি আসবে না করেও শেষ পর্যন্ত এসে পড়ল। মানুষ...'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' বাধা দিয়ে বলে উঠল চীফ। 'তোমাকে কিছু করতে হবে না। আমিই করছি যা করার।'

নীরবে কয়েক মুহূর্ত চীফকে দেখল জ্যাকবসন। 'সেটা বোধহয় ঠিক হবে না, চীফ। মানুষের প্রাণ...'

আবার বাধা দিল লোকটা। 'এই ঘূর্ণিঝড়টার নাম কি?'

'ম্যাবেল। ওটা যে রুটে আসছে, তার আশেপাশের দ্বীপগুলোকে খবরটা জানানো দরকার।'

'সে আমি দেখব,' বলে দরজার দিকে এগোল কর্মকর্তা। মাঝ পথে কি খেয়াল হতে থেমে ঘুরল। 'ও হ্যাঁ, ভাল কথা। কাল তুমি মিশনে থাকার সময় নিউ ইয়র্ক থেকে একটা মেসেজ এসেছে তোমার।'

'নিউ ইয়র্ক থেকে?' চেহারার অসন্তোষ উবে গেল জ্যাকবসনের। 'কি মেসেজ?'

'মাসুদ রানা নামে তোমার এক বন্ধু আসছে।'

'অ্যাঁ!' একেবারে আকাশ থেকে পড়ল সে। 'কখন?'

'আজই। সন্ধে ছয়টার ফ্লাইটে।'

বসের পিছনে বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হাসি ফুটল মুখে। চিন্তাও হলো, মাসুদ রানা এই পোড়া দ্বীপে কেন আসবে? এমন হতচ্ছাড়া জায়গায় কি কাজ ওর? ব্যাটা আসার আর সময় পেল না, এই ঝামেলার সময়...

টেলিফোনটা কাছে টেনে নিল জ্যাকবসন। এয়ারপোর্টে ফোন করে জেনে নিল ফ্লাইটটা শিডিউলড্ টাইমেই পৌঁছবে কি না। আরেকটা ফোন করল হোটেল ইম্পিরিয়ালে। বিদেশীদের থাকার মত এই একটা হোটেলই আছে এ দেশে। ওর প্রশ্নের জবাবে ইনফর্মেশন ডেস্ক জানাল, গতকাল সকালে নিউ ইয়র্ক থেকে টেলিফোনে ডবল রুম বুক করা হয়েছে মিস্টার মাসুদ রানার নামে। হোটেল রেন্টাল সার্ভিসের অবশিষ্ট গাড়িটাও আগাম রিজার্ভ করে রেখেছেন ভদ্রলোক।

শা-লা! ফোন রেখে ভাবল জ্যাকবসন। এখনও আগের মতই আছে ব্যাটা। যেখানেই যাক, রাজার হালে থাকা চাই। কিন্তু ডবল রুম কেন? আর কে আছে

ব্যাটার সাথে? কোন ডানা কাটা পরী?

ডেস্কের কাগজপত্রের স্তূপের ওপর চোখ পড়তে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ রেখে কি করে যায় সে ওকে রিসিভ করতে? কাজটা আর কাউকে দিয়ে করানোও সম্ভব নয়। কি করি? ভাবল জ্যাকবসন। এখন যে পরিস্থিতি, তাতে ওয়াচ ছেড়ে নড়া একেবারেই উচিত হবে না। কখন কি পরিস্থিতি দেখা দেয় কে বলতে পারে? ঘড়ি দেখল, সাড়ে চারটা। এখনও ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে হাতে, দেখা যাক্ এর মধ্যে কাজটা শেষ করা যায় কি না।

কিন্তু হলো না। যখন অবসর হলো সে, তখন প্রায় ছয়টা। বিশ মাইল দূরের এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ছুটে যাওয়া এখন বেকার, পৌঁছতে পৌঁছতে নিশ্চই বেরিয়ে পড়বে মাসুদ রানা। ধরা যাবে না। তারচেয়ে বরং হোটেলেই যাবে সে একটু পর। ডিনার করবে রানাকে নিয়ে।

ডেস্ক গোছগাছ করে বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বের হলো জ্যাকবসন। গাড়ির চাবি নিয়ে ঘুরতে যাবে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যস্ত হয়ে হাত চালাল সে। 'কে বলছেন?'

'জ্যাক? মাসুদ রানা।'

বহুদিন পর বহু পরিচিত সেই ভরাট গলা শুনে টেনশন, হারিকেন, সব ভুলে গেল জ্যাকবসন। চেঁচিয়ে উঠল, 'রানা! কোথায় তুমি?'

'হোটেলে। এইমাত্র চেক্ ইন করেছি,' বলল ও।

বিমূঢ় চেহারা হলো তার। 'সে কি! এত তাড়াতাড়ি? সোয়া ছ'টাও তো বাজেনি এখনও!'

'হ্যাঁ। পনেরো মিনিট আগেই ল্যান্ড করেছে প্লেন। তারপর, কেমন আছ?'

'তোমার আসার খবর পাওয়ার আগ পর্যন্ত ভাল ছিলাম না, এখন ভাল।' রানার হাসি থামার সময় দিল জ্যাকবসন। 'হঠাৎ এখানে কি মনে করে, রানা?' ডেস্কের ওপর উঠে বসল। 'কথা নেই বার্তা নেই!'

'হঠাৎ করে সাতদিনের ছুটি পেয়ে গেলাম। ভাবলাম এই সুযোগে তোমার সাথে দেখা করে যাই। অনেকদিন দেখা হয় না।'

আনন্দে ফেটে পড়ার অবস্থা হলো তার। 'শুধু আমাকে দেখতে!'

'কেন?' প্রশ্ন করল রানা। 'সন্দেহ হয়?'

'না। আমি ভেবেছিলাম কোন বিশেষ কাজে...'

'কোন কাজ নেই। স্রেফ ছুটি।'

'শুনে খুব খুশি হলাম। আমি এখনই বের হচ্ছিলাম হোটেলে আসব বলে। এয়ারপোর্টে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ জরুরী...'

'নেভার মাইন্ড, জ্যাক। চলে এসো।'

'শিওর। রানা, তোমার সাথে আরও কেউ আছে নাকি?'

হাসল ও। 'কি করে বুঝলে?'

'তোমার খবর জানতে বিকেলে ফোন করেছিলাম হোটেলে। ওরা বলল ডবল রুম বুক করেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, আছে কেউ একজন। চলে এসো, একসাথে খাব রাতে।'

'আমিও তাই ভেবে রেখেছি।'

'এই জন্যেই তো "গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক" কথাটার জন্ম হয়েছে।'

*

ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ড্যানিয়েল জ্যাকবসন। অতীতের কথা ভাবতে ভাবতে গাড়ি ছোটাল পনেরো মাইল উত্তরের সেন্ট পিয়েরের দিকে। নৌ আবহাওয়ার ওপর বিশেষ পড়াশুনা করেছে সে ইংল্যান্ডে। পড়াশুনার ফাঁকে আকাশ ও সাগরে মিশনে যেতে হত কিছুদিন পর পর। ওই সময় একবার আমেরিকায় গিয়েছিল সে ইঙ্গ-মার্কিন পারস্পরিক শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচীতে অংশ নিতে।

সেবারই মাসুদ রানার সাথে পরিচয়। ও তখন নুমার হয়ে বিশেষ এক মিশনে ছিল প্যাসিফিকে। স্পাইং মিশন ছিল ওটা তলে তলে, জ্যাকবসন বা তার দলের কোন ধারণাই ছিল না সে ব্যাপারে। নুমার প্রধান অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের ভীষণ প্রিয়পাত্র ছিল রানা। ওর মিশন ছিল সোভিয়েত সাবমেরিনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্যে অত্যাধুনিক কিছু যন্ত্রপাতি সী বেডে প্ল্যান্ট করা।

জ্যাকবসনদের সেবার প্যাসিফিকেই গবেষণা চালানোর কথা। রানার মিশনের সাথে জড়িত অন্য মার্কিন মেরিন স্পেশালিস্টদের সাহায্যে কাজ অনেক সহজ হবে ভেবে একই জাহাজে তুলে দেয়া হলো ওদের দলটাকে।

কিন্তু কাজের শুরুতেই ঘটল বিপত্তি। কেজিবি জানত রানার মিশনের উদ্দেশ্য। স্যাবোটাজ ঘটানোর জন্যে তৈরি হয়ে ছিল ওরা। কিন্তু কাজের সময় পানির নিচে ভুল করে নুমার বদলে আবহাওয়া মিশনের ছাত্রদের ওপর হামলা চালিয়ে বসল। তিনজন ছাত্র মারা গেল। রানা তখন জাহাজে। পানির নিচে কিছু একটা ঘটছে টের পেয়ে ও যখন দলবল নিয়ে নিচে নামল, জ্যাকবসন তখন প্রায় আধমরা। তার অক্সিজেন সাপ্লাই লাইন কেটে দিয়েছে এক কেজিবি এজেন্ট, পিছন থেকে জাপটে ধরে রেখেছে যাতে ও ওপরে উঠতে না পারে।

কলজে বিস্ফোরিত হয়ে মরতে বসেছে, এমন সময় মাসুদ রানাকে হার্পুন হাতে দেখতে পেল সে। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরতে ওকে মাথার কাছে রসা দেখেছে জ্যাকবসন। জাহাজ তখন মিশন বন্ধ করে পোর্টের দিকে ছুটে চলেছে। পরে জানা গেছে আট কেজিবি এজেন্ট মরেছিল সেদিন রানার পাল্টা হামলায়। সেদিন থেকে বন্ধুত্ব দু'জনের। কাছাকাছি বয়স হওয়ায় খুব দ্রুত ঘনিষ্ঠতা পেয়েছে ওদের সম্পর্ক।

এতই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ওদের যে পৃথিবীতে একমাত্র রানাই জানে কি দুঃখে অসময়ে সম্পূর্ণ নতুন এক বিষয়ে পড়াশুনা করে আবহাওয়াবিদ হয়েছে জ্যাকবসন।

বিলীয়মান আলোয় পথের দু'ধারের কলা, আনারস বাগান আর পথচারীদের দেখতে দেখতে চলেছে সে। পুরুষদের প্রায় সবার পরনে নীল জিন্স ও নোংরা সুতীর শার্ট, মেয়েরা পরেছে প্রিন্টের ড্রেস, মাথায় উজ্জ্বল রঙের স্কার্ফ। হাসছে ওরা, গল্প করছে। আবছা আলোয় থেকে থেকে ঝিলিক মারছে তাদের ঝকঝকে সাদা দাঁত। নির্মল হাসি দেখলে মনেই হয় না আদিবাসীরা খুবই অভাবী। খুবই অভাবী, তারপরও এরা এত হাসিখুশি থাকে কি করে ভেবে পায় না জ্যাকবসন।

কিছুই নেই এদের সুখী হওয়ার মত।

ক্যারিবিয়ানের বুকে জনসংখ্যার ভারে বেহাল ছোট্ট এক দ্বীপ সান ফের্নান্দেজ। কয়েক দশকের সামরিক শাসনের ফলে অর্থনীতি বলতে কিছু নেই। কিন্তু অতীতে সবই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিনি আর কফির জন্যে বিখ্যাত ছিল দেশটা, প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আসত। আজকাল সে সব গল্পের মত শোনায়। শতাব্দীর শেষদিকে সাম্রাজ্যবাদী স্পেনের চোখ পড়ল দেশটার ওপর, নিজেদের কলোনি বানিয়ে নিল তারা এটাকে। তারপর এল ব্রিটেন এবং সবশেষে ফ্রান্স।

এক সময় ফ্রেঞ্চদের দেশ থেকে ভাগিয়ে দিল আদিবাসীরা, কিন্তু লাভ হলো না। দেশী ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের নেতৃত্বে একের পর এক গৃহযুদ্ধে প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল অর্থনীতি, বাকিটা শেষ করল গত তিন দশকের সামরিক সরকার আর জনসংখ্যা। চাষাবাদ মূল পেশা এদের, দেশের ভেতরের বেশিরভাগ ব্যবসা হয় বার্টার ভিত্তিতে। জ্যাকবসন জানে, সেন্ট্রাল হিলে এমন দুর্ভাগা মানুষও আছে যে জীবনে টাকা কি জিনিস, চোখে দেখেনি।

বর্তমান শতাব্দীর মাঝের দিকে দেশে সুদিন এসেছিল কয়েক বছরের জন্যে। নির্বাচিত সরকারের অনুরোধে ব্যবসায় টাকা খাটাতে বেশ কিছু মার্কিন কোম্পানি এল, কফি বাদ দিয়ে আখ, কলা আর আনারসের ফার্মিং শুরু করল সারা দেশে। কয়েক বছরের মধ্যে চেহারা আমূল বদলে গেল সান ফের্নান্দেজের। ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় রাজধানীর দক্ষিণে কয়েক একর জমি লীজ নিয়ে মার্কিন সরকার নিজেদের নৌ ঘাঁটি বানাল। জমির ভাড়া হিসেবে বছরে এক হাজার ডলার দিতে হয় তাদের।

কিন্তু ঘাঁটির কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ষড়যন্ত্রও শুরু হলো। কেজিবি উস্কানি দিয়ে খেপিয়ে তুলল তখনকার সেনাবাহিনী প্রধান সেরারিয়েরকে। ক্ষমতা দখল করল লোকটা। তবে তার আগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধুয়া তুলে তাদের দেশ থেকে হটানোর যে প্রতিজ্ঞা সে করেছিল, তা সফল হলো না। তার দাবির জবাবে ওয়াশিংটন সাফ জানিয়ে দিল, লীজ চুক্তি করেছে সে দেশের বৈধ সরকারের সাথে, কাজেই ঘাঁটি ছাড়ার প্রশ্নই আসে না।

সেরারিয়েরও বেশি চাপাচাপি করেনি, কারণ তার আসল উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা দখল করা। তাছাড়া ততদিনে মার্কিন সরকার ঘাঁটিতে প্রচুর মেরিন ও অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করে ফেলেছে। কখন কি ঘটে যায় ভেবে চুপ মেরে গেল। আমেরিকানদের দু'চোখে দেখতে পারে না সে। তার বিশ্বাস সাদা চামড়া মানেই আমেরিকান, আর আমেরিকান মানেই সিআইয়ের স্পাই। টাকা নেই সেরারিয়েরের, আছে শুধু অস্ত্র। তার খামখেয়ালীপনার ফলে দেশ দেউলিয়া, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

তারপরও এরা হাসে।

দুই

খুবই এলোমেলো, অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা শহর সেইন্ট পিয়েরে। অপ্রশস্ত পথ-ঘাট, খাওয়া খাওয়া। যেমন-তেমন করে তৈরি ইটের ঘরবাড়ি, ছাদ করোগেটেড আয়রনের। গুমোট বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে পচা ফল আর মাছের দুর্গন্ধ। সাথে মানুষ-পশুর মিলিত ঘামের দুর্গন্ধ।

একেবারে যা-তা অবস্থা। এরমধ্যে গত ক'দিন থেকে সন্ধের পর ঠিকমত আলো জ্বলছে না শহরে—লো ভোল্টেজের সমস্যা। দেশের একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দাদার আমলের যন্ত্রপাতি আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এ দেশেই জন্ম জ্যাকবসনের, লেখাপড়ার জন্যে মাঝে কয়েক বছর ইংল্যান্ডে থাকা ছাড়া জীবন কেটেছে লেসার এন্টিলিসের দ্বীপে দ্বীপে। সবখানে একই অবস্থা। দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের জীবনের কোন দাম নেই এ অঞ্চলে, নামকাওয়াস্তে স্বাধীন এসব দেশ। রাজকীয় আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা কেবল শাসকদের আর তাদের আত্মীয় স্বজনদের জন্যে, সাধারণ মানুষ গরু-ছাগলেরও অধম। কেউ ভাবে না তাদের নিয়ে।

রাজনীতি নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামায় না জ্যাকবসন, মনেপ্রাণে ঘৃণা করে ব্যাপারটাকে। তবু মানুষের অভাব-অনটন, কষ্ট দেখলে একেক সময় চিন্তা জাগে, এদের জন্যে কিছু করা গেলে ভাল হত। সামান্যতেই খুশি হয় এ অঞ্চলের মানুষ, এদের সুখে রাখতে খুব বেশি কষ্ট করার প্রয়োজন হত না।

আমেরিকান-ইওরোপীয়ান পয়সাওয়ালারা যখন বেড়াতে এসে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, এন্টিলিসকে 'ট্রপিক্যাল প্যারাডাইস' বলে বর্ণনা করে, দুঃখে হাসি পায় তার। ওদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, তাহলে নিউ ইয়র্কে স্রোতের মত যায় কেন পুয়ের্টোরিকানরা? ওখানে জীবন কাটায় কেন? অথবা লন্ডনে এত জ্যামাইকান অভিবাসী কেন?

ইম্পিরিয়াল হোটেলে যখন পৌঁছল সে, তখন সোয়া সাতটা। প্রায় ফাঁকা পার্কিঙ এরিয়ায় গাড়ি রেখে দ্রুত পায়ে লাউঞ্জের দিকে এগোল। ভেতরে ঢুকতে কিছুটা স্বস্তি পেল নাক। বাইরের কোন দুর্গন্ধ এখানে ঢোকার সুযোগ পায় না। ঠেকে যায় কাঁচের দেয়ালে। লাউঞ্জেই দেখা হয়ে গেল দু'বন্ধুর।

কয়েক মুহূর্ত দেখল ওরা পরস্পরকে, রানার বাড়ানো হাত অগ্রাহ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। শক্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল। 'হ্যাল্লো, রানা! তোমাকে দেখে কী যে খুশি হয়েছি, বলে বোঝাতে পারব না।'

'আমিও, জ্যাক,' বলল রানা। 'কিন্তু এবার ছাড়ো দেখি। ও বেচারী ঘাবড়ে গেছে।'

অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল সে ওকে। 'মানে, কে?'

পাশে দাঁড়ানো অপূর্ব সুন্দরী এক শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখাল ও। 'আমার বান্ধবী,

ক্রিস্টিনা ম্যালোরি, আমেরিকান। ওকেও তুমি এইভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে পারো ভেবে কুঁকড়ে গেছে হয়তো ভয়ে।'

'বলেছে তোমাকে!' ওর উদ্দেশে চোখ কোঁচকাল মেয়েটি। জ্যাকবসনের দিকে হাত বাড়াল। 'পরিচিত হতে পেরে খুশি হলাম, মিস্টার জ্যাকবসন। রানার মুখে গল্প শুনেছি আপনার।'

যা ভেবেছি, মনে মনে বলল সে, ডানা কাটা পরীই। পাঁচ ফুট সাতের মত দীর্ঘ হবে মেয়েটি, বয়স বাইশ-তেইশ। ডিমের মত মুখ, সোনালী চুল। ভারি মিষ্টি চেহারা। নীল জিনস আর টকটকে লাল টি-শার্টে অপূর্ব লাগছে।

'শুধু জ্যাক, প্লীজ!' গর্বের চোখে রানাকে দেখল সে। 'আমার ওপর টান ওর বেশি জানি, কিন্তু গল্পে ঠাঁই পাওয়ার মত কিছু নই আমি। সে বরং রানা হতে পারে।'

চোখ কুঁচকে উঠল রানার, কিন্তু কিছু বলার সুযোগ পেল না। তার আগেই ক্রিস্টিনা বলে উঠল, 'আমাকে কিন্তু এ দেশের ইতিহাস শোনাতে হবে, জ্যাক।'

'বেশ, শোনাব।'

'ক্রিস্টির আরেকটা পরিচয় আছে,' রানা বলল। 'ও সাংবাদিক। লন্ডন টাইমসের নিউ ইয়র্ক করেসপন্ডেন্ট।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এখন আর নয়, আপাতত এইটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে। বাকি আলোচনা পরে। এখন বলো ডিনার কোথায় করা যায়।'

'বাইরে। মারাকা ক্লাব নামে মোটামুটি চলনসই এক রেস্টুরেন্ট আছে, ওখানে। চলো।'

সিগারেট ধরাল রানা। 'তোমার গাড়ি?'

'এনেছি। তোমারটা থাক এখন, আমারটায়...' থেমে গেল সে রানার চেহারায় হতাশার ছায়া দেখে। 'কি ব্যাপার, রানা?'

'তোমার গাড়িই এখন একমাত্র ভরসা,' বলল ও। 'এদের রেন্টাল সার্ভিসের একটা কার ভাড়া করেছিলাম আমি, কিন্তু হাতছাড়া হয়ে গেল ওটা।'

'কেন, কেন!'

হাসি ফুটল রানার মুখে। 'তুমি একটুও বদলাওনি, জ্যাক। আগের মতই ডুবে আছ কাজ নিয়ে। দেশের খবর-টবর কিছু রাখো?'

আবার অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল বিশেষজ্ঞ। সত্যিই ওসব খবর রাখে না সে, রাজনীতির ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। 'না, মানে কাজের চাপে...সরি। কি ব্যাপার বলো তো!'

'গত দু'দিন থেকে দেশের সমস্ত প্রাইভেট কার রিকুইজিশন করতে শুরু করেছে তোমাদের সেনাবাহিনী,' ক্রিস্টি বলল।

রানা মাথা ঝাঁকাল। 'আমারটাও গেছে ওই পথে।'

'সে কি!' অবাক হলো জ্যাকবসন। 'আমি তো কিছুই জানি না! ব্যাপার কি, জানো কিছু?'

'অল্প অল্প,' হেসে বাঁ দিকের চুল কানের পিছনে গুঁজল মেয়েটি। 'কিন্তু এখন

নয়, পরে বলব।'

পালা করে ওদের দু'জনকে দেখল সে। 'বুঝলাম। তার মানে খবরের খোঁজে এসেছ তোমরা!'

'উঁহুঁ!' রানা মাথা দোলাল। 'ক্রিস্টি এসেছে ওই কাজে, আমি নই। আমি ছুটিতেই এসেছি। কাজেই তোমার তেতো খাওয়া চেহারা করার কোন দরকার নেই। চলো।'

'অল রাইট,' লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে জ্যাকবসন বলল। 'তোমরা আমার গাড়ি ব্যবহার করতে পারো। আমেরিকান সীল আছে ওটার গায়ে, কেউ ঠেকাতে আসবে না।'

'কিন্তু...'

'কোন চিন্তা নেই,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল সে। 'আমি অন্য ব্যবস্থা করে নিতে পারব।'

মারাকা ক্লাব ইম্পিরিয়ালের বেশি দূরে নয়। সেইন্ট পিয়েরের সাধারণদের জন্যে হাতে গোনা কয়েকটা রেস্টুরেন্টের মধ্যে একটা। মালিক এক গ্রীক, দিমিত্রিওস ম্যানোস। 'সার্ভিস ন্যূনতম, দাম গলাকাটা' নীতিতে বিশ্বাসী লোকটা। অবশ্য এ ব্যাপারে তার করারও কিছু নেই, প্রতিমাসে পুলিসকে মোটা অঙ্কের ভেট দিতে হয়, খদ্দেরের গলা না কেটে উপায় কি? তবে রান্নাবান্নায় প্রচুর সুনাম মারাকার। এ শহরে আর যেখানে খাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে ক্যাপ সারাত বেজের অফিসার্স ক্লাব। কিন্তু ওটা সাধারণের জন্যে নয়, সন্ধের পর তাই যথেষ্ট চাপ পড়ে এটার ওপর।

সে কথা ভেবে অফিস থেকে বের হওয়ার আগে ফোনে নিজেদের জন্যে টেবিল রিজার্ভ করে রাখতে ভুল হয়নি জ্যাকবসনের। ইয়া ভুঁড়িওয়ালা দিমিত্রিওস ম্যানোস নিজে এসে ভাঙা ভাঙা, ভুলভাল ইংরেজিতে রিসিভ করল ওদের তিনজনকে। ভেতরে বেশ খদ্দের আছে দেখা গেল। এক কোণে পাইলট লুইস আর নিজের দুই সহকারীকে দেখে হাত নাড়ল জ্যাকবসন। ওরাও নাড়ল, কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকল ক্রিস্টি ও রানার দিকে।

'হ্যালো, জ্যাক!' হেঁকে উঠল লুইস। 'তোমার হারিকেনের খবর কি?'

'আসছে,' জবাব দিল সে। 'তোমার ঘাড় ভাঙতে।'

শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা। মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গীদের সাথে গল্প শুরু করল। আধ ঘণ্টা পর গরম কফিতে চুমুক দিল ওরা তৃপ্তির সাথে খাওয়া শেষ করে। 'হারিকেনের কথা কি বলছিল লোকটা?' সিগারেট ধরিয়ে প্রশ্ন করল রানা।

'সাগরে হারিকেন সৃষ্টি হয়েছে, সেটার কথা,' জ্যাকবসন বলল। 'আমার মনিটরিং ফ্লাইটের পাইলট ও, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার নরম্যান লুইস।'

'আই সী! মারাত্মক নাকি, এদিকে আসছে?'

'এখনও পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে, রানা। কালকের আগে নিশ্চিত হওয়া যাবে না।' কাপে চুমুক দিল। 'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমার চীফকে নিয়ে। ও মনে করে আবহাওয়া বিদ্যা একেবারে নির্ভুল বিজ্ঞান, থিওরির বাইরে কিছু ঘটতে পারে না।'

'ঘটেছে মনে হয় কিছু?' বলল রানা।

'নইলে আর বলছি কি? কাল ওয়েদার মনিটরিং মিশনে গিয়েছিলাম। যে হারিকেনের উৎপত্তি হয়েছে দেখলাম, সেটা সত্যিই মারাত্মক। আমার বিশ্বাস ওটা এদিকেই আসছে। কিন্তু ব্যাপারটা চীফ স্মিথকে বোঝাতেই পারলাম না। অথচ ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, থিওরি যাই বলুক, আমার মন বলছে ম্যাবেল এদিকেই আসবে।'

'ম্যাবেল?'

'হারিকেনটার নাম। ওটার বাতাসের গতি দেখে ভয় ধরে গেছে আমার।'

'থিওরির সাথে তোমার অনুমান মিলছে না, এই তো?' ক্রিস্টি বলল।

'ঠিক অনুমান নয়, এটা আমার অনুভূতি। মন বলছে।' চোখ কুঁচকে কি যেন ভাবল জ্যাকবসন। 'আমরা এ অঞ্চলের মানুষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অনেক পিছনে পড়ে আছি। এই জন্যেই বোধহয় আমাদের ভেতরে এ ধরনের অনুভূতির জন্ম হয়েছে। একে ইচ্ছে করলে সিক্সথ সেন্স বলতে পার।

'একটা ঘটনার কথা বলি। আমি তখন খুব ছোট। জেলেরা এসে খবর দিল সাগরে হারিকেনের সৃষ্টি হয়েছে, তবে ভয়ের কিছু নেই, দুশো মাইল দূর দিয়ে অন্যদিকে চলে যাবে ওটা। অন্যরা বিশ্বাস করলেও পাহাড়ী আদিবাসীরা তা মানতে পারল না, তারা বলল এদিকেই আসবে। তাঁবু গুটিয়ে মাটিতে গর্ত করে আশ্রয় নিল লোকগুলো। তারপর...সত্যি সত্যিই এল ওটা, তছনছ করে দিয়ে গেল সব।'

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। চিন্তিত। 'আমারও এ ধরনের অনুভূতি হয় কখনও কখনও। বেশির ভাগ সময় খেটেও যায়।'

'হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস আমার অনুভূতিও খেটে যাবে এবার। অথচ বিজ্ঞানী হিসেবে আমার আঙ্কিক সূত্র মেনে চলা উচিত। চীফও তাই করছে। তাকে অনুভূতির কথা জানিয়েছি আমি, কিন্তু কাজ হয়নি। সে চায় প্রমাণ। যতক্ষণ তা না দিতে পারছি, ততক্ষণ লোকাল আবহাওয়া অফিসকে কিছুই জানাবে না লোকটা। আমি ভাবছি প্রমাণ পেতে পেতে দেরি না হয়ে যায়।'

'বাপ্‌রে!' সোজা হয়ে বসল রানা। 'তুমি দেখছি শিওর হয়েই বসে আছ, জ্যাক!'

'হ্যাঁ। আমি অলমোস্ট শিওর। ভয় হচ্ছে কি অবস্থা হবে ভেবে। স্যান্টিগো বে অগভীর। যদি ঝড় এসেই পড়ে...'

'দেরি করছ কেন তাহলে? সরাসরি নেভাল চীফকে জানাচ্ছ না কেন?'

চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল জ্যাকবসনের। 'ব্যাপারটা আমার জন্যে একটু কঠিন, রানা, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মত হয়ে যাবে। এখানে আমার কোন স্ট্যাটাস নেই। নেভি পার্সোনেল নই আমি, এমনকি আমেরিকানও নই। আমার কথা ভদ্রলোক বিশ্বাস করবেন বলে ভরসা হয় না। তবু কালকের দিনটা দেখব, তারপর যদি দরকার দেখি, জানাব তাঁকে।'

ফ্যাকাসে চেহারায় রানাকে দেখল ক্রিস্টি ম্যালোরি। 'সর্বনাশ! তাহলে?'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল ও বিশালদেহী এক শ্বেতাঙ্গকে দেখে। মানুষটা বয়স্ক। ভারিক্কি, হামবড়া ভাবসাব। ওপাশের এক টেবিল থেকে উঠে

এদিকেই আসছে—নজর সেঁটে আছে ক্রিস্টির ওপর। 'এই সেরেছে!' বিড়বিড় করে বলে উঠল মেয়েটি। 'এ ব্যাটা এখানে?'

কাছে এসে দাঁড়াল সে। 'তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি, ইয়াং লেডি?'

'খুব সম্ভব লন্ডনে,' বলল ক্রিস্টি।

সোজা হলো লোকটা, খানিকটা সরে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। মাথা ঝাঁকাল কয়েক মুহূর্ত পর, মর্তমান কলা সাইজের তর্জনী তুলে নাচাল। 'ঠিক, এইবার চিনেছি তোমাকে। তুমিই সেই খোঁচামারা সাংবাদিক, আমার এক উপন্যাস নিয়ে বিশ্রী ভাষায় তুলোধুনা করেছিলে আমাকে। ভুলিনি আমি, দেখেছ? তুমিও ওদের একজন, যারা আমার পয়সায় লিকার গিলে পরে আমারই পিঠে ছুরি মেরেছে সমালোচনার নামে।'

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল ক্রিস্টির। 'ভুল করছেন আপনি। আমি বোধহয় ওই দলে ছিলাম না।'

কিছুক্ষণ চোখ গরম করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা, তারপর বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে ল্যাভেটরির দিকে চলে গেল। টলছে।

'লোকটা কে?' রানা প্রশ্ন করল।

'চিনতে পারোনি?' কিছুটা বিস্মিত হলো ক্রিস্টি। 'নামকরা আমেরিকান লেখক, জারভিস কুপার। প্রচুর কামাই করছে ইদানীং।'

'এই জন্যেই এত দেমাগ!' মন্তব্য করল জ্যাকবসন। 'মূডের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেল। দুঃখিত।'

'দ্যাটস অল রাইট,' দুই কানের পিছনে চুল গুঁজল মেয়েটি। 'সমালোচনায় তেমন কড়া কিছু লিখিনি আমি। ব্যাটা আসলে সবসময় মানুষের নজর কাড়ার ধান্ধায় থাকে। আত্মপ্রচারে ওর জুড়ি মেলা কঠিন।'

'বাদ দাও,' রানা বলল। 'চলো ওঠা যাক্। রাত বেশি হলে পথে ঝামেলা হতে পারে।'

'কিসের ঝামেলা?' ঘুরে তাকাল জ্যাকবসন। 'তখন কি যেন বলবে বলেছিলে গাড়ি রিকুইজিশনের ব্যাপারে?'

'তোমাদের প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে,' নিচু কণ্ঠে বলল রানা। 'সেনাবাহিনীর জন্যে গাড়ি দরকার পড়েছে তার।'

'যুদ্ধ!' বিস্মিত হলো সে। 'কিসের? কার বিরুদ্ধে?'

'শুনছি ফ্যাভেলের বিরুদ্ধে।'

'কি বলছ? সে তো কবেই মারা গেছে।'

'কিন্তু পশ্চিমা সূত্রের মতে বেঁচে আছে লোকটা। বেশ বড়সড় বাহিনী নিয়ে সেইন্ট পিয়েরে আক্রমণ করতে আসছে খুব শীঘ্রি।'

'ও মাই গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল বিশেষজ্ঞ। ক্রিস্টির দিকে ফিরল। 'এই খবর পেয়ে এসেছ তুমি?'

'তা বলতে পারো।'

'যাওয়া যাক্।' উঠে পড়ল রানা। 'কাল আবার দেখা হবে।'

'ধরো,' নিজের গাড়ির চাবি ওর হাতে গুঁজে দিল জ্যাকবসন। 'আমার গাড়ি

নিয়ে যাও। আমি লুইসের গাড়িতে করে চলে যাব।'

'কাল তোমার অফিসে আসছি,' রানা বলল।

'নিশ্চই! কখন আসতে চাও?'

'দশটার দিকে?'

'চলে এসো।'

'যদি পরিস্থিতি ঘোলাটে না হয়,' রানা বলল।

'না হওয়ার চান্সই বেশি। সেরারিয়ের হারামজাদা ছায়াকেও ভয় পায়। প্রায়ই ঘটায় এই কাণ্ড, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কিছুই না।'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। অনেক রাত তখন। গুমোট গরম। খানিকদূর এগিয়ে থামতে হলো ওদের শহরের মূল স্কয়ার, প্লেস দে লা লিবারেশন নোইরের কাছে। মিলিটারি ট্রাকের বড় এক কনভয় এগিয়ে যাচ্ছে উত্তরে। ওগুলোর পিছনে মার্চ করে চলেছে আর্মির ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন।

বোঝার ভারে দরদর করে ঘামছে মানুষগুলো। রাস্তার আলোয় কড়া পালিশ দেয়া কালো জুতোর মত চকচক করছে তাদের চেহারা।

'হারিকেনের ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়, রানা?' সামনের মিছিলের ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করল ক্রিস্টি। জ্যাকের ধারণা সত্যি হলে...' কথা শেষ না করে থেমে গেল।'

'হওয়ার চান্স বেশি,' সামনের ট্রাফিক পুলিসটিকে ক্লীয়ার সিগন্যাল দিতে দেখে গিয়ার এনগেজ করল ও। গাড়ি ছেড়ে দিল। 'ওর সম্পর্কে তোমাকে যা বলা হয়নি, তা হচ্ছে জ্যাকের বাবা-মা, ভাই-বোনসহ কাছের আত্মীয়স্বজন সবাই এই হারিকেন আর জলোচ্ছ্বাসে মারা গেছে সেইন্ট কিটস্ দ্বীপে।'

'এক সাথে?'

'হ্যাঁ। দেশে থাকলে জ্যাককেও মরতে হত। ভাগ্য ভাল ইংল্যান্ডে ছিল ও। পাস করে একটা ভাল চাকরিতে জয়েনও করেছিল। কিন্তু ওই দুর্ঘটনার পর ছেড়ে দিল চাকরিটা। অসময়ে মিটিওরোলজি নিয়ে নতুন করে পড়াশুনা করে এই চাকরিতে এসেছে ও।'

'মাই গড!' কিছু সময় চুপ করে থাকল মেয়েটি। 'ভেরি স্যাড!'

'হ্যাঁ। আমি যদ্দূর জানি জ্যাক এই অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাপারে আসলেই একজন বিশেষজ্ঞ। কাজেই ওর ধারণা সত্যি হওয়ার চান্স আমার ধারণা আশি ভাগ।'

'ম্যাবেল আর ফ্যাভেল,' মৃদু শব্দ করে হাসল সে। 'নামের কি অদ্ভুত মিল। কি বলো?'

'কাজের মিলও আছে।'

'মানে?'

'এলে দুটোই ধ্বংস আর মৃত্যু নিয়ে আসবে।'

গম্ভীর হয়ে গেল ক্রিস্টিনা।

পরদিন ঠিক দশটায় ক্যাপ সারাত বেজের গেটে পৌঁছল ওরা। বেশ বড় জায়গা,

চারদিক ঘন বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেজের এক মাথায় স্যান্টিগো বে-র জেটিতে কয়েকটা ছোটবড় নেভাল শিপ দেখতে পেল ওরা। ভেতরের এয়ারস্ট্রিপে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ফাইটার, একটা সুপার কনস্টিলেশন, আর দুটো কপ্টার।

গেটে বলে রেখেছিল জ্যাকবসন, তাই কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো না। এক মেরিন পথ দেখিয়ে তার অফিসে পৌঁছে দিয়ে গেল ওদের দু'জনকে। ভেতরে ঢুকে কৌতূহল নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ক্রিস্টি। রেডার, মনিটর, জটিল যন্ত্রপাতি দেখতে পাবে আশা করেছিল, কিন্তু চার্ট আর কয়েকটা ছবি ছাড়া কিছু নেই দেখে হতাশ হলো।

'বোসো,' বলল জ্যাকবসন। 'কফি?'

'শিওর!' মাথা ঝাঁকাল ক্রিস্টি।

রানা বসল না, জ্যাকবসনের পিছনের চার্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'ম্যাবেলের খবর কি, জ্যাক?'

'ভাল না। আসছে।' ইন্টারকমে কফির নির্দেশ দিল সে।

'তোমাদের এইসব চার্টের হাতা-মাথা কিচ্ছু বুঝি না আমি,' অভিযোগের সুরে বলে উঠল ক্রিস্টি। 'দেখে মনে হয় সহজ-সরল একটা বিষয়কে অনর্থক জটিল করে তোলা হয়েছে।'

হেসে উঠল বিশেষজ্ঞ। 'আসলে ঠিক উল্টো। ওখানে খুব কঠিন এক পরিস্থিতিকে যথাসম্ভব সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়।' ছবিগুলোয় টোকা দিল। 'স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এগুলো পাই আমরা। নিচের এই যে স্কেল দেখছ, এটা মেপে ঝড়ের ব্যাপ্তি বের করি। তারপর অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ বের করি এই মার্কগুলো দেখে। এগুলো পরে তোলা হয় চার্টে।'

চেয়ারে এসে বসল রানা। একই সময় কফি নিয়ে এল ক্যান্টিন-বয়।

'এগুলো ম্যাবেলের ছবি?' নিজের কাপে চুমুক দিয়ে বলল ও।

'হ্যাঁ,' জ্যাকবসন মাথা দোলাল। 'এইমাত্র ঝড়টার বর্তমান অবস্থান বের করলাম। আমাদের ছয়শো মাইল দক্ষিণ-পুবে আছে এখন, ঘণ্টায় দশ মাইলের কিছু বেশি গতিতে উত্তর-পশ্চিম দিকে আসছে। ওটার ভেতরের বাতাসের চাপ বেশ জোরাল, ঘণ্টায় একশো সত্তর মাইল।'

কপাল কুঁচকে উঠল রানার। 'উত্তর-পশ্চিমদিকে আসছে,' আনমনে বলল। 'তার মানে সরাসরি এদিকে?'

'হ্যাঁ। তবে ঘূর্ণিঝড় কখনও সোজা পথ ধরে আসে না, ঘন ঘন দিক বদলায়, এই যা ভরসা। এদের এঁকেবেঁকে চলা নিয়ে অল্প-স্বল্প গবেষণা করেছি আমি।' বড় একটা রেকর্ড বই দেখাল জ্যাকবসন। 'এটায় কয়েকটা হারিকেনের রেকর্ড আছে। তার কয়েকটা এদিকে আসতে গিয়েও আসেনি, কয়েকটা এসেছে।'

'ঘূর্ণিঝড় হয় কেন?' প্রশ্ন করল ক্রিস্টি।

'গরম যখন বেশি পড়ে, তখন বাতাস প্রায় স্থির থাকে খেয়াল করেছ হয়তো। এই বাতাস গরম হয়ে হাল্কা হয়ে পড়ে, সাগরের সারফেস থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প নিয়ে ওপরে উঠে যায়, এর ফলে বাতাসের স্তরে যে ফাঁক সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করতে চারদিক থেকে ছুটে আসে হালকা, ঠাণ্ডা বাতাস। বাতাসে বাতাসে

সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় ঘূর্ণির। পৃথিবীর ঘোরার ফলে তা ক্রমেই বেগ পেতে থাকে, এর পুরো প্রক্রিয়া মিলে একসময় ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

'যে জলীয়বাষ্প ওপরে উঠে গেছে, এই সময় তা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ার চেষ্টা করে। গরম বাতাসও। কিন্তু নিচের বাতাস তাদের বাধা দেয় প্রচণ্ড শক্তিতে, এই শক্তিও উত্তপ্ত করে তোলে পরিবেশ, ঘূর্ণির গতি বাড়তে থাকে। মারাত্মক পরিস্থিতি দেখা দেয়। সেকেন্ডে প্রায় দশ লাখ টন বাতাস ওপরে উঠতে থাকে তখন নিচের চাপ খেয়ে।

'এবার, বাতাস যত পাক খায়, ততই বাইরের দিকে ছড়াতে থাকে। এই জন্যে ঝড়ের ঠিক মাঝখানের বায়ুর চাপ একদম কমে যায়, ওটাকে বলা হয় ঝড়ের চোখ। এই জায়গা দখল করার জন্যেও বাতাস ছোটার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। চারদিকের ঘূর্ণি তাকে ওই জায়গা থেকে টেনে সরিয়ে রাখে, এর ফলে অবিশ্বাস্য গতি পায় ঝড়, বিধ্বংসী হয়ে ওঠে। লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে ঘোরে- প্রচণ্ড শক্তিশালী এক প্রক্রিয়া। এই যে ম্যাবেল, হাজারটা হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও শক্তিশালী এটা।'

অনেক আগেই মুখ শুকিয়ে গেছে মেয়েটির। জ্যাকবসনের বলা শেষ হতে আরও শুকিয়ে উঠল। রুদ্ধশ্বাসে কেবল বলল, 'মা-ই গুডনেস!'

'এতবড় ঝড় এর আগে কখনও হয়েছে সান ফের্নান্দেজে?' রানা জানতে চাইল।

মাথা ঝাঁকাল বিশেষজ্ঞ। 'হয়েছে, উনিশশো দশে। জলোচ্ছ্বাসে সেইন্ট পিয়েরের ছয় হাজার মানুষ ভেসে গিয়েছিল।'

'তখনকার ছয় হাজার মানে তো বিরাট ব্যাপার!'

'হ্যাঁ। এটা যদি আসে, আর সময়মত ব্যবস্থা নেয়া না হয়, তাহলে এবার হয়তো ষাট হাজার মরবে।'

আরেক দফা কফি এল। আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। কিন্তু আর জমল না। বেজের অফিসার্স ক্লাবে দুপুরের খাওয়া সেরে নিল ওরা। তারপর ক্রিস্টিকে নিয়ে হোটেলে ফিরে চলল রানা। জ্যাকবসন অফিস সেরে সন্ধেয় শহরে আসবে।

এক মনে ড্রাইভ করছে রানা। গুমোট গরম আরও অনেক বেড়ে গেছে, বাতাস প্রায় নেই। রাস্তাঘাট কেমন ফাঁকা ফাঁকা, লোকজন কম। দু'পাশের সবুজ কলা আর আনারসের বাগান ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে, পাতা নড়ছে না। মিলিটারি বোঝাই দুটো বড় ট্রাক হাঁ-হাঁ করে ছুটে গেল ওদের পাশ কাটিয়ে।

'অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার,' ক্রিস্টি বলল। 'যদি...' গাড়ি থেমে পড়ছে দেখে পাশে তাকাল। 'কি হলো, থামছ যে?'

'ওই দেখো,' নিজের দিকের জানালা দিয়ে রাস্তার পাশের ছোট একটা পাহাড় ইঙ্গিত করল মাসুদ রানা। পাহাড়ের ওপরে ছোট ছোট কয়েকটা কুটির। এক বৃদ্ধকে দেখা গেল নিজের কুটিরের সামনে বড় একটা গোঁজ পুঁতছে মাটিতে। এক মনে কাজ করছে সে, খেয়াল নেই কোনদিকে।

'কি করছে লোকটা?'

'ঘর সিকিওর করছে। চলো, দেখে আসি।'

'এরমধ্যে দেখার কি আছে?' বলল মেয়েটি। 'শুধু শুধু এই গরমে অত উঁচুতে গিয়ে...'

'কাল রাতে জ্যাক কি বলেছিল ভুলে গেলে?'

'কি বলেছিল?' চোখ কোঁচকাল সে।

'ঝড়-বন্যা এলে আদিবাসীরা টের পায়, বলল না? দেশের কেউ এখনও ঝড়ের খবর জানে না, অথচ ওই লোকটা ঘর বাঁচাবার কাজে লেগে গেছে, এর মানে...'

'গুড গড!' ঝট্ করে দরজা খুলে ফেলল ক্রিস্টি। 'চলো, চলো! সত্যি, মনেই ছিল না।'

পাহাড়টা ফুট চল্লিশেক উঁচু হবে, তার ওপর বেশ ঢালু, কাজেই চড়তে বেশি কষ্ট হলো না। তবে গরমে হাঁপিয়ে উঠল ওরা, ঘামছে দরদর করে। কাজে ব্যস্ত বৃদ্ধের অবস্থা আরও শোচনীয়, তবে ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই তার চেহারায়। পাথুরে মাটিতে হাতুড়ি দিয়ে খুঁটি পোঁতার নিরলস চেষ্টা করে চলেছে।

ঘরের চালে বড় একটা জাল বিছানো দেখল ওরা। জালের চার কোনায় চারটে লম্বা দড়ি—খুঁটির সাথে ওগুলো বাঁধবে সে। রানা ও ক্রিস্টিকে দেখে মৃদু হাসল বৃদ্ধ, তারপর আবার কাজে লেগে গেল।

ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি করছেন আপনি, ব্লাঙ্ক?'

হাতুড়ি রেখে ঘামে ভেজা চকচকে মুখ তুলে তাকাল সে, পাশে ফেলে রাখা শার্ট তুলে মুখের, গলার ঘাম মুছল। 'আমার ঘরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছি।'

সিগারেটের প্যাকেট বের করে বৃদ্ধকে একটা দিল ও, নিজেও ধরাল। লম্বা টান দিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিল লোকটা, চেহারা দেখে বোঝা গেল খুশি হয়েছে।

'আমেরিকান সিগারেট? খুব ভাল, ধন্যবাদ, ব্লাঙ্ক।'

'কাজটা খুব কঠিন মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল ও।

'তা তো হবেই।' মাটিতে পা ঠুকল লোকটা। 'পাথুরে মাটি যে!'

'কিন্তু কাজটা কেন করছেন আপনি?'

'ঝড় আসছে,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল সে।

ক্রিস্টির সাথে চোখাচোখি হলো রানার। 'ঝড়?' বলল ও।

'হ্যাঁ। খুব বড় ঝড়।'

'কি করে জানলেন আপনি?'

ওকে দেখল বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'মন বলেছে,' হাত তুলে অনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে আকাশ-বাতাস বোঝাতে চাইল। 'সময় এলে এসব দেখে বুঝতে পারি আমি।'

'আপনার বউ-ছেলেমেয়েরা কোথায়?'

'নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি। দূরে।'

আরেকটা সিগারেট দিল তাকে রানা। 'খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে!'

ঘুরে স্যান্টিগো উপসাগরের দিকে তাকাল সে। কড়া রোদে চিকচিক করছে স্থির পানি, দৃষ্টি ঝলসে যায়। 'ভয় পাওয়ারই তো কথা, ব্লাঙ্ক। যা আসছে, তার

সাথে লড়াই করার ক্ষমতা নেই মানুষের।'

খানিক চুপ করে থাকল ও। 'আপনি ঠিক জানেন ঝড় এদিকেই আসছে?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'কখন আসবে?'

মেঘহীন আকাশের দিকে তাকাল লোকটা, তারপর ঝুঁকে এক মুঠো ধুলো নিয়ে একটু একটু করে ছাড়তে লাগল। 'দুদিন,' ঘোষণা করল সে। 'খুব বেশি হলে তিনদিন পর। এর বেশি নয়।'

অবাক হলো ও। আশ্চর্য! জ্যাকবসন যে সময়ের কথা বলেছে, তার সাথে সম্পূর্ণ মিলে গেছে অশিক্ষিত লোকটার হিসেব। ক্রিস্টি স্তব্ধ বিস্ময়ে অনড়। একভাবে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। হিসেবের মিল সে-ও বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তা এত নিখুঁত হয় কি করে, মাথায় আসছে না।

অন্য ঘরগুলো দেখাল রানা। 'এরা সবাই কোথায়?'

'নিরাপদ জায়গায় সরে গেছে।'

'এখানে তাহলে আপনি একাই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি যাচ্ছেন না?'

মাথা দোলাল বৃদ্ধ ডানে-বাঁয়ে। 'না। পাহাড়ে একটা গুহা আছে। কাজ শেষ করে ওখানে গিয়ে থাকব বিপদ না কাটা পর্যন্ত।'

'ঘরের দরজা খোলা রাখবেন,' বলল রানা। 'ঝড়ের সময় বাতাস চলাচলে সুবিধে হবে।'

'জানি। বন্ধ দরজা পছন্দ করে না বাতাস।' হাসল বৃদ্ধ। ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, আবার কথা বলে উঠল সে। 'ঝড় আরও একটা আসছে।'

'সেটা কি?'

'ফ্যাভেল।'

'কি বললেন?' উত্তেজিত হয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল ক্রিস্টি। বৃদ্ধকে চোখ কোঁচকাতে দেখে তাড়াতাড়ি ওর প্রশ্নটা ফরাসীতে করল রানা।

'এ খবর কোত্থেকে পেলেন আপনি?'

হাতুড়ি নিয়ে কাজে লেগে পড়ল লোকটা। সরাসরি উত্তর এড়িয়ে বলল, 'পাহাড় থেকে নেমে আসছে সে।'

মানুষটা আলোচনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে দেখে ফিরে চলল ওরা। 'ব্যাটা ফ্যাভেলের পক্ষের মনে হয়,' গাড়ির কাছে পৌঁছে মন্তব্য করল ক্রিস্টি।

'হতে পারে।'

'কিন্তু আশ্চর্য! ঝড় সম্পর্কে এত শিওর লোকটা, সময়ের হিসেবটাও এত নিখুঁত, ভাবতে ভীষণ অবাক লাগছে আমার। কি করে সম্ভব?'

'জ্যাক যা বলেছে, সেটাই ঠিক,' বলল রানা। 'এরা শিক্ষা-দীক্ষায় বহু মাইল পিছনে পড়ে আছে, তাই প্রকৃতি এই বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে এদের। বিপদ-আপদ আগে থেকে টের পায় বলে এখনও বেঁচে আছে এইসব অর্ধসভ্য, অশিক্ষিত আদিবাসীরা। নইলে এ অঞ্চলে যে পরিমাণ ঝড় বন্যা হয়, তাতে কবেই মরে সাফ

হয়ে যেত।'

মাথা দোলাল সে চিন্তিত চেহারায়। 'ঠিক। ম্যাবেল যদি আসেই, তাহলে নিশ্চই...'

'যদি নয়,' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'ধরে নাও এসে পড়েছে। অন্তত আমার তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

তিন

একটু আগে স্যাটেলাইটের পাঠানো নতুন ছবিগুলো ঘণ্টাখানেক ধরে পরীক্ষা করল ড্যানিয়েল জ্যাকবসন। গতির হিসেব বের করল—একটু বেড়েছে। ঘণ্টায় এগারো মাইল গতিতে এগোচ্ছে। এখনও প্রায় একই আছে গতিপথ, অঙ্কের হিসেব মতে পাশ কাটাবার সময় সান ফের্নান্দেজকে ছুঁয়ে যাবে ম্যাবেল। কয়েক ঘণ্টার ঝোড়ো বাতাস আর কয়েক পশলা জোর বৃষ্টি, এর বেশি কিছু ঘটবে না।

তবু মন মানে না। স্বস্তি পাচ্ছে না জ্যাকবসন। আবহাওয়া বিজ্ঞানের সূত্রের ওপর পুরো ভরসা রাখতে বাধছে। এরকম অনেক ঘূর্ণিঝড় দেখেছে সে যেগুলো একেবারে শেষ মুহূর্তে বাঁক নিয়ে যে সব দ্বীপের ক্ষতি হবে না বলে নিশ্চিত পূর্বাভাস ছিল, সে সবের চরম ক্ষতি করে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, সে এখনও নিশ্চিত যে ওটা এদিকেই আসবে। অনুভূতি একই রকম আছে তার।

মুশকিল হচ্ছে এসব চীফকে শোনাতে গেলে সে বিশ্বাস করবে না। চুলচেরা হিসেবও যে কখনও কখনও উল্টে যায়, অঘটন ঘটে যায়, তা মানতে রাজি নয় সে। কারণ মানতে গেলে ঝুঁকি নিতে হয়, পূর্বাভাস ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর কোনটাই পছন্দ নয় লোকটার। তবু একবার তার সাথে আলোচনা করবে ভেবে উঠল জ্যাকবসন। করিডরে পা রাখামাত্র কেমন এক টান্ টান্ উত্তেজনার আভাস পেল। চোখ কুঁচকে এদিক ওদিক তাকাল সে। মেইন গেটসহ ফেন্সের যেখানে যেখানে গার্ড পোস্ট আছে, সবখানে মেরিনদের পুরো যুদ্ধের সাজে মোতায়েন দেখে চমকে উঠল। ওদের সবার হাতে সাব-মেশিনগান।

কি ব্যাপার! প্রশ্ন করার মত ধারেকাছে কাউকে দেখল না সে। অফিস আওয়ারে করিডরে আর কেউ না থাক, দু'চারজন অর্ডারলি অন্তত থাকে। তারা কেউ নেই। তাড়াতাড়ি চীফের রুমে চলে এল জ্যাকবসন। মুখ তুলে ওকে দেখল লোকটা।

'এসো। কোন খবর আছে?'

'বাইরে কি ঘটেছে?' জানতে চাইল সে। 'মেরিনরা...?'

চোখমুখ কুঁচকে উঠল হুইটনি স্মিথের। 'ওই সেই! প্রায়ই যা ঘটে। ফ্যাভেলের ভয়ে কালাজ্বর হয়েছে সেরারিয়েরের। দুপুরের পর ওদের চার গাড়ি আর্মি এসে হাজির দেখে নেভাল চীফ রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করেছেন। তারপর, তুমি কি মনে করে?'

'ম্যাবেল সম্পর্কে কথা বলতে এসেছি।'

'ও হ্যাঁ, ম্যাবেল। বোসো। এখন গতি কিরকম ওটার?'

বসল বিশেষজ্ঞ। 'ঘণ্টায় এগারো মাইল। গত নয় ঘণ্টায় প্রায় একশো মাইল এগিয়েছে।'

'কোন্‌দিকে?' কপাল কুঁচকে উঠল চীফের।

প্রশ্নের ভেতরের চাতুরী ধরতে পেরে সে-ও একটু ঘুরিয়ে বলল, 'আগের মতই। প্রায়।'

'প্রায়?'

'একটু তেরছা আর কি। তবে অন্য কয়েকটা ঝড়ের মত শেষ মুহূর্তে দিক বদলে এদিকে এসে পড়ার চান্স আছে।'

'এখন কোথায় আছে?' হেলান দিয়ে বসল চীফ। কলমের গোড়া দিয়ে কপাল চুলকাচ্ছে।

'গ্রেনাডা আর টোবাগোর মাঝখান দিয়ে লস টেস্টিগোসের দিকে এগোচ্ছে। ও দুটোর যথেষ্ট ক্ষতি করে এসেছে। যদি বর্তমান কোর্সেই থাকে, তাহলে পঞ্চান্ন সালের জ্যানেট আর হিলডার মত হঠাৎ ঘুরে...'

'তা করবে না,' মাথা দোলাল লোকটা। 'এটা নিশ্চই উত্তরে সরে যাবে।'

'জ্যানেট আর হিলডারও তাই করার কথা ছিল,' শান্ত গলায় জ্যাকবসন বলল। 'কিন্তু তা হয়নি। তাছাড়া ম্যাবেল যদি ওদিকেই যায়, যাওয়ার পথে সামান্য ঘুরলেই সোজা এই দ্বীপের ওপর এসে পড়বে। লোকাল ওয়ার্নিং ইস্যু করেছেন?'

'না। এখনই তার প্রয়োজন দেখছি না। এদের তো জানোই, জানালেও কিছু করবে না, হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। তার ওপর এখন দেশের যা অবস্থা দেখছি, জানিয়ে লাভ কি?'

'তা হোক, আপনার রেকর্ড তো ক্লীন থাকত।'

'বুঝলাম, কিন্তু জানাব কাকে? এতদিন আইল্যান্ড অ্যাফেয়ার মিনিস্টারের দায়িত্বে ছিল এদের আবহাওয়া অফিস। দুদিন আগে তাকে বরখাস্ত করেছে সেরারিয়ের, তার দফতর নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তাকে এ খবর জানানো কোনমতেই সম্ভব নয়।'

'ওনাদিকে বরখাস্ত করেছে?' অবাক হলো জ্যাকবসন। 'কবে?'

'পরশু। লোকটা এখন কোথায় যে আছে, কে জানে! হয় তাকে মেরে ফেলা হয়েছে, নয়তো...' থেমে শ্রাগ করল চীফ। 'জানো তো, সিকিউরিটি ফোর্সের চীফ ছিল ওনাদি।'

মাথা ঝাঁকাল অন্যমনস্ক বিশেষজ্ঞ। 'তাহলে সেরারিয়েরকেই জানান।'

'আমার মনে হয় না ব্যাটা এখন এই খবর শোনার মূডে আছে। তবু দেখি, কি করা যায়।'

'আপনাদের নেভাল চীফকেও জানিয়ে দিন।'

'কমোডর ব্রাইট জানেন।'

'জানেন!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল জ্যাকবসনের কণ্ঠ। 'এই ঝড়ের ধরন, আচরণ,

সব জানেন?'

'অত কথা বলিনি আমি,' হঠাৎ করেই বিরক্তির আভাস ফুটল চীফের চেহারায়। আন্তরিকতা উবে গেল। 'শোনো, জ্যাক, এতসব তাঁকে জানাতে হলে তোমার অনুভূতিতে কাজ চলবে না, প্রমাণ পেতে হবে আমাকে। একদম তথ্য নির্ভর, কংক্রিট প্রমাণ। যদি তোমার হাতে তা না থাকে, তাহলে দয়া করে মুখ বন্ধ রাখো। নিজের কাজে যাও।'

ঝাড়া দশ সেকেন্ড লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল জ্যাকবসন। তারপর শান্ত, তবে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমি কমোডরের সঙ্গে দেখা করব, স্মিথ।'

মাথা দোলাল সে। 'কমোডর যথেষ্ট ব্যস্ত এখন। আবহাওয়ার খবর শোনার মত সময় তাঁর নেই।'

উঠে পড়ল ও। 'আমি যাচ্ছি দেখা করতে। দেখি তাঁর সময় হয় কি না।'

তাজ্জব হয়ে গেল চীফ। 'তুমি আমাকে ডিঙিয়ে দেখা করবে কমোডরের সাথে? ভেবে বলছ তো?'

'হ্যাঁ,' আরেকদিকে তাকিয়ে বলল জ্যাকবসন। ভাবল এখনই বিস্ফোরিত হবে লোকটা, চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

'ঠিক আছে,' শান্ত গলায় বলল সে। 'ব্যবস্থা করছি আমি, তুমি তোমার অফিসে অপেক্ষা করো। তবে মনে রেখো, এতে তোমার ক্ষতি হতে পারে।'

'হলে হবে। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির চিন্তা করে এই চাকরিতে ঢুকিনি আমি।' দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এল জ্যাকবসন। অপেক্ষার সময়টা খরচ করল কমোডরের সামনে তুলে ধরার মত উপযুক্ত এক রিপোর্ট তৈরির পিছনে। অপেক্ষা করার কথা স্মিথ কেন বলেছে বোঝে ও। নিশ্চই সঠিক খবর তাকে জানায়নি সে। এ অবস্থায় জ্যাকবসন দেখা করতে গেলে অসুবিধে আছে।

সে চাইছে আগে নিজে দেখা করবে কমোডরের সাথে। নিজের ক্ষতি হওয়ার পথ মেরে তবে ডাকবে ওকে। মনে মনে হাসল জ্যাকবসন। এ মুহূর্তে ব্যাটা হয়তো কমোডরের রুমে। দেড় ঘণ্টা পর ডাক পড়ল ওর। ভেতরে ঢোকার আগে প্রায় পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো আউটার অফিসে। ভেতরে রাশভারী কমোডরের প্রকাণ্ড ডেস্কের পাশে পিছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে হুইটনি স্মিথ। জ্যাকবসনকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

নিখুঁত ছাঁটের ইউনিফর্ম পরা দীর্ঘদেহী, স্লিম নেভাল চীফ তাকালেন ওর দিকে। চাউনি সৈনিকসুলভ কঠোর, তবে নিরপেক্ষ। 'আপনাদের দু'জনের মধ্যে ওয়েদার নিয়ে কিছু টেকনিক্যাল মতানৈক্য দেখা দিয়েছে শুনলাম, জ্যাকবসন। আপনার কি বলার আছে এ ব্যাপারে?'

অল্প কথায় গুছিয়ে বলল সে। নিজের মতামতের সাথে অতীতের কিছু রেফারেন্স যোগ করতেও দ্বিধা করল না। ওর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পলকের জন্যেও চোখ সরল না কমোডরের, দু'হাতের ওপর থুতনি রেখে চুপ করে শুনে গেলেন।

'বুঝলাম,' বললেন তিনি। 'কয়েকটার আসার কথা না থাকলেও এদিকে এসেছে, এই তো আপনার যুক্তি?' জ্যাকবসনকে মাথা দোলাতে দেখে যোগ

করলেন। 'অন্যগুলো আসেনি। এ দ্বীপে শেষ বড় ঘূর্ণিঝড় আঘাত করেছে উনিশশো দশে। কয়েক দশক চলে গেছে তারপর, মোটামুটি নিরাপদে। এখন এই ম্যাবেল এদিকে আসবে বলছেন আপনি, যদি না আসে?'

'শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড থিওরির ওপর নির্ভর করলে সেরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক,' বলল জ্যাকবসন। 'কিন্তু আমি বলতে চাইছি আমাদের কোনমতেই ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। আমার হিসেবে ম্যাবেলের সান ফের্নান্দেজে হিট করার সম্ভাবনা শতকরা ত্রিশ ভাগ, স্যার। যদি তাই হয়, বন্যায় ধুয়েমুছে যাবে সেইন্ট পিয়েরে।'

তার এগিয়ে দেয়া রিপোর্ট আগ্রহ নিয়ে দেখলেন কমোডর। চিন্তায় পড়েছেন মনে হলো। বেশ কিছুক্ষণ পর মুখ তুললেন তিনি। 'আপনার কি মত?' প্রশ্ন করলেন হুইটনি স্মিথকে।

'আমি জ্যাকবসনের অনুমান মেনে নিতে রাজি, স্যার। কিন্তু অনুভূতি নয়। এখনও পর্যন্ত এমন কোন নিরেট তথ্য পাওয়া যায়নি যাতে ম্যাবেল ওরকম আচরণ করতে পারে বলে আশঙ্কা করার কোন কারণ আছে। ওটা নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে যেতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সরে গেলে যে এদিকেই আসবে, তার নিশ্চয়তা কি? অন্যদিকেও তো যেতে পারে।'

'জ্যাকবসন?'

'উনি ঠিকই বলেছেন, স্যার। তবে আমার আশঙ্কার কারণ হিসেবে আর দুই একটা তথ্য আপনাকে জানাতে চাই। উনিশশোতে গলভেস্টনে, এবং তার দশ বছর পর সান ফের্নান্দেজে যে দুই হারিকেন হিট করেছিল, তাতে হাজার হাজার মানুষ মরেছে বন্যায়। তখন এ অঞ্চলের জনসংখ্যা অনেক কম ছিল, স্যার।'

'বন্যা? অতি বৃষ্টির জন্যে?'

'না, স্যার। সাগরের জন্যে।'

'কিরকম?' দু'হাত ডেস্কে রেখে ঝুঁকে বসলেন কমোডর।

'হারিকেনের কেন্দ্রে বাতাসের চাপ থাকে অস্বাভাবিক কম, স্যার। একটা খালি হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের সাথে তুলনা করা চলে এই বায়ুশূন্য স্তরের। যখন সাগরের ওপর দিয়ে ছোটে ঘূর্ণিঝড়, তখন এই সিরিঞ্জ টনকে টন পানি টেনে তোলে ভেতরের ফাঁকটা পূরণ করার জন্যে। সাধারণ যে কোন ঘূর্ণিঝড়ও করে এটা। কিন্তু ম্যাবেল সাধারণ নয়, স্যার। এর ভেতরের বায়ুর চাপ সাধারণগুলোর তুলনায় অনেক কম, লক্ষ লক্ষ টন পানি তুলে আনবে ওটা আসার পথে। কম করেও বিশ ফুট উঁচু হবে জলোচ্ছ্বাস।'

জানালা দিয়ে বাইরে দেখাল জ্যাকবসন। 'ম্যাবেল যদি আসে, দক্ষিণ থেকে সোজা এসে পড়বে স্যান্টিগো উপসাগরে, হয়তো সরাসরি এই বেজের ওপরই। এটা অগভীর, বিশ ফুট উঁচু টাইডাল বোরও যদি হিট করে এসে, উপসাগর ফুলে ফেঁপে উঠবে, কম করেও পঞ্চাশ ফুট উঁচু হয়ে আছড়ে পড়বে তীরে। কিন্তু এই বেজের সবচে' উঁচু পয়েন্ট আমাদের অ্যান্টেনা–মাত্র পঁয়তাল্লিশ ফুট। তার ফল কি হবে, আপনি নিশ্চই বুঝতে পারছেন, স্যার।'

'বলে যান,' নরম গলায় কমোডর বললেন। 'মনে হচ্ছে কথা এখনও কিছু

রয়ে গেছে আপনার।'

'জ্বি, স্যার। উনিশশো দশের বন্যায় সেইন্ট পিয়েরের অর্ধেক জনসংখ্যা সাফ হয়ে গিয়েছিল। ছয় হাজার মানুষ। প্রস্তুতি না থাকলে এবারও তাই ঘটবে। তবে সেইন্ট পিয়েরের এখনকার জনসংখ্যা ষাট হাজার। অর্ধেক মরলে দাঁড়াবে ত্রিশ হাজার।'

স্মিথের দিকে ফিরলেন নেভাল চীফ। কপালে চিন্তার ভাঁজ ক্রমে গভীর হচ্ছে তাঁর। 'এঁর বক্তব্যে কোথাও কোন ভুল আছে?'

যেন ইচ্ছে নেই, তবু বলতে হচ্ছে, এমন ভাব করল সে। 'থিওরিটিক্যালি নেই, স্যার।'

'বেশ, তাহলে আরেকবার ম্যাবেলের পরিস্থিতি দেখতে প্লেন পাঠান। নরম্যান লুইস ছুটি নিয়েছে, ওর জায়গায় অন্য পাইলট দরকার হবে।'

'টেকনিক্যাল স্টাফও বদল করতে চাই আমি, স্যার। এঁর বদলে আর কাউকে পাঠাতে চাই।'

জ্যাকবসন শক্ত হয়ে গেল। 'এমন মন্তব্য আমার পেশাগত কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি অসম্মানজনক কটাক্ষ।'

চাউনি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কমোডরের। টেবিলে জোর এক চাপড় মেরে বললেন, 'না, তা নয়। ডাক্তারদের মধ্যেও রোগীর অসুখ সনাক্ত করা নিয়ে মতের অমিল দেখা যায়। এটাও সেরকম। আমি তৃতীয় একজনের মত জানতে চাই। পরিষ্কার?'

'ইয়েস, স্যার।'

'গুড! যাবেন না, দাঁড়ান। স্মিথ, আপনার কি হলো আবার, কেন দাঁড়িয়ে আছেন? যান, জলদি ফ্লাইটের ব্যবস্থা করুন।' সে বেরিয়ে যেতে জ্যাকবসনের দিকে ফিরলেন নেভাল চীফ। গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। 'আপনি আমাকে কি করতে বলেন? আমার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন?'

'একটুও দেরি না করে সবগুলো শিপ সাগরে পাঠিয়ে দিতাম, স্যার, সমস্ত বেজ পার্সোনেলসহ। এয়ারক্র্যাফটস পাঠিয়ে দিতাম পুয়ের্টো রিকায়। প্রেসিডেন্ট সেরারিয়েরকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে, যতদূর সম্ভব, চেষ্টা করতাম। আপনারও তাই করা উচিত এখন, স্যার।'

'খুব সহজ মনে হচ্ছে আপনার কাজগুলো,' মন্তব্য করলেন তিনি।

'না, স্যার। তবে দু'দিনের মধ্যে করা সম্ভব। হাতে দু'দিন সময় আছে। চেষ্টা করলে আমেরিকান নাগরিকদের তো অবশ্যই, যতদূর সম্ভব বিদেশী নাগরিকও সরিয়ে নেয়া যায় এরমধ্যে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কমোডর। 'যদি পারতাম! কাল রাতে এদেশে মিলিটারি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে, বিদ্রোহী বাহিনীর সাথে যে কোন সময় সরকারী বাহিনীর লড়াই শুরু হয়ে যাবে। আমাদেরকেও তাই অফিশিয়াল জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে। কোন আমেরিকানকে বের হতে দেয়া হচ্ছে না বেজ থেকে, বাইরে যারা আছে, নিরাপত্তার জন্যে তাদেরকেও ভেতরে চলে আসতে বলব আমি আজই।

'আপনি তো এ দেশী, ভালই জানেন সেরারিয়ের মার্কিনীদের কি চোখে দেখে। তাকে আমরা ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি, আমরা বিদ্রোহীদের অস্ত্র জোগান দিচ্ছি, এসব তো সব সময়ই বলে সে। তার ওপর এই পরিস্থিতিতে যদি তাকে ঘূর্ণিঝড়ের খবর দিতে যাই আমরা, অবশ্যই অন্যরকম ভাববে ব্যাটা। কাজেই তুলবে না। বলতে গিয়ে শুধু শুধু মুখ নষ্ট হবে। বরং আমি বিদ্রোহীদের দিক থেকে তার মন অন্যদিকে সরাবার চেষ্টা করছি ধরে নিয়ে যা-তা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে।

'বাইরে তার চার ট্রাক আর্মি অপেক্ষা করছে, আমরা ঘাঁটি ছাড়লেই ওরা বেজ দখল করে নেবে। ভেতরে আরও কারণ আছে, সব আপনাকে বলা যাবে না। কাজেই অনুমানের ওপর আমি ঘাঁটি ছাড়তে রাজি নই। মনিটরিঙ ফ্লাইট ফিরে আসুক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।'

'ওটা ফিরে আসতে অনেক রাত হবে, স্যার। যদি খারাপ খবর আসেই, রাতে বিশেষ কিছু করতে পারবেন না আপনি। তারপর হাতে সময় থাকবে শুধু কালকের দিনটা। একদিনে এত কাজ...'

'আমি দুঃখিত, জ্যাকবসন। কিছু করার নেই। তবে সতর্ক করে দেখার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।' ঠোঁট মুড়ে কি যেন ভাবলেন তিনি। 'আমি দেখি ব্রিটিশ কনসালকে ধরতে পারি কি না। তাঁকে দিয়ে বলানো গেলে সেরারিয়ের বিশ্বাস করতেও পারে।'

'তাঁকে টেলিফোনে...'

'অসম্ভব!' মাথা দোলালেন কমোডর। 'আমাদের প্রত্যেকটা ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে এখন নিঃসন্দেহে।'

হতাশ মনে বেরিয়ে এল জ্যাকবসন। মন বলছে কমোডর ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তাঁর যুক্তিও ঠিক, মেরিনরা চলে গেলে সেরারিয়ের অবশ্যই ঘাঁটি দখল করে নেবে। এবং পরে তাকে এখান থেকে সরানো খুবই কঠিন হবে।

ভীষণ অস্থির লাগছে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সে। মন বারবার একই কথা জপে চলেছে—সময় নেই, ম্যাবেল আসছে।

ধ্বংস আর মৃত্যু আসছে।

'কি হয়েছে, জ্যাক?' তাকে দেখে চমকে উঠল মাসুদ রানা। এক বেলার মধ্যে চেহারা শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। ফ্যাকাসে। 'শরীর খারাপ নাকি?'

'না।' পাশ কাটিয়ে রুমে ঢুকল সে। ড্রেসিঙ টেবিলে বসা ক্রিস্টিনার উদ্দেশে নিষ্প্রাণ এক টুকরো হাসি দিয়ে ধপ্ করে সোফায় বসে পড়ল। 'সরি। আসতে দেরি হয়ে গেল।'

দরজা বন্ধ করে সামনে এসে দাঁড়াল রানা। চোখ কুঁচকে বন্ধুকে দেখছে। ক্রিস্টিনাও টুলের ওপর ঘুরে বসেছে, চুল ব্রাশ করা থামিয়ে তাকিয়ে আছে।

'জ্যাক!' পাশে বসে নরম গলায় ডাকল রানা। 'কি হয়েছে?'

কার্পেট থেকে চোখ তুলে তাকাল সে, বোকার মত হাসল। 'কেন যে এমন বিনা নোটিসে এলে তোমরা!'

'ঝড়ের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ... না, মানে থিওরি অনুযায়ী এখনও শিওর নই আমি। তবে সময় যত গড়াচ্ছে, আমার ফীলিংস ততই বাড়ছে, রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারছি ম্যাবেল এখানেই আঘাত করবে। তাহলে যে ভয়াবহ বন্যা হবে, ভাবতেও ভয় করছে। সব তলিয়ে যাবে। তোমরা এরমধ্যে...'

'ওই দুশ্চিন্তা ছাড়ো, জ্যাক। আমিও ঝড়-বন্যার দেশের মানুষ, প্রায় প্রত্যেক বছর এই বিপদের মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। একানব্বইতে যে সাইক্লোন হয়েছে আমাদের দেশে, তার বাতাসের গতি ছিল দুইশো মাইলেরও বেশি। তার সাথে ফ্লাডও ছিল তেমনি। তোমার ম্যাবেলের গতি তো সে তুলনায় যথেষ্ট কম।'

'সে তো তোমাদের কোস্টাল এলাকায় হয়েছে, রানা। তুমি ওখানকার ধারেকাছেও ছিলে না তখন। তাছাড়া ক্রিস্টি...'

'সে চিন্তাও তোমাকে করতে হবে না,' উঠে এল মেয়েটি চুলে ব্রাশ বোলাতে বোলাতে। 'আমি যুদ্ধের খবর সংগ্রহে এসেছি, দুই বাহিনীর ক্রস ফায়ারের মধ্যে পড়েও তো মৃত্যু হতে পারে আমার। কাজেই বাদ দাও ওই চিন্তা, কফির কথা বলি?' ফোনের রিসিভার তুলে নিল সে সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে।

করুণ হাসি ফুটল জ্যাকবসনের মুখে। 'আমাদের ট্রপিক্যাল কোস্টাল বেল্টের এই ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তোমাদের পরিষ্কার ধারণা নেই বলে এত নিশ্চিন্তে বলতে পারলে। তাছাড়া গুলি খেয়ে মরা আর পানিতে ডুবে মরায় অনেক পার্থক্য আছে। তারওপর এই ঝড় একবার নয়, পরপর দু'বার আঘাত করে সমান শক্তি নিয়ে।'

এবার অবাক না হয়ে পারল না রানা। 'দু'বার মানে?'

মোনাজাতের ভঙ্গিতে মুখ মুছল সে। 'ডায়ামিটার অনুযায়ী প্রথম দফা আট থেকে দশ ঘণ্টা স্থায়ী হয় প্রচণ্ড ঝড়। তারপর এক-দেড়ঘণ্টা বিরতি দিয়ে ফের একই কাণ্ড ঘটে।'

'বিরতি দেয় কেন?' ক্রিস্টিনা প্রশ্ন করল।

'ঝড়ের কেন্দ্র, বা চোখে বাতাসের চাপ থাকে না, তাই ওটা যখন আক্রান্ত এলাকা ক্রস করে, তখন সব প্রায় স্বাভাবিক মনে হয়। তারপর চোখ সরে গেলেই আসে অন্য প্রান্তের ধাক্কা। সমান ফোর্সে।'

'তাই নাকি?' নিজের মনে বলল রানা।

'হ্যাঁ। পুরো ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে কমোডরকে যা যা বলেছে, সেই কথাগুলোই আরেকবার ওদের বলল জ্যাকবসন। 'যদি ম্যাবেল আসেই, এই হোটেলও তলিয়ে যাবে, রানা। মাত্র চল্লিশ ফুট উঁচু এটা।'

চোখ কুঁচকে উঠল ওর। 'তাহলে! এ থেকে বাঁচার মত উঁচু কোন শেল্টার নেই?'

'না। কে বানাবে? তাছাড়া এতবড় হারিকেন বহু দশকের মধ্যে আসেনি এদিকে, তাই কোন সরকারই গুরুত্ব দেয়নি এ ব্যাপারে।'

'কি আশ্চর্য!' ক্রিস্টিনা বলল রুদ্ধশ্বাসে।

'এত মানুষ,' রানা বলল। 'এদের বাঁচার কোন পথ নেই তাহলে?'

'আছে একটা,' মাথা দোলাল জ্যাকবসন। 'শহর খালি করে সবাইকে পুবের

নেগ্রিটো ভ্যালিতে সরিয়ে নিতে হবে। ওখানকার পাহাড়ে সময়মত আশ্রয় নেয়া গেলে...'

'যাক,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। 'তবু যা হোক একটা উপায় আছে। তাহলে, ম্যাবলের ব্যাপারে তুমি শিওর?'

'সে তো মোটামুটি কাল থেকেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমার চীফ তো নয়ই, এমনকি নেভাল চীফও আমার সাথে একমত হতে পারছেন না। থিওরির বাইরে যেতে রাজি নয় তারা। এমনকি লোকাল ওয়ার্নিং ইস্যু করতেও রাজি নয়। আমাকে বাদ দিয়ে অন্য টেকনিক্যাল স্টাফকে পাঠানো হয়েছে ওয়েদার নতুন করে মনিটরিঙের কাজে।'

'কেন?'

'কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে কমোডর আরেকজন বিশেষজ্ঞের মত জানতে চান।' রুম সার্ভিস কফি রেখে যেতে একটা কাপ টেনে নিল জ্যাকবসন। চুমুক দিল। 'কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে ওদের ফিরে আসতে আসতে অনেক রাত হবে। তারপর ব্যাপারটা যদি পজিটিভ হয়, তাহলে হয়তো দেরি হয়ে যাবে। কিছু করার মত সময় থাকবে না। ওয়ার্নিঙ ইস্যু করা, এত মানুষ ভ্যাকেট করা,' শ্রাগ করল সে। 'আমি তো কোন আশা দেখছি না।'

নীরবে যে যার কাপে চুমুক দিল রানা-ক্রিস্টিনা। 'তাহলে?' বলল রানা। 'এখন কি করতে চাইছ?'

দু'হাতের তালু চিত করে অসহায় ভঙ্গি করল সে। 'কি করব? কি করার আছে আমার? কাউকে তো ব্যাপারটা বিশ্বাস করাতেই পারছি না। এই যে তোমরা, তোমরাও নিশ্চই বিশ্বাস করতে পারছ না আমাকে! হয়তো ভাবছ আমি শুধু শুধু পরিস্থিতি ঘোরাল করে তুলছি।'

'না, জ্যাক,' মৃদু গলায় বলল রানা। এক হাত তার কাঁধে রাখল। 'আমরা মোটেই তা ভাবছি না। বরং তুমি যেমন শিওর, তেমনি আমরাও শিওর। আমরা জানি ম্যাবেল আসছে।'

চোখ কুঁচকে উঠল তার। 'ঠাট্টা করছ?' বলেই বুঝল ভুল হয়ে গেছে, রানার চোখে মুখে সেসবের কোন চিহ্নই নেই। গম্ভীর ও। 'নাকি ছেলে ভোলানো সান্ত্বনা দিচ্ছ?'

'কোনটাই না।'

'তাহলে? তোমরা কি করে শিওর হলে?'

'আমি বলছি,' টেবিলের ওপর থেকে রানার সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল ক্রিস্টিনা। একটা ধরিয়ে দুপুরের সেই বৃদ্ধের কথা খুলে বলল।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে সোজা হয়ে বসল জ্যাকবসন। ঘাড়ের খাটো খাটো চুল দাঁড়িয়ে গেল তার সর-সর করে। 'দেখলে!' উত্তেজনায় গলা চড়িয়ে বলল, 'দেখলে! আমি বলিনি...' হঠাৎ থেমে গেল। লজ্জা পাওয়া চেহারা করে ওদের দু'জনের দিকে তাকাল। 'সরি, রানা! ক্রিস্টি! না বুঝে...'

'দ্যাট'স অল রাইট,' তার পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'আমরা কিছু মনে করিনি। ভুলে যাও।'

'আবহাওয়া বিজ্ঞানের আর কোন প্রয়োজন নেই, রানা। মনে যে সামান্য সন্দেহ ছিল, সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল এই খবর শোনার পর। অন্তত একজনের খোঁজ পাওয়া গেল যে...'

'সে না হয় হলো,' বাধা দিল ও। 'কিন্তু এখন সমস্যার সমাধান করা যায় কি করে, সেই চিন্তা করো।'

গম্ভীর হয়ে গেল জ্যাকবসন। 'কি করে সমাধান করব? কোন পথই তো চোখে পড়ছে না আমার। তবে...'

'কি?'

'একটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে বোধহয়।'

'কি সেটা?'

'এখানকার ব্রিটিশ কনসালকে দিয়ে ব্যাপারটা সেরারিয়েরের কানে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে। এতদিন সান ফের্নান্দেজের আবহাওয়া দফতরের দায়িত্বে ছিল আইল্যান্ড অ্যাফেয়ার মিনিস্টার ওনাদি। নিরাপত্তা বাহিনীর চীফ ছিল লোকটা। দু'দিন আগে তাকে বরখাস্ত করে তার সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছে প্রেসিডেন্ট। ঘাঁটির নেভাল চীফও কনসালের সাথে এ নিয়ে কথা বলবেন বলেছেন। তাঁকে দিয়ে খবরটা প্রেসিডেন্টকে জানাবার চেষ্টা করবেন।'

'কেন?' বলল রানা। 'তিনি নিজে কেন...'

'উপায় নেই। সেরারিয়ের আমেরিকানদের দু'চোখে দেখতে পারে না। বিশ্বাসই করবে না সে।' এ ব্যাপারে কমোডর যা যা আশঙ্কার কথা বলেছেন, জানাল সে রানাকে। 'তাছাড়া তিনি যদি পদক্ষেপ নেনও, নেবেন কাল। হয়তো। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সেই একই কথা, দেরি হয়ে যাবে।'

হেলান দিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে থাকল রানা। ডুবে আছে চিন্তায়। 'ব্রিটিশ কনসাল বললে কাজ হবে?'

'হতে পারে। ওদের এক-আধটু খাতির করে সেরারিয়ের।'

'ওদের কনসুলেটটা কোথায়?'

'বেশি দূরে নয়। ডক এলাকার কাছে।'

সিগারেট শেষ করল ও নীরবে। তারপর সটান উঠে দাঁড়াল। 'চলো।'

'কোথায়?' জ্যাকবসন বলল।

'কনসালের সঙ্গে কথা বলতে। দেখি, কাজ কিছু হয় কি না।'

দুই মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ওরা দু'জন। ক্রিস্টিনা থেকে গেল নিজের কাজে বের হবে বলে। পরিবেশ ভীষণ গুমোট। তার ওপর রাস্তা একদম ফাঁকা, দোকানপাট সব বন্ধ। চারদিকে ভৌতিক থমথমে ভাব। আর্মি চোখে পড়ল না কোথাও, তবে পুলিস আছে প্রচুর। চারজনের একেকটা দল, ঘুরঘুর করছে। এ ছাড়া করার কিছু নেই তাদের, কারণ মানুষ তো দূরের কথা, একটা কুকুরও নেই রাস্তায়।

রানার সুবিধে হলো। জোরে চালিয়ে সাত-মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল কনসুলেট ভবনের সামনে। ভবনটা বেশ বড়, দোতলা। সামনের ভারী লোহার গেট বন্ধ। ওটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যথেষ্ট সময় খরচ হলো ওদের।

কনসাল ফুলারটন ছোটখাট মানুষ। টেকো। ষাটের মত বয়স। দুই আগন্তুককে দেখলেন তিনি কিছু সময় নিয়ে। 'আপনারা ব্রিটিশ?' প্রশ্ন করলেন তিনি, যদিও সিকিউরিটি-ইন-চার্জের মুখে খবরটা আগেই পেয়েছেন।

'হ্যাঁ,' বলে নিজের ব্রিটিশ পাসপোর্ট বের করে দিল রানা। বাইরে বের হলে; বিশেষ করে ছুটিতে, দেশীটার সাথে ব্রিটিশ ও আমেরিকান, দুটো পাসপোর্টই সঙ্গে রাখে ও।

'আমার অফিসে আসুন, প্লীজ!' ওটা ফিরিয়ে দিলেন ফুলারটন। আগে আগে চললেন।

অফিস রুমটা বেশ বড়। কনসালের চেয়ারের পিছনের দেয়ালে ঝুলছে রানীর বিরাট এক ছবি। ভেতরের আসবাব সব ঝকঝক করছে। 'বসুন।'

কনসালের মুখোমুখি বসল ওরা। দু'জনকে আরেকবার পালা করে দেখলেন তিনি। 'আপনিও ব্রিটিশ?' জ্যাকরসনের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন।

'না,' রানা জবাব দিল ওদের হয়ে। 'ইনি ড্যানিয়েল জ্যাকবসন, লোকাল। ওয়েদার স্পেশালিস্ট।'

'আই সী! তা কি ব্যাপার? এই অসময়ে পথে বেরিয়েছেন···শহরের অবস্থা কিছু জানেন না?'

'জানি, খারাপ। তবু বেরোতে হলো ওর চাইতেও হাজার গুণ খারাপ একটা খবর আপনাকে জানাতে। উপায় ছিল না।'

কপালে ভাঁজ ফুটল ফুলারটনের। 'সেটা কি?'

'তার আগে আপনার জানা দরকার, ইনি ক্যাপ সারাত মার্কিন বেজের ওয়েদারম্যান,' জ্যাকবসনকে দেখাল রানা। 'গত পরশু ওয়েদার মনিটরিঙ করতে গিয়ে আটলান্টিকে প্রচণ্ড এক হারিকেনের উৎপত্তি হয়েছে দেখে এসেছেন। এদিকেই আসছে ওটা।'

চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল কনসালের, চেহারায় বিমূঢ় ভাব ফুটল। 'তা না হয় বুঝলাম,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বললেন। 'কিন্তু সে খবর জেনে আমি কি করব? কমোডর···'

'তিনি জানেন,' বাধা দিয়ে জ্যাকবসন বলে উঠল। 'কিন্তু প্রেসিডেন্ট পাত্তা দেবে না ভেবে ওয়ার্নিং ইস্যু করতে ভরসা পাচ্ছেন না। আপনি জানেন বোধহয় দু'দিন আগে পর্যন্ত আইল্যান্ড অ্যাফেয়ার মিনিস্টার ওনাদির দায়িত্বে ছিল আবহাওয়া দফতর। পরশু তাকে বরখাস্ত করেছে সেরারিয়ের। কোন খোঁজ নেই তার। কাজেই এ খবর জানাতে হলে এখন সেরারিয়েরকেই জানাতে হবে। কিন্তু কমোডর সে চেষ্টা করতে গেলে লোকটা বিশ্বাস তো করবেই না, বরং সো কলড্ বিদ্রোহ দমনের সময় তার মন অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সন্দেহ করে ঝামেলা বাধিয়ে বসবে।'

মাথা দোলালেন চিন্তিত কনসাল। 'হ্যাঁ। তা সে করতে পারে। এইজন্যে কমোডর পাঠিয়েছেন আপনাদের?'

'না। ওয়ার্নিঙ ইস্যু করতে দেরি হলে যে ভয়াবহ অবস্থা হবে, তা জেনে চুপ করে বসে থাকতে পারিনি আমরা। তাই নিজেরাই এসেছি।'

'আই সী! কমোডরের কোন চিঠি…?'

'না। তবে তিনি বলেছেন, সেরারিয়েরকে যদি কেউ প্রভাবিত করতে পারে, সে আপনি।'

'বুঝলাম। কিন্তু অফিশিয়াল কোন অনুরোধ না পেলে আমিই বা আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাব কোন্ ভরসায়? অন্তত একটা টেলিফোনও তো করতে পারতেন কমোডর।'

'আমি বলেছি তাঁকে সে কথা। কিন্তু বেজের সব ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে বলে ঝুঁকি নিতে চাননি তিনি।'

কিছুক্ষণ নীরবে টাক চুলকালেন কনসাল। 'আমি এ দ্বীপে আছি অনেকদিন। কখনও বড় হারিকেন দেখিনি। শুনেছি শেষ যে বড় হারিকেন বয়ে গেছে দ্বীপের ওপর দিয়ে, সেটা বহুবছর আগের কথা।'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকবসন। 'ঠিকই শুনেছেন।' সালটা বলল।

'দেখুন তাহলে, এতগুলো যুগ পেরিয়ে গেল…'

'কখনও হাত ভেঙেছে আপনার, মিস্টার ফুলারটন?'

রানার আচমকা প্রশ্নে কপাল কুঁচকে উঠল তাঁর। 'অ্যাঁ?'

'অথবা মাথা ফেটেছে?'

'হ্যাঁ…তা,' ঠোঁট চাটলেন কনসাল। 'হাত একবার ভেঙেছিল অবশ্য, আমি তখন খুব ছোট।'

'কত বছর আগে হবে, পঞ্চাশ?' ঝুঁকে বসল ও।

'তা হবে। কিন্তু এখানে সে প্রশ্ন…'

'পঞ্চাশ বছর আগে ভেঙেছে বলে আপনি কি কোন গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারেন কালই আবার ভাঙবে না ওটা?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন কনসাল। 'ইউ হ্যাভ মেড ইওর পয়েন্ট, ইয়াংম্যান।' জ্যাকবসনের দিকে ঘুরলেন। 'আপনি তাহলে হারিকেনের ব্যাপারে সিরিয়াস?'

'একশো ভাগ!' জোর দিয়ে বলল সে।

'হুঁম! তাহলে বরং খুলে বলুন।'

আধঘণ্টা পর, রুমের মধ্যে অস্থির চিত্তে পায়চারি করছেন কনসাল। কপালে গভীর ভাঁজ। হাত পিছনে বাঁধা, নজর কার্পেটে। পায়চারি নয়, রানার মনে হলো লেফট-রাইট করছেন ভদ্রলোক। অনেকক্ষণ পর ব্রেক কষলেন তিনি। অস্ফুটে বললেন, 'সর্বনাশ! এক্ষুণি খবরটা জানানো উচিত প্রেসিডেন্টকে। কিন্তু…এই পরিস্থিতিতে তাঁর সাথে দেখা করা যাবে কি না…'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি আমরা,' রানা বলল।

'নিশ্চই! যেতে হবে প্যালেসে, কিন্তু সবার যাওয়া চলবে না।'

'আমি যাব আপনার সাথে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ও।

'আপনি!' অবাক হলেন কনসাল।

'হ্যাঁ। জ্যাকবসন অনেকদিন থেকে চাকরি করছে ক্যাপ সারাতে, নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ কেউ না কেউ চেনে ওকে। তেমন কেউ ওখানে যদি থাকে,

আপনি সমস্যায় পড়ে যেতে পারেন। প্রশ্ন উঠতে পারে। আমি গেলে উঠবে না। আপনি আমাকে ব্রিটিশ কনসুলেটের ওয়েদারম্যান বলে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন ওখানে প্রয়োজন দেখলে।'

'কিন্তু গেলেই তো চলবে না। প্রেসিডেন্টকে পুরো পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার দরকার হতে পারে।'

'সেটাও পারব আমি। কাল থেকে শুনে শুনে সব মুখস্থ হয়ে গেছে।' হাসি ফুটল রানার মুখে। 'সমস্যা হবে না।'

'কিন্তু...' কিছু বলতে গিয়ে বাধা পেল জ্যাকবসন।

'আমিই যাচ্ছি,' দৃঢ় কণ্ঠে রানা বলল। 'তোমার যাওয়ায় ঝুঁকি আছে। তুমি হোটেলে চলে যাও। আমি কাজ সেরে আসছি।'

সেনাবাহিনীর দুটো ব্যাটালিয়ন চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস। ছাদে বড় বড় কয়েকটা ফ্লাড লাইট জ্বলছে, দিনের মত আলো হয়ে আছে চারদিক। অ্যাপ্রোচ রোডের তিন গার্ড সাব-পোস্টে গাড়ি দাঁড় করাতে হলো শোফারকে, আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে হলো ফুলারটনকে। তারপর একসময় মেইন এন্ট্রান্সের শেষ গার্ড পোস্টে পৌঁছল গাড়ি। ততক্ষণে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছেন কনসাল।

'চীফ অভ প্রটোকল, মিস্টার হিপোলাইটের সাথে দেখা করতে চাই আমি,' তরুণ গার্ড অফিসারকে বললেন তিনি।

'তিনি কি আপনার সাথে দেখা করতে আগ্রহী?' নিরীহ চেহারা করে জানতে চাইল অফিসার। হাসল দাঁত বের করে।

'আমি ব্রিটিশ কনসাল,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ। 'এই মুহূর্তে তাঁর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করুন। নইলে তিনি তো বটেই, প্রেসিডেন্ট সেরারিয়েরও খুবই অসন্তুষ্ট হবেন। হারি ইট আপ, ম্যান!'

প্রেসিডেন্টের নাম শুনেই হাসি শুকিয়ে গেল অফিসারের, গম্ভীর গলায় 'এখানে অপেক্ষা করুন,' বলে প্রাসাদের ভেতরে চলে গেল। যেমন দ্রুত গেল, ফিরেও এল তেমনি দ্রুত। 'উনি দেখা করতে রাজি হয়েছেন,' বলে পাশে দাঁড়ানো দুই সৈনিককে ইঙ্গিত করল মাথা ঝাঁকিয়ে। 'সার্চ করো।'

কঠিন একজোড়া হাত অনুভব করল মাসুদ রানা, সারাদেহে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। যেখানে-সেখানে সজোরে চাপড় মেরে 'সার্চ' করছে। ও হজম করে নিলেও কনসাল পারলেন না। 'অসভ্যর বাচ্চারা!' বিড়বিড় করতে লাগলেন। 'আমাকে সার্চ করা! আমি কি স্পাই? দাঁড়াও...' পিছন থেকে মাঝপিঠে বেমক্কা এক গুঁতো খেয়ে ধুপ্ ধাপ্ পা ফেলে কয়েক কদম এগিয়ে যেতে বাধ্য হলেন তিনি। ভেতরে যাওয়ার অনুমতি। ঘুরে কট্‌মট্ করে তাকালেন অফিসারের দিকে, চোখাচোখি হতে হাসল সে। তেমনি সরল হাসি, যেন বোঝে না কিছু।

'বাদ দিন,' নিজের গুঁতো সামলে রানা বলল। 'মাথা গরম করে লাভ নেই। চলুন, আসল কাজ সেরে বাকি মানটুকু নিয়ে কেটে পড়ি।'

আলোয় আলোয় ঝলমল করছে প্রটোকল অফিসারের বড়, বিলাসবহুল রুম।

নিজের বহু মূল্যবান ডেস্কের পিছন থেকে উঠে এল লোকটা ডান হাত বাড়িয়ে। 'আহ্, মিস্টার ফুলারটন! এত রাতে কি মনে করে?' চোস্ত অক্সফোর্ডের উচ্চারণে বলল সে। রানাকে ইঙ্গিতে দেখাল। 'ইনি?'

'ব্রিটিশ সায়েন্টিস্ট।'

'সায়ে...'

'আমি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করব,' কড়া গলায় বাধা দিলেন কনসাল। 'দয়া করে ব্যবস্থা করুন।'

'এখন!' তাজ্জব হয়ে গেল হিপোলাইট। 'এত রাতে! সম্ভব নয়, রড্ড অসময়ে এসেছেন আপনি।'

লম্বা করে দম নিলেন ফুলারটন। এমনভাবে বুক টান করে দাঁড়ালেন, যেন লড়াই বাধিয়ে দেবেন প্রয়োজনে। চেহারা থেকে ফুটে বেরোচ্ছে রাজকীয় আভিজাত্য। 'আমি এসেছি হার ব্রিটানিক ম্যাজেস্টি'স গভার্নমেন্টের তরফ থেকে, প্রেসিডেন্ট সেরারিয়েরকে বিশেষ এক খবর জানাতে। আমার ধারণা সময়মত খবরটা না পেলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন।'

তাঁর বোলচালে বেশ ঘাবড়ে গেল অফিসার। 'কিন্তু...কিন্তু প্রেসিডেন্ট এই মুহূর্তে জরুরী মীটিঙে আছেন জেনারেলদের সাথে। এখন তাঁকে ডিসটার্ব...'

'আমি কি আমার সরকারকে জানাব যে প্রেসিডেন্ট সেরারিয়ের লন্ডনের কোন মেসেজ রিসিভ করতে রাজি নন?'

পাঙাস মাছের মত বড় হাঁ হয়ে গেল লোকটার চোয়াল। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে অল্প অল্প। 'না, এমন কথা আমি বলছি না।'

'গুড। আমিও সেরকম অস্বস্তিকর কিছু লন্ডনকে জানাতে চাই না,' বিজয়ীর হাসি ফুটল চতুর কূটনীতিকের মুখে। 'এবার প্রেসিডেন্টকে আমার আসার খবরটা জানান দয়া করে।'

'যাচ্ছি। তা ব্যাপারটা কি...কোন আভাস...?'

মাথা দোলালেন তিনি। 'দুঃখিত। সরাসরি তাঁকেই জানাবার নির্দেশ আছে। ম্যাটার অভ স্টেট।'

'আচ্ছা, বসুন আপনারা। আমি প্রেসিডেন্টের...' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল হিপোলাইট।

'কথা বেশি বলা হয়ে গেল বোধহয়,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ,' মেঝের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক কণ্ঠে বললেন কনসাল। 'এ খবর হোয়াইট হলে পৌঁছলে আমার চাকরি নিয়েও টান পড়তে পারে। কিন্তু যে ভয়াবহ দুর্যোগের খবর আপনারা শোনালেন, মানুষ বাঁচানো গেলে তাতেও আফসোস থাকবে না। তাছাড়া এইসব ওয়ান ম্যান রুলারের দেশে চাকরির ওপর খাঁড়া সবসময়ই ঝোলে আমাদের।'

'ব্যাটা এখন দেখা করতে রাজি হলে হয়।'

'হবে। ম্যাটার অভ স্টেট বলেছি না? নিশ্চয়ই হবে।'

পনেরো মিনিট পর ফিরল লোকটা। 'আসুন আপনারা, প্রেসিডেন্ট রাজি হয়েছেন।'

তাকে অনুসরণ করল দু'জনে। দামী কাঠের প্যানেলিঙ করা চওড়া করিডর ধরে রানার অনুমান, কম করেও আধ মাইল হাঁটল ওরা। তারপর বিশাল এক ওক কাঠের বন্ধ দরজার সামনে থেমে ঘুরল সে। 'দেশের পরিস্থিতি নিয়ে প্রেসিডেন্ট খুব [illegible] তাঁর আচরণ রূঢ় দেখেন, কিছু মনে করবেন না দয়া করে।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকে দেখলেন কনসাল। 'আমরা বিদেশী অফিশিয়াল প্রতিনিধি। গেটে আপনার গার্ড যেরকম কমন ক্রিমিন্যালের মত সার্চ করেছে আমাদের, সে কথা শুনলে নিশ্চই আরও রূঢ় হয়ে উঠবেন ভদ্রলোক।'

কপালে ঘামের পরিমাণ বেড়ে গেল হিপোলাইটের। করুণ চেহারা করে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, পাত্তা দিলেন না বৃদ্ধ, দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। তাঁর পিছনে ছায়ার মত সেঁটে থাকল রানা।

রুমটা প্রকাণ্ড। অনেক উঁচু সিলিঙ। আট-দশটা খুবই দামী ঝাড়বাতির বৈদ্যুতিক আলোয় কড়া পালিশ করা বহু মূল্যবান আসবাব সব চিক চিক করছে। ঠিক মাঝখানে বড় এক টেবিল ঘিরে বসে আছে ফুল ইউনিফর্মড কয়েকজন সিনিয়র আর্মি অফিসার। বড় ম্যাপ টেবিলে বিছিয়ে উঁচু গলায় কি যেন বলছিল খাটোমত একজন, এদিকে পিছন ফিরে বসে আছে সে। দরজার শব্দে কথা বন্ধ করে ঘুরে তাকাল।

'এই হচ্ছে সেরারিয়ের,' ঠোঁট না নেড়ে উচ্চারণ করলেন কনসাল।

'চিনেছি,' রানা বলল।

'কি ব্যাপার,' কোন সম্ভাষণ তো জানালই না লোকটা, এমনকি বসতে পর্যন্ত বলল না। 'অসময়ে কি মনে করে? সঙ্গের এটা কে?'

'আমার দেশী এক সায়েন্টিস্ট, ইওর এক্সেলেনসি,' অপমান হজম করে বললেন কনসাল। 'মিটিওরোলজিক্যাল সায়েন্টিস্ট।'

চোখ কুঁচকে উঠল সেরারিয়েরের। অন্য অফিসাররা নীরবে তাকিয়ে আছে। 'কি খবর নিয়ে এসেছেন আপনি?' বলল প্রেসিডেন্ট।

'ইওর এক্সেলেনসি,' দু'পা এগোলেন তিনি। রানাকে দেখালেন, 'ইনি গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর জানাতে চান আপনাকে। সান ফের্নান্দেজের দিকে খুব বড় একটা হারিকেন এগিয়ে আসছে, দুই একদিনের মধ্যে...'

'হোয়াট!' খেঁকিয়ে উঠল সেরারিয়ের। এমন চেহারা করে তাকাল যেন জীবনে এত বড় বেকুব আর কখনও দেখেনি। 'কি বললেন?'

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট...' শুরু করতে গেল রানা, কিন্তু পাত্তা না পেয়ে থেমে গেল অসহায়ের মত। তাকালই না লোকটা। কনসালের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'এই জরুরী মীটিঙের মাঝখানে ওয়েদারের খবর শোনাতে এসেছেন আপনি! আমি ভেবেছিলাম বুঝি ফ্যাভেল সম্পর্কে কিছু হবে। আপনি জানেন না এদেশে হারিকেন হয় না?'

মরিয়া হয়ে বলে উঠল রানা, 'উন্নিশশো দশে হয়েছিল।'

'সে বহু আগের কথা। তারপর আর হয়নি। হবেও না।' পরক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সেরারিয়ের। 'কি আশ্চর্য! হিপোলাইট, হিপোলাইট! আহাম্মক দুটোকে ঘাড় ধরে...'

'ইওর এক্সেলেনসি,' শেষ চেষ্টা করল ও। 'আপনি দয়া করে পাঁচ মিনিট সময় দিলে...'

দরজা খোলার দড়াম শব্দে থেমে গেল। একই মুহূর্তে হুঙ্কার ছাড়ল সেরারিয়ের। 'গেট আউট, ইউ ফুলস্! আপনাদের সায়েন্সে বিশ্বাস করি না আমি। সান ফের্নান্দেজে হারিকেন হয় না, বুঝতে পেরেছেন? বেরিয়ে যান!'

মানুষটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে দেখে ঘাবড়ে গেলেন কনসাল, রানার আস্তিন খামচে ধরলেন। 'চলে আসুন। আমাদের কাজ আমরা...'

বাহুতে হ্যাঁচকা টান খেয়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলেন বৃদ্ধ। প্রায় একই সাথে রানার কলার মুঠো করে ধরল হিপোলাইট, টানতে টানতে বের করে নিয়ে গেল দু'জনকে। এক প্লাটুন সৈনিকের হাতে তুলে দিল। রাইফেলের বাঁটের গুঁতো আর বুটের লাথি মারতে মারতে ওদের নিয়ে চলল লোকগুলো।

অল্পবয়সী বলে রানাকে একটু বেশিই খাতির করা হলো।

চার

অন্ধকার। কোথাও আলো নেই। কালো চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে যেন প্রাণহীন সেইন্ট পিয়েরে। পাওয়ার ফেল করেছে, না ইচ্ছে করে অফ করে দেয়া হয়েছে, বোঝার উপায় নেই। পাহাড়ের দিক থেকে অনবরত গুম গুম শব্দ আসছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে মাটি। গোলাগুলির আওয়াজ। কখনও সিঙ্গল শট, কখনও ব্রাশ। শহরের বাড়িঘরের দেয়ালে এসে আঘাত করছে শব্দগুলো।

হোটেলের কাছে এসে গতি কমাল জ্যাকবসন। ওটাও অন্ধকার। আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ভৌতিক কাঠামোটা। ভেতরে মানুষজন আছে কি না বোঝার কোন উপায় নেই।

অল্প অল্প কাঁপছে জ্যাকবসন। ভয় পেয়েছে। পথে তিনবার থামিয়েছে ওকে পুলিস, অজস্র প্রশ্ন করেছে। ওদের খুব ভীত, আতঙ্কিত মনে হয়েছে তার। মুখিয়ে আছে গুলি ছোঁড়ার জন্যে। সেই ভয় এখনও কাটেনি। হোটেলের ভেতরে কি অবস্থা দেখতে হবে ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ল জ্যাকবসন। ক্রিস্টিনা ফিরেছে? এরমধ্যে একা বের হওয়া মোটেই উচিত হয়নি ওর। দিন হলে কথা ছিল, রাতে একা এক বিদেশিনী সেইন্ট পিয়েরের এখানে-ওখানে ঘুরছে খবরের খোঁজে, ভাবাই যায় না।

ভেতরের পরিস্থিতি না জেনে ঢোকা ঠিক হবে না ভেবে গেটের বাইরে গাড়ি দাঁড় করাল সে, নেমে গাড়ি লক করতে গিয়েও কি ভেবে করল না। এঞ্জিন কভার তুলে ডিস্ট্রিবিউটরের রোটর আর্ম খুলে পকেটে ভরল, প্রয়োজনের সময় গাড়ি জায়গামত থাকবে ভেবে কিছুটা স্বস্তি পেল সে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার ইম্পিরিয়ালের লাউঞ্জ। তবে ও মাথার আমেরিকান বারে সামান্য আলোর আভাস আছে দেখে মনের গুমোট ভাব কেটে গেল, পা চালাল

সেদিকে। খানিকটা এগোতেই একটা শব্দ শুনে জমে গেল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে শব্দটার উৎস বোঝার চেষ্টা করল।

'কে?' চাপা গলায় বলল এক মেয়ে।

'জ্যাকবসন। ক্রিস্টি?'

'হ্যাঁ।' মেঝেতে ওর পায়ের শব্দ উঠল, এগিয়ে আসছে। তুমি একা কেন, জ্যাক? রানা কোথায়?'

'কনসালের সাথে আছে,' চোখ কুঁচকে মেয়েটিকে দেখার চেষ্টা করল সে ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে। 'এসে পড়বে। তুমি কখন ফিরেছ?'

'একটু আগে। আমার ক্যামেরা কেড়ে নিয়েছে পুলিস, রাস্তায় আবার দেখলে গুলি করবে বলে শাসিয়েছে।' তার সামনে এসে দাঁড়াল ক্রিস্টিনা।

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল জ্যাকবসন। 'কি আর করবে! অবশ্য শহরের যে অবস্থা, তাতে একদিক থেকে কাজটা ভালই হয়েছে তোমার জন্যে। জান বাঁচানোর চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুর সময় নয় এটা।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল মেয়েটা, বোঝা গেল না। 'রানা কনসালের সাথে কি করছে? তোমার কাজ হয়েছে?'

'মোটামুটি,' বলেই প্রসঙ্গ পাল্টাল জ্যাকবসন। 'মানুষজন নেই হোটেলে? এত নীরব কেন?'

'শুনলাম তোমাদের বেজ থেকে ট্রান্সপোর্ট এসে যাকে যাকে পেয়েছে নিয়ে গেছে। আমি ছিলাম না।'

'তাই নাকি!' খুশি হয়ে উঠল সে। এর অর্থ কমোডর তাঁর প্রাথমিক কাজ শুরু করেছেন। নাকি হারিকেনের কনফার্ম খবর নিয়ে প্লেন ফিরে এসেছে? হাতঘড়ি দেখল—সাড়ে আটটার কিছু বেশি, নাহ্! এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা নয় ওদের। 'কোন চিন্তা নেই। রানা ফিরলে আমরাও চলে যাব ওখানে। বারে আরও কেউ আছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। এসো।'

চারজনের একটা গ্রুপকে ওখানে দেখতে পেল জ্যাকবসন, মোমবাতি জ্বেলে বসে আছে। আমেরিকান লেখক জারভিস কুপার, মারাকা ক্লাবের মালিক দিমিত্রিওস ম্যানোসা, এক মহিলা ও বার টেন্ডার। মহিলা প্রায় মাঝবয়সী, সুন্দরী। একটু মোটা। এই প্রথম দেখল তাকে জ্যাকবসন। টেন্ডার লোকটা খোলা ক্যাশ বাক্সের ওপর ঝুঁকে কি যেন করছে।

'এরা এখানে...'

প্রশ্ন শেষ করার সুযোগ পেল না সে, তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল মহিলা। 'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম রুমে! কেউ ডাকেনি আমাকে!'

'ইনি মিসেস জো নস,' বলল ক্রিস্টিনা।

জ্যাকবসন মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু ডাকেনি কেন?'

'মনে হয় গাড়িতে জায়গা হয়নি। আবার আসবে বলেছে ওরা।'

'তাই?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল লেখক। 'বিকেলে একটু বেরিয়েছিলাম। ফিরতে দেরি-

হয়ে গেল। এসে দেখি মিসেস জোনস ছাড়া কেউ নেই। কি করব ভাবছি, এই সময় টেলিফোন এল বেজ থেকে। বলল আমাদের তৈরি হয়ে থাকতে, গাড়ি পাঠাচ্ছে ওরা। কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই ফোন ডেড হয়ে গেল।'

'নিশ্চই আর্মির কাজ,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। 'লাইন কেটে দিয়েছে। কখন ঘটেছে এসব?'

'তা দু'ঘণ্টা তো হবেই।'

আমরা বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই, ভাবল জ্যাকবসন। ম্যানোসের দিকে নজর দিল। 'তুমি কি মনে করে, দিমিত্রিওস?'

'আমাকেও ফোন করা হয়েছিল ক্যাপ সারাত থেকে। এখানে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে বেজে যেতে চাইলে।'

'আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে?' প্রশ্ন নয়, রীতিমত চার্জ করে বসল ওকে মিসেস জোনস।

'আছে,' বিরক্তি বোধ করল জ্যাকবসন। 'কেন?'

'এক্ষুণি আমাদের বেজে নিয়ে চলুন। এই জাহান্নামে আর এক মুহূর্তও থাকার ইচ্ছে নেই আমার।'

'সেটা ঠিক হবে না। পথে পথে গার্ড পোস্ট বসিয়েছে সিকিউরিটি পুলিস। কিছু সন্দেহ হলে আগে গুলি করবে ওরা, পরে প্রশ্ন করবে।'

'হেল্!' শ্রাগ করল কুপার। 'আমরা সাধারণ আমেরিকান, আমাদের সাথে ওদের কিসের শত্রুতা?'

'সাধারণ-অসাধারণে কোন তফাৎ নেই সেরারিয়েরের কাছে। আমেরিকান হলেই হলো, তার ধারণা সব আমেরিকানই সমান। তারা সবাই বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহ করে থাকে।' বারম্যানকে হুইস্কি দিতে বলল জ্যাকবসন।

'কিন্তু কমোডর এত দেরি করছে কেন?' ঝগড়াটে ভঙ্গিতে বলল মিসেস জোনস। 'তার তো বোঝা উচিত এখানে সমস্যা হচ্ছে আমাদের।'

বিতৃষ্ণার চোখে মহিলাকে দেখল সে। গ্লাসে চুমুক দিল। 'তাঁকে আরও অসংখ্য সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে এখন। তাঁর মাথার দায়িত্বের বোঝাটা অনেক বড়।'

'কিন্তু ঘটছেটা কি এসব?' বলল কুপার। 'আমি আগেও কয়েকবার এদেশে এসেছি, আর্মি-পুলিসের অনেক বাড়াবাড়ি দেখেছি, কিন্তু এবারের মত হয়নি কখনও। যুদ্ধ হলে রাস্তায় হবে, পাহাড়ে হবে, এখানে কি? এই হোটেল তো নিরপেক্ষ জোন, এখান থেকে সবাইকে নিয়ে যাওয়ার মত কি এমন ঘটল?'

কারণ বলতে গিয়েও থেমে গেল জ্যাকবসন। এখনই ঝড়-বন্যার কথা শুনলে হয়তো আতঙ্কিত হয়ে পড়বে এরা, হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। ক্রিস্টিনার দিকে তাকাল সে। শ্রাগ করল। 'বলে ফেলাই বোধহয় ভাল,' বলল মেয়েটি। 'মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাবে।'

'ওয়েল!' চোখ কুঁচকে ওকে দেখল লেখক, তারপর জ্যাকবসনের দিকে ফিরল। 'কি ব্যাপার?'

'বড় এক হারিকেন হিট্ করতে যাচ্ছে...'

বসা থেকে এক লাফে উঠে দাঁড়াল মিসেস জোনস। বাঁশীর মত তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল। 'কি বললেন!'

'ঘাবড়াবেন না। এখনই আসছে না ওটা, দু'দিন সময় আছে মাঝে।'

'ওহ্!' একটু শান্ত হলো সে। 'ঝড়টা কেমন, খুব পাওয়ারফুল?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সে ক্ষেত্রে এখানেই তো নিরাপদ থাকতাম আমরা,' কুপার বলে উঠল। 'ইভ্যাকুয়েশনের কি প্রয়োজন ছিল?'

আরেক চুমুক দিল জ্যাকবসন। 'হারিকেনের সাথে কোস্টাল এরিয়ায় বন্যাও হয়। বন্যা হলে এই হোটেল তলিয়ে যাবে।'

চোখ কপালে উঠল লেখকের। 'গড'স টীথ! তা-তাহলে সবাইকে বেজে নিয়ে যাওয়া কেন?'

'সময় থাকতে শিপে তুলে নিরাপদ কোথাও পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে।'

'কমোডর তাহলে আমাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কেন করছে না!' রাগে, ভয়ে মেঝেতে পা ঠুকল মিসেস জোনস। 'কেন সে...'

'নিশ্চই কোন বাধা আছে,' ক্রিস্টিনা বলে উঠল। 'নইলে গাড়ি পাঠাবে বলেও কেন পাঠাল না?'

'ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল জ্যাকবসন। 'দুপুরে দেখেছি সেরারিয়েরের আর্মি বেজ ঘেরাও করে রেখেছে। নিশ্চয়ই ওরা বাধা দিচ্ছে।'

'তাহলে আমাদের কি হবে?' বেশ কিছু সময় পর বলল কুপার। 'বেজে যদি যেতে না পারি, তাহলে? এখানেই বন্যার পানিতে ডুবে মরব?'

'না। আপনাদের নেগ্রিটো ভ্যালিতে নিয়ে যাব আমি। ওখানকার উঁচু পাহাড়ে আশ্রয় নেব সবাই মিলে। বন্যার পানি অত উঁচুতে উঠতে পারবে না।'

'তাই চলুন,' উঠে পড়ল মিসেস জোনস। 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।'

'সরি!' ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল ও। 'আমি আমার বন্ধুর অপেক্ষায় আছি। ও এলে তবে যাব।'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল মহিলার। 'কি হাস্যকর কথা! একজনের জন্যে আমাদের এতজনের জীবন বিপন্ন করার ঝুঁকি নিচ্ছেন আপনি? এক্ষুণি চলুন! যত দেরি হবে...'

'শাট ইওর মাউট!' অশুদ্ধ ইংরেজিতে ধমকে উঠল গ্রীক। 'আহাম্মক মেয়েছেলে!' মহিলা কুঁকড়ে গেছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে জ্যাকবসনের দিকে তাকাল। 'বলে যান, প্লীজ!'

'হারিকেন যদি বন্যা নিয়ে আসে, তাহলে সেইন্ট পিয়েরেতে প্রাণ বাঁচানোর মত একটাই জায়গা আছে। সেটা নেগ্রিটো ভ্যালি। ওখানে যেতে হলে খাবার আর পানি নিয়ে যেতে হবে আমাদের যত বেশি সম্ভব।'

'কতদিন থাকতে হতে পারে ওখানে?' ক্রিস্টিনা প্রশ্ন করল।

'তিন-চারদিন তো অবশ্যই। বন্যার পর কয়েকদিন শহরে পা রাখাই যাবে না। নানান অসুখ-বিসুখ...'

'তাহলে যাওয়ার আগে খেয়ে নেয়া উচিত আমাদের,' বাধা দিল ও।

'ঠিক। এদের কিচেনে কি আছে এখনই চেক করো। স্যান্ডউইচ যতগুলো সম্ভব তৈরি করে নাও।'

'সব ক'টার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' গজ গজ করে উঠল মহিলা। 'ঠিক আছে, চলো, আমিও যাই,' ক্রিস্টিনাকে বলল। 'তোমাকে সাহায্য করিগে।'

একটু পর জারভিস কুপারও উঠল। 'বাথরুম থেকে আসছি,' বলে বেরিয়ে গেল। জ্যাকবসন আর ম্যানোস বসে আছে নীরবে। বার টেন্ডার লোকটার খবর নেই। কখন বেরিয়ে গেছে কেউ খেয়ালই করেনি।

মিনিট পনেরো পর এক প্লেট স্যান্ডউইচ নিয়ে ফিরে এল ক্রিস্টিনা। কপালে বিরক্তির রেখা। 'এই মহিলাকে নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে দেখছি।'

'আবার কি হলো?' স্যান্ডউইচের গন্ধে পেটের মধ্যে মুচড়ে উঠল জ্যাকবসনের। দুপুরের পর আজ খাওয়া হয়নি, ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'একটা কুটো ভাঙার যোগ্যতা নেই, কেবল হুকুম করে। কান ঝালাপালা করে ছেড়েছে আমার।'

দুই কামড়ে একটা শেষ করে দ্বিতীয় স্যান্ডউইচের জন্যে হাত বাড়াল সে। 'পাত্তা দিয়ো না, না শোনার ভান করো।'

'তাই করব এবার,' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। খেতে খেতে ঘড়ি দেখল জ্যাকবসন—নয়টা। এখনও আসছে না কেন রানা? কোথায় সে? ভাবতে ভাবতে চিবানো বন্ধ হয়ে গেল, কান খাড়া করল। কাছেই কোথাও কুঁই-কুঁই আওয়াজ করছে গাড়ির এঞ্জিন।

উঠে পড়ল সে। জোর পায়ে এগোল সামনের দিকে। সুইং ডোর ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই, কেউ ওর গাড়ি মেরে দেয়ার তালে আছে। চাঁদের মৃদু আলোয় ড্রাইভিঙ সীটে বসা একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। এগোল জ্যাকবসন। মানুষটা জারভিস কুপার।

'কি করছেন আপনি?'

চমকে মাথা ঘোরাল সে। 'ওহ্, আপনি? এমনিই, মানে স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করছিলাম আর কি।'

'বেরিয়ে আসুন, স্টার্ট নেবে না। কারণ ওটার ডিস্ট্রিবিউটরের রোটর আর্ম আমার পকেটে।' চমকে উঠল জ্যাকবসন কাছেই হেঁড়ে গলার হাঁক শুনে।

'কি হচ্ছে এখানে?'

দুই পুলিসকে দেখতে পেল। রাস্তার ওপার থেকে এদিকে আসছে। বেশ সতর্ক। 'কিছু না,' প্রমাদ গুণল সে। ইঙ্গিতে কুপারকে দেখাল। 'বন্ধুর সাথে কথা বলছি।'

'এই অন্ধকারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিসের কথা?' বলল বাঁদিকের লোকটা। কুপারকে বের হতে দেখে চট্ করে অস্ত্র তুলল সতর্কতা হিসেবে।

'গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছিল না, তাই...' ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছিল জ্যাকবসন, থেমে গেল তার ধমকের সুরে প্রশ্নে।

'থাকেন কোথায় আপনারা?'

'এই হোটেলে।'

'ও,' বলে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু অন্যজন মৃদু স্বরে কি যেন বলায় জ্যাকবসনের দিকে তাকাল। 'আপনি কোন্ দেশী, ব্লাঙ্ক?'

'গ্রেনাডান।'

'আপনার বন্ধু?'

'আমেরিকান।'

'আমেরিকান!' থোক্ করে একগাদা থুতু ফেলল লোকটা, যেন বিষ্ঠার দুর্গন্ধ পেয়েছে, এমনভাবে নাক কোঁচকাল। কুপার অসহায়ের মত জ্যাকবসন আর দুই পুলিসের দিকে তাকাচ্ছে বারবার। স্থানীয় ভাষা বোঝে না সে। 'আপনি ক্যাপ সারাত বেজে কাজ করেন?' ঘৃণা প্রকাশ শেষ করে জানতে চাইল লোকটা।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে মিথ্যে বললেন কেন এখানে থাকেন?'

'মিথ্যে বলিনি,' রাগ দমন করে বলল জ্যাকবসন। 'ক্যাপ সারাত যাওয়ার উপায় নেই, আর্মি পথ বন্ধ করে দিয়েছে, তাই এখানে এসে উঠেছি।'

কি যেন ভাবল প্রথম পুলিস। মাথা ঝাঁকাল। 'দুঃখিত, ব্লাঙ্ক। আপনাদের সার্চ করব আমি।' সঙ্গীকে সতর্ক থাকতে ইঙ্গিত করে এগোল সে।

'অ্যাই, কি হচ্ছে?' সমস্যা টের পেয়ে বলে উঠল লেখক। 'কি করতে চাইছে গাধা দুটো?'

'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল ও। 'এরা আমাদের সার্চ করবে। বাধা দেবেন না।'

ওকে সার্চ করা হলো প্রথম। টাকার সাথে ওয়ালেট থেকে বের হওয়া আইডি আগ্রহের সাথে দেখল লোকটা কারের পার্কিঙ লাইটের আলোয়। 'ওখানে কি কাজ করেন, ব্লাঙ্ক? মিলিটারি জব?'

'না, আমি ওয়েদার সায়েন্টিস্ট। সিভিল।'

মুখ তুলে হাসল লোকটা। 'নাকি আমেরিকান স্পাই?'

'ননসেন্স!'

'আপনার বন্ধুকেও সার্চ করব আমি,' মন্তব্যটা গায়ে না মেখে বলল সে। 'হাজার হোক আমেরিকান।'

জ্যাকবসনের পরামর্শ ভুলে খেঁকিয়ে উঠল লেখক। 'খবরদার!' লোকটাকে এগোতে দেখে এক পা পিছিয়ে গেল। 'ছোঁবে না, সরাও তোমার নোংরা হাত!' পরক্ষণে সশব্দে আঁতকে উঠল ঠিক নাকের সামনে দ্বিতীয় পুলিসের রিভলভারের মাযল দেখে।

'আমি বলেছি বাধা দেবেন না,' রাগে দাঁতে দাঁত চাপল জ্যাকবসন। 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন!'

'কিন্তু...'

'চুপ করুন!'

সার্চ শুরু করল লোকটা, এবং প্রায় সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠল উল্লাসে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল জ্যাকবসন, মাথার মধ্যে চক্কর দিয়ে উঠল লোকটাকে

কুপারের কোটের ভেতর থেকে একটা ছোট্ট অটোম্যাটিক পিস্তল বের করতে দেখে।

'যাক,' তৃপ্তির হাসি ফুটল তার মুখে। 'অস্ত্রসহ দুই আমেরিকান স্পাইকে পাওয়া গেল তাহলে।'

'ভুল করছেন আপনি, আমরা...' থেমে গেল জ্যাকবসন কানের নিচে দ্বিতীয় পুলিস লোকটার গান মাযলের খোঁচা খেয়ে।

'আপনাদের অ্যারেস্ট করা হলো। চলুন।'

অসহায় চোখে হোটেলের দিকে তাকাল ও।

পাঁচ

হোটেলের সামনে থেমে পড়ল মাসুদ রানা। জ্যাকবসনের গাড়িটা দেখল চোখ কুঁচকে, বাইরে কেন ওটা? কাছে গিয়ে ঝুঁকে ভেতরে দেখতে গেল ও, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল। গার্ডদের বাঁটের একটা আঘাত বেকায়দামত লেগেছে, ভুলেই গিয়েছিল ওটার কথা। সোজা হয়ে হোটেলের গেটের দিকে তাকাল ও জায়গাটা চেপে ধরে, তখনই চোখ পড়ল মানুষটার ওপর। গেটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। 'কে?'

'আমি,' চাপা গলায় বলল সে।

'কে?' এগোল রানা।

'দিমিত্রিওস। মারাকা ক্লাবের মালিক।'

'ও। এই গাড়িটা এখানে কেন? জ্যাকবসন...'

'তাকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে।'

আঁতকে উঠল রানা। 'কি! কেন, কখন?'

'একটু আগে। আমেরিকান গাধাটাকে সার্চ করে অস্ত্র পেয়েছিল ওরা,' রানার চোখ কুঁচকে উঠতে দেখে আরেকটু খুলে বলার দরকার মনে করল দিমিত্রিওস। 'মিস্টার জ্যাকবসনের গাড়ি চুরি করে পালাতে যাচ্ছিল জারভিস কুপার। উনি টের পেয়ে হোটেল থেকে বের হয়ে আসতেই দুই পুলিস এসে হাজির। ওরা...। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখেছি সব।'

'কোনদিকে গেছে ওরা?'

হাত তুলে বাঁ দিকে দেখাল গ্রীক। 'ওদিকে। মনে হয় লোকাল লক-আপে।'

'কোন্ জায়গায়?' মহা ফাঁপরে পড়ে গেল রানা। এরকম সময় অস্ত্র হাতে ধরা পড়া যে কত মারাত্মক, বোঝে ও।

'লা প্লেস ডি লা লিবারেশন নোইরে,' বলে মাথা ঝাঁকাল। 'লাভ নেই। ওঁদের আমেরিকান স্পাই ভেবে ধরেছে পুলিস, ছাড়ানো যাবে না।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। কি করবে মাথায় আসছে না।

'সব দোষ লেখক লোকটার,' ঝাঁঝিয়ে উঠল গ্রীক। 'আমি দেখেছি। গাড়ি চুরি

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

ঠেকাতে কি একটা পার্ট খুলে আগেই পকেটে ঢুকিয়েছিলেন মিস্টার জ্যাকবসন, ওই জন্যেই পালাতে পারেনি ব্যাটা। নইলে…'

সব কথা কানে গেল না রানার, দুঃখের কথা ভাবছে। মার তো খেয়েছেই, তারওপর ঘাড় ধাক্কা খেয়ে প্যালেসের বাইরে এসে দেখে কনসালের গাড়ির চার চাকাই বসা। মজা দেখার জন্যে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে পাঙচার করে রেখেছে হারামজাদারা। সারাপথ ঠেলে নিয়ে এসেছে ওরা গাড়িটা। একা একা পথে অসুবিধেয় পড়তে পারে ভেবে হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছে দয়া করে ওকে রেহাই দিয়ে গেছেন ফুলারটন। এদিকে এটাও অকেজো। কোথাও যেতে হলে এখন হাঁটা ছাড়া পথ নেই।

'আপনার কার আছে?' প্রশ্ন করল ও।

'ছিল। আজ সকালে নিয়ে গেছে আর্মি।'

মেজাজ তেতো হয়ে উঠল। 'হোটেলের মানুষজন…'

'বেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রায় সবাইকে। আমি ছাড়া মিস ক্রিস্টিনা আর মিসেস জোনস আছে।'

'ভেতরে চলুন।' সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল রানা। বারের আলোয় ওর ধুলোবালিতে একাকার চেহারা, কয়েক জায়গায় ছেঁড়া কোট আর গালের রক্ত দেখে চমকে উঠল ক্রিস্টিনা।

'এসব কি, রানা? কি করে ঘটল?'

'ও কিছু নয়,' চেষ্টাকৃত দেঁতো হাসি দিল ও। 'সেরারিয়েরকে সতর্ক করতে যাওয়ার পরিণতি। বেচারী বুড়ো কনসালকেও কম খাতির যত্ন করেনি ওরা। একটু ব্র্যান্ডি দিতে পারো কি না দেখো তো!'

শুনতে পায়নি বোধহয় মেয়েটি, বোকার মত তাকিয়েই থাকল।

'কই, দাও!' ওর মন খারাপ হয়ে গেছে দেখে হাসল রানা।

'হাসছ?' কোনমতে বলল ক্রিস্টিনা। 'উপকার করতে গিয়ে…' কান্না ঠেকাতে নিচের ঠোঁট কামড়ে দ্রুত ঘুরে পা চালাল।

'লোকটা কে, বাছা?' প্রশ্ন করল মিসেস জোনস।

জবাব না দিয়ে রানার জন্যে ব্র্যান্ডি নিয়ে এল সে। 'এদের ফার্স্ট এইড কিট যে কোথায়! গালটা বেশ কেটেছে বোধহয়, দেখি!'

'না, তেমন নয়। কাজ শুরু করার আগে এক ব্যাটা গার্ড হাতের আংটি খুলতে ভুলে গিয়েছিল। তারপর, তোমার কি খবর? কি দেখলে বাইরে?' ওর জবাব শুনে হাসল। 'ওরা তাহলে উপকারই করেছে তোমার। আজকের রাতটা সত্যিই অনির্দিষ্ট ঘোরাঘুরির রাত নয়। তাও তোমার মত কারও।'

দিমিত্রিওস একটা মোমবাতি জ্বেলে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল আগেই, ছোট একটা বাক্স ঝোলাতে ঝোলাতে ফিরে এল। 'পেয়েছি, এই নিন্। কি আছে ভেতরে কে জানে!' বার কাউন্টারে রাখল সে ওটা।

'অনেক ধন্যবাদ।' বাক্স খুলে অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আর তুলো বের করে কাজে লেগে পড়ল ক্রিস্টিনা। 'আর কোথাও কেটেছে, রানা?'

'না।'

'এসব কি ভাবে ঘটল?' প্রশ্ন করল দিমিত্রিওস। 'সেরারিয়েরের কথা কি যেন বলছিলেন?'

অল্প কথায় ঘটনা খুলে বলল রানা। এতক্ষণে ভেতরের কারণ পরিষ্কার হতে গুঙিয়ে উঠল মিসেস জোনস। 'জেসাস! এই জন্যে...'

'ক্রাইস্ট!' বলল দিমিত্রিওস। 'হারামজাদা মানুষ না আর কিছু!'

এক প্লেট ঠাণ্ডা স্যান্ডউইচ এনে ওর সামনে রাখল ক্রিস্টিনা। 'খেয়ে নাও। কারেন্ট নেই বলে গরম করার উপায় নেই। কফি তৈরি করে রেখেছি ফ্লাস্কে।'

পেট ঠাণ্ডা হতে মাথা ফুল স্পীডে কাজ শুরু করে দিল মাসুদ রানার। নতুন এক সেট পোশাক পরে আবার বেরোবার জন্যে তৈরি হলো ও, জ্যাকবসনকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। কাজটা ঠিক হচ্ছে না জানে ক্রিস্টিনা, কিন্তু তবু বাধা দিল না। তাতে যে কাজ হবে না, তা ভালই বোঝে।

'এদের সেলার আছে?' প্রশ্ন করল রানা।

মাথা দোলাল গ্রীক। 'না। কেন?'

'তাহলে মেয়েদের নিয়ে টপ্ ফ্লোরে চলে যান আপনি। চেয়ার-টেবিল, খাট, যা দিয়ে পারেন সিঁড়িতে ব্যারিকেড তৈরি করে নেবেন। কেউ যেন সহজে টপকে যেতে না পারে ওপরে।'

'মানে! কারা...'

'এরকম সময় এই ধরনের জায়গা প্রথম লুটপাটের শিকার হয়। এখানেও হবে, কোন সন্দেহ নেই। কাজেই রাতটা সাবধানে কাটাতে হবে। আর,' ঠাণ্ডা চোখে লোকটাকে দেখল রানা। 'মেয়েদের দিকে নজর রাখবেন।'

'নিশ্চই রাখব!' মাথা দোলাল সে।

উঠে পড়ল ও। ক্রিস্টিনার কাঁধ বেষ্টন করে লাউঞ্জের দিকে এগোল, নিচু গলায় কথা বলছে। সুইং ডোরের কাছে ওদের দুটো ছায়াকে এক হয়ে যেতে দেখল দিমিত্রিওস। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলল রানা। 'চিন্তা কোরো না, সাবধান থেকো। তোমরা ভেতরে আছ, বাইরের কেউ যেন টের না পায়। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসার চেষ্টা করব।'

'কিন্তু কি করবে তুমি গিয়ে? কি করে ছাড়াবে জ্যাককে?' বলল ক্রিস্টিনা।

রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'উপায় একটা ভেবে রেখেছি, দেখা যাক কাজ হয় কি না। না হলে কাল অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

'দেখো, গার্ডদের চোখে পড়ে যেয়ো না।'

জারভিস কুপার একজন সফল লেখক। অল্পদিনেই বিশ্বজোড়া নাম কিনে ফেলেছে। সাহিত্যে অবদানের জন্যে এ বছর তার পুরস্কার-টুরস্কার পাওয়ার জোর সম্ভাবনা আছে। যে কোন বই এখন প্রচুর চলে তার, অ্যাকাউন্টে টাকা উপচে পড়ার মত অবস্থা।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে যে বছর মারা গেলেন, সে বছরই কুপারের প্রথম উপন্যাস 'টারপন' প্রকাশ হয়। আর কি আশ্চর্য, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেস্ট সেলার তালিকার এক নম্বরে চড়ে বসল ওটা। ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত,

এতই অভাবিত যে তার নিজেরই চোখ চড়কগাছ হওয়ার দশা। এরপর বের হলো দ্বিতীয় উপন্যাস, সেটারও একই অবস্থা—রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে গেল বাজারে। প্রকাশকদের লাইন লেগে গেল পিছনে, ব্যাঙ্কে জমতে থাকল মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের পাহাড়।

এরপর সাধারণের সামনে নিজেকে বিরাট কিছু একটা হিসেবে উপস্থাপনের নেশায় পেয়ে বসল জারভিস কুপারকে। কারণ ততদিনে সে নিশ্চিত, পাঠক তাকে হেমিংওয়ের বিকল্প হিসেবে দেখতে চায়। এবং হেমিংওয়ে কেবল লেখকই ছিলেন না, আরও অনেক কিছুই ছিলেন, অতএব সেই পথ ধরল লোকটা। যতভাবে সম্ভব নিজের প্রচার করতে উঠেপড়ে লাগল।

আফ্রিকা গিয়ে হাতী আর বাঘ শিকার করল, পত্রিকায় ছবিসহ সেসব ফলাও হলো সারা পৃথিবীতে। এরপর কিছুদিন ক্যারিবিয়ান ও সেইশেলসে মাছ ধরে বেড়াল। আলাস্কার এক পাহাড়ে উঠল। হেমিংওয়ের মত নিজের প্লেন নিয়ে আকাশে উঠল, তাঁর মত সেটা ধ্বংসও করল। অদ্ভুত ব্যাপার যে এসব ঘটনার প্রতিটা ক্যামেরায় বন্দী করার জন্যে ফটোগ্রাফাররা জারভিস কুপারের ধারেকাছেই ছিল। পৃথিবী দেখল সব, জানল, বাহবা দিল তাকে। বিনা দ্বিধায় তাকে দ্বিতীয় আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলে আখ্যাও দিল অনেকেই। যদিও ভেতরের আসল খবর জানা হলো না কারও।

যে সিংহ সে শিকার করেছিল, বীটারদের তাড়া খেয়ে প্রাণের ভয়ে সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত ছিল সেটা। বাঘটাও তাই। আরও সত্যি কথা, সাহায্যকারী শিকারীদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থেকেও পালাতে ব্যস্ত পশু দুটোকে সামনাসামনি দেখে এতই ভয় পেয়েছিল কুপার যে গুলি দু'চারটে প্রথমে আকাশ সই করে ছুঁড়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মরেছে ওগুলো, তিন-চারটে করে গুলি খেয়ে।

পাহাড়ে চড়েছে সে একদল ওস্তাদ মাউন্টেনিয়ারের সাহায্যে। লোকগুলো তাকে আক্ষরিক অর্থে বেঁধেছেঁদে বোঁচকার মত টেনে তোলে ওপরে। উচ্চতা সম্পর্কে বেশ ভয় আছে জারভিস কুপারের, প্লেনের মালিক হলেও ও জিনিস নিজে চালানোর মত সাহস ইহজন্মে কোনদিনও হবে না তার। কাজটা ঘটিয়েছে সে পাইলটের সাহায্যে, স্রেফ নিজের ইমেজ প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে।

তবে মাছ সে ধরতে পারে সত্যি। এ কাজে কোন ফাঁক নেই, কারও সাহায্যের প্রয়োজনও পড়ে না। এ জন্যে মাসের পর মাস কাটায় ক্যারিবিয়ানে-সেইশেলসে। সখ। এর পাশাপাশি লিখে চলেছে। কারণ সে বুঝে গেছে পৃথিবীতে টাকার কোন বিকল্প নেই। শুধু নামে কাজ হয় না। লেখে সে, প্রত্যেকবার ভয়ও পায়, এই বুঝি ধস নামল তার ক্যারিয়ারে।

এ মুহূর্তে তার নাম আছে, টাকা আছে, দুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই যেখানে নামে চেনে না জারভিস কুপারকে। কাজেই সেরারিয়েরের মত পুঁচকে এক দেশের প্রেসিডেন্টকে তার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। লোকটা যে তার কিছুই করতে পারবে না, জানে। তাই ঘাবড়ায়নি, আগের মেজাজেই আছে।

ছোট্ট সেলের পাথরের দেয়াল আর জঙ ধরা লোহার গরাদ দেখল সে বিতৃষ্ণার সাথে। মাথার অনেক ওপরের খুদে ফোকরটা দেখল। বাইরের আলো-

বাতাস আসার একমাত্র পথ ওটা। এ মুহূর্তে যদিও কোনটাই আসছে না। ফ্যাকাসে রঙের এক টুকরো আকাশ দেখা যায় কেবল। একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে ওটা দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করছে জ্যাকবসন। ওর অস্থিরতা দেখে করুণা জাগল লেখকের মনে। শ্রাগ করল সে। 'খানিকটা ড্রিঙ্ক পেলে ভাল হত,' কটে বসে আরেকদিকে তাকিয়ে বলল। 'হারামজাদারা আমার ফ্লাস্কটা কেড়ে নিয়েছে।'

নেমে পড়ল জ্যাকবসন। চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকাল। 'কি এমন হাতী-ঘোড়া মারার জন্যে পিস্তল নিয়ে বেরিয়েছিলেন?'

'সব সময় ওটা সঙ্গে রাখি আমি। রাখতে হয় আমার মত অসাধারণকে। নইলে সমস্যায় পড়তে হয়, ইউ নো! আমি যা লিখি, কারও কারও পছন্দ হয় না। তাদের অনেকে মুখে বলার চেয়ে হাতে বলতে পছন্দ করে, তাই রাখি। ওটার লাইসেন্স আছে আমার সঙ্গে, ভয়ের কিছু নেই।'

'আপনার লাইসেন্সে এদেশে বরফ গলবে বলে মনে হয় না।'

'অবশ্যই গলবে!' রেগে উঠল কুপার। 'গলতেই হবে। এরা অশিক্ষিত, মাথামোটা ঠোলা, কারও মর্যাদা দিতে জানে না। এদের প্রেসিডেন্টকে দেশের বাইরে ক'জন চেনে? আমাকে চেনে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষ। অপেক্ষা করুন, এদের বড় কোন অফিসার এলে তার সামনে শুধু আমার নামটা বলুন। তারপর দেখুন ছাড়ার আগে কতবার বাপ্ ডাকে।'

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকল জ্যাকবসন। সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের কোন খবরই সে বলতে গেলে রাখে না। বুঝে উঠতে পারছে না এসব বিশ্বাস করবে কি না। 'আপনি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই সিরিয়াস! আমাকে অ্যারেস্ট করে মস্ত গাধামি করেছে এরা। এ খবর যখন দুনিয়ার সমস্ত পত্রিকায় লীড নিউজ হবে, তখন আপনাদের টিন পট ব্যানানা রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট বুঝবে কত ধানে কত চাল হয়। আমেরিকা সহজে মেনে নেবে না এই ঘটনা, দেখবেন।'

মাথা দোলাল জ্যাকবসন। 'সেরারিয়েরকে চেনেন না আপনি। আপনাদের দেশটাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে সে। ঘৃণা করে আমেরিকানদের। তাছাড়া আপনার নাম সে শুনেছে বলে মনে হয় না আমার।'

'নিশ্চই শুনেছে। কি যে বলেন না!'

'বাইরের গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? ফ্যাভেলের সাথে প্রাণ বাঁচানোর লড়াই করছে এখন সেরারিয়ের। ফ্যাভেল জিতে গেলে কি হবে জানেন নিশ্চই? এখন তার মাথার ঠিক নেই। কোন আমেরিকান নভেলিস্টকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। আপনি বলছেন আপনার অ্যারেস্টের কথা শুনলে আমেরিকা অসন্তুষ্ট হবে, ব্যাপার যদি সত্যিই তাই হয়, এবং সেরারিয়ের জানতে পারে যে তার পুলিস আপনাকে ভুল করে ধরে এনেছে, আপনাকেই গাপ্ করে দেবে সে। তারপর অ্যারেস্টের বিষয়টা সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে।'

কপাল কুঁচকে উঠল জারভিস কুপারের। 'গাপ্ করে দেবে মানে?'

'মানে ডাক্তার যেমন নিজের ভুল চাপা দিতে রুগী মেরে ফেলে, শূটিং পার্টি

পাঠিয়ে আপনাকেও তেমনি লোপাট করে দেবে সেরারিয়ের। আমিও মরব আপনার সাথে। মেরে লাশ দুটো আন্ডারগ্রাউন্ড সেলের মেঝে খুঁড়ে পুঁতে রাখবে। কাজেই প্রার্থনা করুন যেন বড় কোন অফিসার না আসে, খবরটা যেন প্রেসিডেন্টের কান পর্যন্ত না যায়।'

'ননসেন্স! এমন কাজ সে করতেই পারে না। আমি গত পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত এ দেশে আসা-যাওয়া করছি, অনেক বড় বড় সরকারী অফিসারের সাথে পরিচয় আছে আমার। তাদের মধ্যে কালোও আছে কেউ কেউ, চমৎকার মানুষ।'

মানুষটার আস্থার বহর দেখে ভীষণ রাগ হলো বিশেষজ্ঞের। 'আপনি জানেন, ক্ষমতায় বসার পর থেকে এ পর্যন্ত সেরারিয়ের কত মানুষ খুন করেছে? বিশ হাজার, বুঝলেন? এক-দুই বা পাঁচ-সাত হাজার নয়, বি-শ হাজার মানুষ। তার সাথে আমাদের দু'জনকে যোগ করতে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে না সে।' একটু থামল সে লেখককে তথ্যটা বদহজম করার সুযোগ দেয়ার জন্যে। 'আপনার পরিচিত দুয়েকজন চমৎকার মানুষের নাম বলুন দেখি!'

'কেন, সবচে' ঘনিষ্ঠভাবে চিনি আইল্যান্ড অ্যাফেয়ার মিনিস্টার...' থেমে পড়ল সে জ্যাকবসনের চোখ চুলের সীমানার দিকে রওনা হয়েছে দেখে। 'কি!'

'ওনাদি ওমারু? হা ঈশ্বর!' গুঙিয়ে উঠল ও।

'কি হলো?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জ্যাকবসন। 'মন দিয়ে শুনুন, মিস্টার। আপনার এই চমৎকার মানুষটি ছিল সেরারিয়েরের সিক্রেট পুলিসের চীফ। প্রেসিডেন্ট যখন যাকে, যতজনকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছে, নীরবে তা পালন করে এসেছে সে গত সাত বছর ধরে। আজ সে নেই, হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে নিজ হাতে যে পথে পাঠিয়েছে, সে-ও গেছে সেই পথে।'

'মানে?' বিমূঢ় চেহারা হলো কুপারের।

'চাকরি জীবনে প্রভুর একটা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয়েছে সে, ফ্যাভেলকে শেষ করতে পারেনি, তাই তাকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে সেরারিয়ের।'

'এসব...এ খবর আপনি জানলেন কি করে?' মিনমিন করে বলল সে। গলার জোর হারিয়ে ফেলেছে। 'কে বলল?'

'কমোডর।' হতভম্ব লেখকের মুখের দিকে তাকিয়ে তার বিস্ময়ের মাত্রা পরিমাপ করার চেষ্টা করল জ্যাকবসন। 'খুব সম্ভব টুর র‍্যাম্বিউ সেন্ট্রাল জেলের ভেতরে মাটির নিচে শেষ আশ্রয় জুটেছে ওনাদি ওমারুর।'

দীর্ঘসময় আহাম্মকের মত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'সত্যি? আশ্চর্য! মানুষটা যে কত হাসিখুশি, গল্পবাজ ছিল, বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। ওরকম কারও পক্ষে এমন কাজও সম্ভব? জিজাস! এমন এক নির্দয় খুনীর সাথে এতদিন মাছ ধরেছি আমি!'

প্রচণ্ড বিস্ময় আর অবিশ্বাসের ধাক্কায় বিশালদেহী মানুষটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে অর্ধেক বনে গেল যেন। কিন্তু তাতে জ্যাকবসনের রাগ কমল তো না-ই, বরং আরও বেড়ে গেল। 'আপনি আমার গাড়ি নিয়ে পালাতে যাচ্ছিলেন?'

মাথা দোলাল সে। 'হারিকেনের কথা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম ভীষণ। ভেবেছি পালিয়ে...'

'আমাদের কথা একবারও মনে জাগল না আপনার?'

চুপ করে তাকিয়ে থাকল লোকটা হাবার মত।

'লেখক-সাহিত্যিকরা শুনেছি মনের দিক থেকে অনেক বড়, অনেক আন্তরিক হয়। আর আপনি কি না...কেমন লেখক আপনি?'

আস্তে শুয়ে পড়ল কুপার। দেয়ালের দিকে ফিরে বলল, 'গো টু হেল্!'

ভয়াবহ গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল মাসুদ রানার। ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল কোথায় আছে বোঝার জন্যে। হাঁপ ছাড়ল। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হোটেলে, নিজের রুমেই আছে ও।

যে জন্যে ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়েছিল রাতে, সে কাজ করতে পারেনি। মুক্ত করার ব্যবস্থা করতে পারেনি জ্যাক ও কুপারের, সুযোগই হয়নি। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে ঘোরাঘুরি করেছে কেবল। পথে পথে, মোড়ে মোড়ে এত পুলিস, বিশ গজও নিশ্চিন্তে এগোতে পারেনি। বারবার আড়ালে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

পরে পরিকল্পনা পাল্টে ব্রিটিশ কনসুলেটে গিয়েছিল আবার বহু কষ্টে। কনসালকে দিয়ে কয়েকটা লক্-আপে ফোন করিয়ে ওদের কোথায় রাখা হয়েছে, কেবল সেই খবরটাই বের করতে পেরেছে কোনমতে। আর কোন কাজ হয়নি। ওদের ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে কনসালের ব্যক্তিগত অনুরোধে কানই দেয়নি লক-আপ ইন চার্জ, স্লাউস ইন্সপেক্টর রসিউ। ওরা আমেরিকান 'স্পাই', ফুলারটনকে জানিয়েছে সে। কাজেই ছাড়ার প্রশ্নই আসে না। সময়মত প্রেসিডেন্টকে জানানো হবে বিষয়টা, তারপর তিনি করবেন যা করার।

ফিরে আসা ছাড়া উপায় ছিল না রানার। প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এবার অন্য পথ দেখতে হবে।

জানালার পাশে চেয়ার নিয়ে বসা দেখল ও ক্রিস্টিনাকে, রানার ক্যামেরা দিয়ে অনবরত ছবি তুলছে। নিচের রাস্তায় বেশ শোরগোল চলছে। মেয়ে-পুরুষদের চেঁচামেচি, শিশুদের কান্না ভেসে আসছে। চতুর্দিকে অনবরত গুলি ফুটছে। কান পাতা দায়।

'কি অবস্থা?' প্রশ্ন করল রানা।

'খুব খারাপ,' মুখ না ঘুরিয়ে জবাব দিল মেয়েটি। 'মনে হচ্ছে সরকারী বাহিনী পিছু হটছে। সাধারণ মানুষও আছে। অনেকেই আহত। বিচ্ছিরি অবস্থা।'

উঠে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। চোখ কুঁচকে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। 'লক্ষণ ভাল নয়,' বলল গম্ভীর মুখে।

'মানে?'

'সেরারিয়ের রিট্রিট করছে ঠিকই, কিন্তু সহজে হাল ছাড়বে না।'

'উপায় কি না ছেড়ে?' ভিউ ফাইন্ডার থেকে চোখ তুলল মেয়েটি।

'উপায় আছে। খেয়াল করে দেখো, পাবলিক পালাতে চাইছে, কিন্তু সৈন্যরা পথ আগলে রেখেছে। ওদের সামনে বর্ম হিসেবে রেখে নিজেদের পিঠ বাঁচাবার

চেষ্টা করছে ব্যাটারা। ফ্যাভেল এই অবস্থায় বড় ধরনের হামলা চালাতে পারবে না জানে বলেই কাজটা করছে। একেবারে নির্বোধ নয় তাহলে সেরারিয়ের, বুদ্ধি কিছু আছে। যুদ্ধ এখন স্ট্রীট ফাইটিঙের দিকে গড়াবে, একের পর এক চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে ফ্যাভেলকে নাস্তানাবুদ করতে চাইবে লোকটা।'

থেমে ডানে-বাঁয়ে দেখে নিল ও। 'এর ফলে লড়াই দীর্ঘায়িত হবে। মানুষের ভোগান্তি বেড়ে যাবে বহুগুণ।'

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। যুদ্ধ যত গড়াবে, তত বাড়বে সবার সমস্যা। ওর নিজেরও। জ্যাকবসনদের ছাড়িয়ে আনা অসম্ভব হয়ে উঠবে। অথচ ব্যাপারটার সমাধান করা খুবই জরুরী। জ্যাকের হিসেব অনুযায়ী হারিকেনের আঘাত হানতে আর বেশি দেরি নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়া দরকার। সেই সাথে রানার দ্বিতীয় পরিকল্পনা কাজে খাটানোর চেষ্টা করতে হবে। যদি তা করা না যায়, হারিকেন তার আগেই এসে পড়ে, সর্বনাশ ঘটে যাবে।

আর্টিলারির গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনে মনে হয় ফ্যাভেলের বাহিনী পাহাড়ের আশ্রয় ছেড়ে নেমে এসেছে, শহরের বেশ কাছে পৌঁছে গেছে। কাজটা বোধহয় ঠিক হয়নি। রাতে এগিয়েছে ফ্যাভেল। আর্টিলারির আওয়াজ শুনে এখন যেখানে আছে মনে হচ্ছে, সে পর্যন্ত পৌঁছতে বেশ দ্রুতই এগোতে হয়েছে। তার মানে মপিঙ-আপ অপারেশন সেরে আসেনি সে। পথে এখানে-সেখানে কিছু না কিছু সরকারী সৈন্য রয়ে গেছে ঘাপটি মেরে, তাদের বন্দী করার ব্যবস্থা নেয়নি।

এখন তাদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ আছে। পিছন থেকে ফ্যাভেলের বাহিনীর ওপর চড়াও হতে পারে তারা। এতদিক সামাল দেয়ার ক্ষমতা কি আছে বিদ্রোহী নেতার? এর ওপর আছে সেরারিয়েরের আর্টিলারি, আর্মার এবং এয়ারফোর্স। সে সব যদিও তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়। এয়ারফোর্স বলতে আছে তার তিনটে মাত্র প্লেন, তাও যুদ্ধের নয়, সিভিলিয়ান। চারটা অ্যান্টিক ট্যাঙ্ক, আর ডজন দুয়েক ট্রাক ইত্যাদির আর্মার্ড বহর।

পাহাড়ে থাকলে ওগুলোকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারত ফ্যাভেল, কিন্তু দিনের বেলা খোলা জায়গায় তা সম্ভব হবে না। একটা যেমন-তেমন ট্যাঙ্কও যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে এ সময়, পাইলট চোখে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিতে পারে কিসের ওপর বোমা ফেলছে সে। এ থেকে রেহাই পাওয়ার একটাই উপায় আছে ফ্যাভেলের, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে শত্রুর আর্টিলারি বাহিনীকে তৈরি হওয়ার আগেই ছত্রভঙ্গ করে ফেলা। নিচের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে মনে হয় এখনও সে সময় আছে।

পিছিয়ে এল রানা। খুব তাড়াতাড়ি শাওয়ার-শেভ সেরে তৈরি হয়ে নিল। দুটো স্যান্ডউইচ আর কফি খেয়ে সিগারেট ধরাল।

'জ্যাককে ছাড়িয়ে আনতে পারার কোন সম্ভাবনা আছে, রানা?'

চোখ তুলে মেয়েটিকে দেখল ও। 'খুব বেশি একটা নেই।'

'তোমার পরিকল্পনা কি?'

'ভেবেছি ফ্যাভেলকে ধরে কাজটা করব, যদি সুযোগ হয়।'

চেহারা কালো হয়ে গেল ক্রিস্টিনার। 'এরমধ্যে তাকে পাচ্ছ কোথায় তুমি?

আর এই অবস্থায় যুদ্ধের মাঝখানে এক বিদেশীকে রাস্তায় দেখলে…'

'উপায় নেই, ক্রিস্টি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'দেখা করতেই হবে তার সাথে। সেরারিয়েরকে দিয়ে হলো না, এখন ফ্যাভেলকে দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হবে। ষাট হাজার শহরবাসীকে রক্ষা করার এ ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না।'

'জ্যাকের হিসেব অনুযায়ী আর বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা পর হিট করবে হারিকেন, এর মধ্যে এতবড় একটা কাজ কি করে সম্ভব হবে?'

'জানি না। কিন্তু তাই বলে বসে থাকাও তো যায় না।' ঘড়ি দেখল ও। সাড়ে সাতটা। 'আটটার দিকে এখানে আসার কথা কনসাল ফুলারটনের। গাড়ি নিয়ে আসবেন ভদ্রলোক তোমাদেরকে নেগ্রিটো ভ্যালি নিয়ে যেতে। আমার জন্যে এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তোমরা। যদি তার মধ্যে ফিরে না আসি, এক সেকেন্ডও দেরি করবে না, বেরিয়ে পড়বে। নেগ্রিটোর কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, বলেছে জ্যাক?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ক্রিস্টিনা। চিন্তিত। 'উত্তরদিকে। অন্তত একশো ফুট ওপরে, ছোট ছোট গর্ত করে ভেতরে বসে থাকতে বলেছে।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বের হওয়ার আগ পর্যন্ত অবশ্যই সতর্ক থাকবে। বাইরের কারও চোখে পড়া চলবে না। বিপদ ঘটে যেতে পারে। লুটপাট করার সময় যদি ফাও হিসেবে দুই সাদা চামড়ার সুন্দরীকে পেয়ে যায় ব্যাটারা, তাহলে…' ইচ্ছে করে কথাটা শেষ করল না ও।

উঠে ব্রীফকেস থেকে মেকাপের বাক্সটা বের করল। 'দিমিত্রিওসকে ডাকবে একটু? লোকটাকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিয়ে যাই।'

আটটার একটু পর বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা।

কনসালের পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে নয়টা বেজে গেল। তখনও ঘুম ভাঙেনি মিসেস জোনসের, বেঘোর। বাইরের এত শব্দের মধ্যে মহিলা ঘুমাচ্ছে কি করে ভেবে পেল না ক্রিস্টিনা। অনেক টানাহ্যাঁচড়া করে তার ঘুম ভাঙাল ও। বিছানা-কম্বল নিজেকেই বেঁধে নিতে হবে শুনে মেজাজ বিগড়ে গেল মহিলার।

'এইজন্যেই কাল বারবার বলেছি এখানে থেকে কাজ নেই,' রাগে গজগজ করে উঠল সে। 'এত করে বললাম বেজে চলো সবাই, কেউ শুনল না আমার কথা।'

'আপনি ভালই জানেন তা সম্ভব ছিল না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ক্রিস্টিনা। 'সে উপায় থাকলে কেউ এখানে বসে থাকতাম না আমরা।'

প্রথমে নিজের হাতব্যাগ গোছাল মহিলা, তারপর বিছানা। 'একদল জংলীর মধ্যে আমাদের পড়ে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। ঠিক আছে, সময় হোক, কমোডরকে দেখে নেব আমি। তুমি আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাছা, বোঝাটা নাও, চলো কোথায় যেতে হবে!' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সে হাতব্যাগটা বুকে চেপে ধরে।

ক্রিস্টিনার অসহায় অবস্থা দেখে দিমিত্রিওস এগিয়ে এল সাহায্য করতে, বোঁচকা কাঁধে নিয়ে নিচে চলে এল। লাউঞ্জে কনসালকে বসা দেখে ক্রিস্টিনার

দিকে তাকাল মহিলা। 'ইনি কে?'

'ব্রিটিশ কনসাল,' ও পাত্তা দিল না দেখে গ্রীক বলল। 'আমাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।'

কোনরকমে বৃদ্ধের সাথে পরিচয়ের দায় সেরে বের হওয়ার উদ্যোগ নিল সে। 'গুড! তাহলে আর দেরি কেন? চলুন চলুন!'

'এখনই নয়,' বলল দিমিত্রিওস। 'এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'কেন?' রীতিমত কৈফিয়ত তলব করে বসল সে।

জবাব না দিয়ে তার বোঁচকা নিয়ে সিঁড়ির নিচে ঢুকে গেল লোকটা। এক হাতে ফ্লাস্ক, অন্যহাতে বড় এক কাগজের ঠোঙা নিয়ে ফুলারটনের দিকে এগোল ক্রিস্টিনা। 'সকালে খাওয়া হয়নি নিশ্চই?'

হাসলেন ভদ্রলোক। 'সময় পাইনি।'

'চলুন তাহলে,' সিঁড়ির নিচে দেখাল ইঙ্গিতে। 'ওখানে বসে খেয়ে নেয়া যাক। আমরাও খাইনি।'

'কিন্তু আমাদের কেন অপেক্ষা করতে হবে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মহিলা।

বিরক্ত হয়ে উঠল দিমিত্রিওস। রাগও হলো একটু। 'মিস্টার মাসুদ রানার ফিরে আসার জন্যে। উনি এলে...'

'কেন? তার জন্যে বসে থাকতে হবে কেন?'

মুখ খুলেছিল গ্রীক কথা বলার জন্যে, বাইরে কয়েক জোড়া ভারী বুটের আওয়াজ শুনে হপ্ করে বুজে ফেলল। ফ্যাকাসে হয়ে উঠল চেহারা। 'কুইক! সিঁড়ির নিচে চলুন সবাই। এসে পড়েছে ওরা!'

ক্রিস্টিনা আর কনসাল পা চালাল সেদিকে, কিন্তু মিসেস জোনস নড়ে না। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে দিমিত্রিওসের দিকে। 'সিঁড়ির নিচে মানে?'

বাহু ধরে টানল তাকে লোকটা। 'তাড়াতাড়ি আসুন! কারা যেন আসছে। দেখে ফেললে বিপদ হয়ে যাবে।'

সিঁড়ির নিচে ছোট একটা স্টোররুমে ঢুকল ওরা, দরজাটা আধ ইঞ্চিমত ফাঁক করে তাতে চোখ রেখে বসল গ্রীক। যাওয়ার আগে জায়গাটা রানা খুঁজে বের করে রেখে গেছে ওদের আত্মগোপন করে থাকার জন্যে। কিন্তু ভেতরের ভ্যাপসা গন্ধে অস্থির হয়ে উঠল মিসেস জোনস। অন্ধকারে নাকে রুমাল ধরে মেঝেতে বসে থাকা যে তার ভারি অপছন্দ, বারবার শোনাতে লাগল সে কথা। কণ্ঠ সংযত রাখার কোন চেষ্টাই নেই। বাইরে যে বুটের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে, যে-কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে পারে, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও পাত্তাই দিচ্ছে না।

বাধ্য হয়ে হাত চালাল গ্রীক। কি করল সে-ই জানে, তবে কথা বন্ধ হয়ে গেল মহিলার। একদম চুপ।

একদল সৈনিকের হুল্লোড় চলছে বারে, গ্লাস-বোতল ভাঙার আওয়াজ আসছে। আরও অনেক জোড়া বুটের শব্দ উঠল। 'সর্বনাশ!' চাপা গলায় বলে উঠল দিমিত্রিওস। 'শালারা যে পার্টি শুরু করে দিল!'

'মহিলাকে কি করেছেন আপনি?' উদ্বিগ্ন গলায় বললেন কনসাল। 'মরে-টরে যায়নি তো?'

'না। ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি কেবল।'

এগারোটায় নয়, দুটোয় বের হওয়ার সুযোগ জুটল দলটার। তখন পর্যন্ত পাত্তা নেই রানার।

ছয়

বেরিয়েই দেখল মাসুদ রানা, সামনের রাস্তায় মানুষের মিছিল। ছেলে-মেয়ে, গাট্টি বোঁচকা নিয়ে দিশেহারার মত ছুটছে বয়স্করা। ছুটছে বুড়ো-বুড়ি। কারও কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য আছে বলে মনে হয় না, এলোপাতাড়ি দৌড়-ঝাঁপ করছে সবাই। এদিকে গুলি হলে ওদিকে ছোটে, ওদিকে হলে সেদিকে। তাদের সম্মিলিত চিৎকার ও শিশুদের কান্নায় গোটা এলাকা সরগরম।

বাঁ দিকে তাকাল ও, সিটি স্কয়্যার প্লেস দে লা লিবারেশন নোইরের দিকে। বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা—মোটামুটি প্রশস্ত চার রাস্তার সংযোগ, সেইন্ট পিয়েরের প্রাণকেন্দ্র।

আগুন জ্বলছে ওখানে। পাক্ খেয়ে ওপরে উঠছে ঘন কালো ধোঁয়া, আকাশ ছেয়ে গেছে। চোখ ফেরাবার আগে আরেকটা বিস্ফোরণের ঝলক দেখতে পেল ও একই জায়গায়, বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠল মাটি।

উল্টোদিকে পা চালাল রানা। মানুষের ভিড়ে ঢুকে প্রথমে কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে থাকল সবাই তাকিয়ে আছে ভেবে। মনে হলো সন্দেহের চোখে ওকে দেখছে সবাই। একটুপরই অবশ্য ভাবটা কেটে গেল। এরা এখন যে যার প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত, কোনওদিকে তাকিয়ে দেখার সময় কারও নেই। তাছাড়া ওর দিকেই তাকিয়ে থাকার বিশেষ কোন কারণও নেই। মুখে, গলায়, হাতে, ঘাড়ে রঙ মেখে মেকাপ নিয়েছে রানা। গায়ের রঙে আর স্থানীয়দের সাথে বিশেষ একটা তফাৎ নেই ওর। কাজ পাকা হয়নি ঠিকই, তবে এই হুলস্থুলের মধ্যে ব্যাপারটা যে কারও চোখে পড়বে না, সে ভরসা মোটামুটি করা যায়।

বৃষ্টির মত গুলি হচ্ছে। তার সাথে আছে শেলের ভয়াবহ তীক্ষ্ণ শব্দে বাতাস কাটার ও একের পর এক বিস্ফোরণের কান ফাটানো আওয়াজ। মুহূর্তের জন্যে বিশ্রাম পাচ্ছে না কান। এত আওয়াজও মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচির আড়ালে প্রায় চাপা পড়ে গেছে। কিছু সৈনিককে ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকতে দেখল রানা, আতঙ্কে অস্থির। ঘামে জবজব করছে পোশাক, বিস্ফারিত চাউনি। অস্ত্র আছে কারও কারও সঙ্গে, বেশিরভাগের হাত খালি। কয়েকজন আহতও আছে দলে।

সবাই অল্পবয়সী। এতই ভয় পেয়েছে যে জনতার সাথে মিশে নেই হয়ে যেতে চাইছে। খুব সম্ভব জীবনে প্রথম আর্টিলারি ব্যারেজের সামনে পড়েছে এরা। আক্রমণের ভয়াবহতা দেখে মনোবল চুরমার হয়ে গেছে বলে পালাবার চেষ্টা করছে। তাদের একজনকে দেখল ও দু'হাতে পেট আঁকড়ে ধরে এগোচ্ছে। দুই হাতের কনুই পর্যন্ত রক্তে মাখামাখি। আঙুলের ফাঁক দিয়ে নাড়ীভুঁড়ি দেখা যাচ্ছে

ছেলেটার। পেট চিরে গেছে, একটু ফাঁক পেলেই বেরিয়ে আসবে ভেতরের সব কিছু।

অন্য আহতদের কারও হাত নেই, কারও পা নেই, তবু সবাই বাঁচার তাগিদে ছোটাছুটি করছে নিরাপদ কোন আশ্রয়ের খোঁজে। এদের মধ্যে তবু কিছু শৃঙ্খলা আছে, আস্তে ধীরে হলেও একদিকেই চলেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ওসবের বালাই নেই। দিগ্বিদিক্ ছুটছে। এক বয়স্ক লোককে দেখল রানা, কয়েক মিনিটের মধ্যে ছয়বার ছয়দিকে ছোটাছুটি করল সে দিক্‌ভ্রান্তের মত, তারপর হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে কারও নাম ধরে ডাকতে ডাকতে।

লাল স্কার্ট ও সাদা ব্লাউজ পরা সুন্দরী এক তরুণীকে দেখল, পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'হাতে কান চেপে ধরে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাচ্ছে। চেঁচিয়েই চলেছে, থামার লক্ষণ নেই। আতঙ্ক সমস্ত সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে কদাকার করে তুলেছে মেয়েটির চেহারা।

এরমধ্যে থাকলে কোথাও পৌঁছতে পারবে না ভেবে সাইড রোডের খোঁজে লেগে পড়ল রানা। মিনিটদশেক পর প্রথম গলি চোখে পড়তে ঢুকে পড়ল ওটায়। তেমন ভিড় নেই এ পথে, কাজেই জোরে পা চালাল ও। কিছুটা এগিয়ে এক অল্পবয়সী সৈনিকের ওপর চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল। একেবারেই অল্প বয়স তার, গোঁফের রেখা সবে দেখা দিয়েছে। চারা গাছের সাথে হেলান দিয়ে একটা কমলা কাঠের বাক্সের ওপর ঝিম্ মেরে বসে আছে।

আস্তিনের নিচে বাঁ হাতের কনুই বেকায়দাভাবে ওপরদিকে ঠেলে উঠে আছে তার। ব্যথায় ফোঁপাচ্ছে ছেলেটা, ঘামছে দরদর করে। তার রাইফেল পাশে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ভাঙা ভাঙা নেটিভ ফ্রেঞ্চে জিজ্ঞেস করল, 'হাত ভেঙে গেছে?'

ঘোলাটে দৃষ্টিতে ওকে দেখল সৈনিক। রোদ লেগে চক্‌চক্ করে উঠল ফ্যাকাসে চেহারা। চোখ কুঁচকে উঠল—বোঝেনি।

নিজের হাত দেখাল রানা। *'লে ব্রাস,'* দু'হাত মুঠো করে মট্ করে কাঠি ভাঙার ভঙ্গি করল। 'ভেঙে গেছে?'

মাথা দোলাল সে।

'আমি ঠিক করে দিচ্ছি।' টিউনিক খুলে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল রানা। কাঠের বাক্সটা লাথি মেরে ভেঙে কয়েকটা সরু ফালি বের করে তার বুটের ফিতে, রুমাল নিয়ে তৈরি হলো। 'ব্যথা লাগবে,' বলল ও। 'মন শক্ত করো।'

ছেলেটাকে কাত করে বগলের নিচে এক পা রেখে দাঁড়াল ও, তারপর দু'হাতে তার ভাঙা হাত ধরে হ্যাঁচকা এক টান মারল ওপরদিকে। মট্ করে একটা মৃদু আওয়াজের সাথে সোজা হয়ে গেল হাত, জোড়া লেগে গেছে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল সৈনিক।

'আর ভয় নেই,' ভাঙা জায়গার চারদিকে কয়েকটা কাঠের ফালি রেখে বুটের ফিতে দিয়ে শক্ত করে হাতটা বেঁধে দিল ও। 'ঠিক হয়ে যাবে।'

ছেলেটার তখন হুঁশ নেই। হয়তো আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সময় নষ্ট করল না রানা, ব্যস্ত হাতে তার টিউনিক আর রাইফেলটা নিয়ে সরে পড়ল জায়গা

ছেড়ে। একটু আঁটো হলো ড্রেসটা, কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামাল না। দরকার নেই। এখন কেউ একবারের বেশি ভুলেও তাকাবে না ওর দিকে। চেহারার রঙের ঘাটতি বা বাড়তি, সব চাপা পড়ে যাবে টিউনিকের কারণে। রাইফেলের ম্যাগাজিন চেক করতে গিয়ে হাসল মনে মনে—খালি। তাতেও কিছু আসবে-যাবে না। এটা দিয়ে কাউকে গুলি করার ইচ্ছে নেই ওর।

হোটেল ম্যানেজারের অফিস থেকে জোগাড় করা একটা ম্যাপ দেখে এগিয়ে চলেছে ও দিমিত্রিওসের নির্দেশ মত। শহরের প্রান্তে পৌঁছে কোস্ট রোডে উঠবে।

সিটি সেন্টারের কাছাকাছি বড় রাস্তায় উঠে আবার মানবজটে পড়ে গেল ও। সবাই উল্টোদিকে যাচ্ছে। এত মানুষ যে ঠেলে এগোনো দায়। বাধ্য হয়ে রাইফেলের বাঁট ব্যবহার শুরু করল রানা, মেরে-গুঁতিয়ে পথ করে এগোতে থাকল। প্লেস দে লা লিবারেশন নোইরে পৌঁছে এমন কড়া জটে আটকে গেল যে সামনে-পিছনে কোনদিকেই যাওয়ার পথ নেই। আতঙ্কে ঘাম ফুটল রানার কপালে, এখন যদি একটা শেল এসে পড়ে এর মধ্যে, কি ঘটবে ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিল।

উঁচু হয়ে সামনে তাকাল। স্কয়্যারের চারদিকেই আগুন জ্বলছে, ধোঁয়ায় সবদিক আচ্ছন্ন। মাঝখানের রোড আইল্যান্ডের ওপর সেরারিয়েরের যে ব্রোঞ্জ মূর্তিটা ছিল, সেটা নেই। ওটার কংক্রিটের স্ট্যান্ডটাও গায়েব। ফ্যাভেলের আর্টিলারির কাজ নিশ্চই, ভাবল ও।

হঠাৎ চারদিকে কয়েকটা হুইসেলের তীক্ষ্ণ শব্দে সচকিত হলো। উল্টোদিক থেকে চার-পাঁচটা গাড়ি এসে কড়া ব্রেক কষল পাকা চত্বরে, পরক্ষণে চড়া কণ্ঠের হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল। ঘটনা দেখার সুযোগ যখন হলো, তখন দেরি হয়ে গেছে। সামনেই একদল সৈন্য রাইফেল উঁচিয়ে জনতার দিকে তাক করে রেখেছে দেখে পিছিয়ে যাওয়ার শেষ চেষ্টা করল রানা, কিন্তু দু'পা যেতে না যেতে একটা দৃঢ় হাত মুঠো করে ধরল বাহু, টানতে টানতে সামনের খোলা চত্বরের দিকে নিয়ে চলল। কয়েক সেকেন্ড পর নিজেকে আরও কিছু ভীত-কম্পিত সৈনিকের মাঝে দেখতে পেল রানা। এরা সব সরকারী বাহিনীর পলাতক সদস্য।

সবাই অক্ষত। পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। মাথা নিচু করে কাঁপছে না জানি কি ঘটে ভেবে। দলটার সামনে কয়েকজন অফিসারকে দেখা গেল, জ্বলন্ত ঘৃণার চোখে নজর বোলাচ্ছে সবার ওপর। সেরেছে! ভাবল রানা, এই বিপদে পড়তে হবে কে জানত তখন? কাঁধ সরু করে সবার অলক্ষে একটু একটু করে পিছিয়ে গেল ও, যতটা সম্ভব পিছনদিকে গিয়ে দাঁড়াল।

অফিসারদের মধ্যে থেকে এক কর্নেল এগিয়ে এল, ধরা খাওয়া দলটার উদ্দেশে ভাষণ দিতে শুরু করল। লোকটার গলার স্বর এমন; রানার মনে হলো এর চাইতে কুকুরের একটানা ঘেউ-ঘেউ আওয়াজও বুঝি স্বর্গীয় সুরের মত শোনাবে। একটা কথাও বুঝল না বটে, তবে ধমক ধামকের অর্থ কি হতে পারে তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হলো না।

'ভীরু, কাপুরুষের দল!' রানার অনুমান এই বলেই শুরু করেছে কর্নেল। 'যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে মহা অন্যায় করেছ তোমরা। এর একমাত্র শাস্তি

ফায়ারিঙ স্কোয়াডে মৃত্যু। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সেরারিয়ের মহানুভব, তিনি তা চান না। তিনি চান তোমরা যে যার অন্যায় শুধরে নেবে যুদ্ধে ফিরে গিয়ে–সান ফের্নান্দেজ ও প্রেসিডেন্ট সেরারিয়েরের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জন দেবে। এই সুযোগ হেলায় হারালে পরিণতি কি হবে, তাও জেনে রাখো।'

ইঙ্গিতে বেছে বেছে ছয়জনকে ডেকে নিল সে। জনতার দিকে পিছন ফিরে দাঁড় করানো হলো দলটাকে। প্রায় একই মুহূর্তে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারের শব্দে আঁতকে উঠল সৈন্য-জনতা। আছড়ে পড়ল লোকগুলো। রক্তে ভেসে গেল চত্বর। রিভলভার হাতে এক ক্যাপ্টেন এগিয়ে গেল, একটু একটু নড়ছিল দুটো দেহ, নল কাছে নিয়ে প্রত্যেকের মাথায় একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে স্তব্ধ করে দিল তাদের। সন্তুষ্ট হয়ে অন্যদের দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন। চড়া, তীক্ষ্ণ গলায় নির্দেশ দিল।

কাঁপতে কাঁপতে সারি দিয়ে দাঁড়াল অন্যরা, মার্চ করে একটা সাইড স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল ক্যাপ্টেনকে অনুসরণ করে।

রাইফেল কাঁধে মাসুদ রানাও আছে তাদের মধ্যে।

সকাল ন'টায় সেলে ঢুকল দুই পুলিস। জ্যাকবসন ও কুপারকে বের করে অফিসে নিয়ে এল। ডেস্কের পিছনে বসে আছে সাউস ইন্সপেক্টর রসিউ। মানুষটা বয়স্ক, চেহারা পুরো গোল। মাথায় মস্ত টাক। চাউনি একদম শীতল। চেহারা কফির মত গাঢ়।

ঢুলুঢুলু চোখে নিজের দুই সেপাইকে দেখল সে। 'বোকার দল!' অভিব্যক্তিহীন গলায় বলল, 'বলেছি একজন একজন করে আনতে। ওকে নিয়ে যাও,' হাতের কলম দিয়ে জ্যাকবসনকে দেখাল।

সেলে ফিরে কটে বসে পড়ল সে, বাইরের কথা ভেবে অস্থির। গোলাগুলির শব্দ এখন একটু কম মনে হচ্ছে। এর মানে কি? ফ্যাভেল হেরে যায়নি তো? তাহলে কোন চান্স নেই জ্যাকবসনের। উল্টোটা হলে আছে। লড়াই শেষ হলে ফ্যাভেলের অফিসাররা শহরের সব জেলখানায় আসবে প্রথমে, কতজন রাজবন্দী আছে জানতে। সেটাই তার একমাত্র সুযোগ। অবশ্য মাসুদ রানা···নাহ্!

ও বোধহয় কাল রাতে সুবিধে করতে পারেনি। যদি সেরারিয়েরকে ব্যাপারটা বোঝাতে পারত রানা, তাহলে এতক্ষণ বন্দী থাকতে হত না ওদের। রাতেই ছাড়া পেয়ে যেত। কোথায় এখন রানা? কি করছে? ওকেও কি···?

এক ঘণ্টা পর আবার তাকে নিতে এল সেই দুই সেপাই। কুপার হয়তো এখনও অফিসারের সাথে কথা বলছে, ভাবল জ্যাকবসন। কিন্তু নেই সেখানে লোকটা। গেল কোথায়?

'আসুন, আসুন, ড্যানিয়েল জ্যাকবসন!' সাদর অভ্যর্থনা জানাল ওকে সাউস ইন্সপেক্টর। 'বসুন।'

গাঢ় চাঁদের ওপর সতর্ক নজর রেখে সামনের চেয়ারে বসল সে। 'ধন্যবাদ। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক কোথায়?'

'আছেন। চিন্তার কিছু নেই,' হাসল রসিউ। একটু বিরতি দিল, চিন্তিত দৃষ্টি সামনের কয়েকটা সাদা শীটের ওপর। একটা কলম খোলা পড়ে আছে তার

ওপর। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝামেলা শেষ করে ফেলতে চাই আমি, মিস্টার জ্যাকবসন। আশা করি সাহায্য করবেন আপনি।'

'কিসের ঝামেলা, কিসের সাহায্য?'

'এই আমার কিছু প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া আর কি!'

'কি প্রশ্ন?' বলল জ্যাকবসন। 'উত্তর জানা থাকলে নিশ্চই দেব।'

'আমার ধারণা জানেন আপনি,' ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল লোকটা। 'হেনরিকে শেষ কবে দেখেছেন?'

কপাল কুঁচকে উঠল ওর। 'হেনরি! সে কে?'

'অথবা এডওয়ার্ডকে?'

'কারা এ দু'জন? একজনকেও তো চিনি না!'

'চেনেন না, কেমন?' বাঁকা হাসি ফুটল ইন্সপেক্টরের মুখে। 'আপনার আমেরিকান সঙ্গী কিন্তু স্বীকার করে গেছেন সব কথা। বলেছেন আপনাদের দু'জনের সাথে ওদের খুব ভাল সম্পর্ক আছে।'

'কি আবোল-তাবোল বকছেন!' রেগে উঠল জ্যাকবসন। 'এঁর সঙ্গেই তো সবে কাল পরিচয় হলো আমার।'

'তাই নাকি?' চাউনি সরু হয়ে উঠল রসিউর। 'কিন্তু কাল যখন আপনাদের ধরা হয়, তখন তো এ কথা বলেননি! বলেছেন উনি আপনার বন্ধু, বলেননি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে...'

'পরিচয় হতে না হতে একজন অন্যজনের বন্ধু হয়ে গেলেন কি করে বলবেন দয়া করে?' একটু বিরতি। 'আমি জানতে পেরেছি ওই লোকের সাথে আপনার পরিচয় অনেকদিনের, তার মাধ্যমেই সিআইএ রিক্রুট করে আপনাকে। এবং আপনিই বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহকারী হেনরি আর এডওয়ার্ডের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা করে আসছেন গত কয়েক বছর থেকে, ঠিক?'

আহাম্মকের মত লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল জ্যাকবসন। অসহ্য রাগে তালু পর্যন্ত জ্বলছে। 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার,' কোনমতে বলল।

'তাহলে আপনি ব্রিটিশ স্পাই?'

'প্রমোশনের লোভে উন্মাদ হয়ে গেছেন আপনি, সাউস ইন্সপেক্টর। আমি বিজ্ঞানী—মিটিওরোলজিস্ট।'

'হ্যাঁ, জানি ওটা আপনার কাভার। এও জানি এদেশের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছে যে দুই অপশক্তি, আমেরিকা ও ব্রিটেন, আপনি তাদের লোক। এই জন্যেই ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আপনাকে ছাড়াতে।'

'মানে?'

'মানে কাল রাতে আপনাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছিল ব্রিটিশ কনসাল আর মাসুদ রানা নামে আপনার এক বন্ধু। চেয়েছিলাম ও দুটোকেও গারদে পুরে রাখি, কিন্তু ফুলারটনের মত কাউকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমার নেই। আর মাসুদ রানা, সেও দেখলাম ইন্টারপোলের হোমরা-চোমরা। তাই ছেড়ে দিতে হলো। তবে দুয়েকদিনের মধ্যেই ওদের ব্যবস্থা করা হবে। ঘাড় ধরে ব্যাটাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন আমাদের প্রেসিডেন্ট।'

'যদি দু'দিন পরও বেঁচে থাকে সে।' বানা এসেছিল জেনে খুশি হলো ও। অর্থাৎ প্রেসিডেন্টকে হারিকেনের কথা বিশ্বাস করাতে পারেনি ওরা। দেখা করতে পেরেছিল? নাকি সে সুযোগও পায়নি?

'হোয়াট!' ঝুঁকে এল রসিউ। 'কি বললেন?'

'দু'দিন পর আপনার প্রেসিডেন্ট বেঁচে থাকবে, তেমন কোন গ্যারান্টি নেই, সেই কথা বলছি,' শান্ত, সংযত গলায় বলল জ্যাকবসন। 'আপনারও নেই। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে ভয়াবহ হারিকেন...'

'ও, তাই বলুন!' স্বস্তি ফুটল লোকটার চেহারায়। 'কিন্তু ওসব বাজে কথা, আমরা জানি। ফালতু। সান ফের্নান্দেজে...'

'থামুন! মায়ের কাছে মামাবাড়ির গল্প করবেন না। আবহাওয়া সম্পর্কে কি বোঝেন আপনি? আপনার প্রেসিডেন্ট সেনাবাহিনী আর পুলিস দিয়ে সাধারণ মানুষকে এতবছর দাবিয়ে রাখতে পেরেছে, তাদের দাবি উড়িয়ে দিতে পেরেছে, কিন্তু যা আসছে তা ঠেকানোর ক্ষমতা তার নেই। আপনাদের খেয়ালমত চলে না হারিকেন। ভাল করে শুনুন, মিস্টার সাউস ইন্সপেক্টর, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভয়াবহ হারিকেন ম্যাবেল হিট্ করতে যাচ্ছে সান ফের্নান্দেজে। তার হাত থেকে কেউ বাঁচবেন না আপনারা। আপনি না, আপনার প্রেসিডেন্টও না।'

মরিয়া হয়ে উঠল জ্যাকবসন। 'আমার সঙ্গী ভদ্রলোক কে, জানেন আপনি? আমেরিকার সবচেয়ে নামকরা লেখক। ওদেশের খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যদি প্রাণে বেঁচে যান, এই অপরাধে সেরারিয়ের আপনার গায়ের চামড়া তুলে নেবে। কারণ এঁকে আটক করে আপনি তাকে ডবল বিপদে ফেলেছেন। একদিক থেকে ফ্যাভেল আসছে, এবার অন্যদিক থেকে আসবেন কমোডর হ্যানসেন। সেরারিয়েরের কাছে যখন জারভিস কুপার কোথায় আছে জানতে চাইবেন তিনি, তখন কি করবে সে? বাধ্য হবে তাকে খুঁজে বের করে জীবিত, অক্ষত অবস্থায় কমোডরের কাছে পৌঁছে দিতে। তা যদি সে না পারে, সিআইএ পিছন দরজা দিয়ে ঢুকে ছোরা মারবে তার পিঠে।'

চাউনির শীতলভাব উবে গেল লোকটার। 'কেন, আমি...'

'কারণ আপনি একটা আহাম্মক! আন্তর্জাতিক এক ফিগারকে আটক করে শুধু শুধু নিজের বিপদ, প্রেসিডেন্টের বিপদ বাড়িয়েছেন। সময়মত যদি তাকে কমোডরের হাতে তুলে দিতে না পারে সেরারিয়ের, বিদ্রোহী আর মার্কিন মেরিন, দুই বাহিনীর মধ্যে চিঁড়েচ্যাপ্টা হবে সে। কাজেই ভেবে দেখুন, কি করা উচিত এখন আপনার। এ দেশের রাজনীতিতে নাক গলাবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল মার্কিন সরকার, তাদের একজন বিশ্ববিখ্যাত লেখককে প্রমোশনের লোভে আটক করে আপনিই সে সুযোগ এনে দিয়েছেন। ওরা এবার ছাড়বে না সেরারিয়েরকে।'

নিজের মাথার পাশে দুটো টোকা দিল জ্যাকবসন। 'ঢুকল এখানে কিছু? এখন পিঠের চামড়া কি করে বাঁচাবেন ভেবে দেখুন। আমি তো কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।'

চুপ করে থাকল সাউস ইন্সপেক্টর। চেহারার গাঢ় রঙের মধ্যেও খানিকটা

ফ্যাকাসে ভাব–গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। কাছেই একের পর এক শেল ফাটছে ভয়াবহ শব্দে, থর-থর করে কেঁপে উঠছে পুরানো লক-আপ ভবন, মেঝেতে ঠুক ঠুক আওয়াজ তুলে জায়গা ছেড়ে সরে যাচ্ছে কাঠের কার্নিচার। তবে ভয়ের কিছু নেই, ভবনটা পাথরের তৈরি। দেয়াল যথেষ্ট পুরু।

গলিতে ঢোকার মুখে কিছু একটার সাথে ঠুকে গেল রানার পা। রাস্তায় কাঁপা ঠং-ঠং আওয়াজ তুলে বেশ কিছুদূর গড়িয়ে সরে গেল জিনিসটা। তাকাল ও–সেরারিয়েরের ব্রোঞ্জ মূর্তির মাথা। ওটার কপালে বড় এক ফুটো, শেলের কাজ বোধহয়। কাত হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্প্রাণ চোখজোড়া।

প্রচণ্ড গরমে দরদর করে ঘামছে ও। কি করে এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া যায়, সেই পথ খুঁজছে। রাইফেলটা ফেলে দিয়ে ওপরের টিউনিক ছিঁড়ে গা থেকে নামাতে পারলেই আবার সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যেতে পারে ও, কিন্তু সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। পলাতকদের বিশ্বাস নেই, তাই সারির দু'দিকেই সশস্ত্র সার্জেন্টদের কড়া পাহারার দেয়াল রয়েছে। পিছনে জীপে চড়ে ওদের অনুসরণ করছে সেই ক্যাপ্টেন, হাতে সাব-মেশিনগান।

ভয়ে ভয়ে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে রানা, লোকগুলোর চাউনি দেখে বোঝার চেষ্টা করছে ওর চালাকি ধরা পড়ে গেছে কি না, ঘামের সাথে চেহারার রঙ গড়িয়ে নামছে কি না। কিন্তু না, কারও চেহারায় সেরকম কোন লক্ষণ নেই। রঙটা ওয়াটারপ্রুফ ছিল বলে রক্ষা, নইলে এতক্ষণে বিপদ ঘটে যেত নিঃসন্দেহে।

সামনেই, কাছাকাছি কোথাও থেকে অনেকগুলো অস্ত্র গর্জন করছে। বেশিরভাগ হালকা, দুয়েকটা মেশিনগানও আছে। যতটা মনে হয়েছিল প্রথম চোটে, তার চেয়ে অনেক কাছে মনে হচ্ছে এখন। তার মানে শহরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে ফ্যাভেলের বাহিনী, এবং গুলি খরচ করছে দেদারসে। ওর একশো গজ সামনে একটা শেল বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো পথের ওপর। প্রায় থেমে পড়ল সৈন্যদের কলাম, সামনে এগোতে ভয় পাচ্ছে।

পাশ থেকে সার্জেন্টের অকথ্য গালাগালি আর অফিসারের গুলি করার হুমকিতে কাজ হলো, পা চালালু সবাই। একটু পর বাঁক নিয়ে আরেকটা গলিতে ঢুকে থেমে গেল ওরা। কয়েকটা আর্মি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে গলিতে। প্রায় খালি ওগুলো, ট্যাঙ্কে তেল ভরা হচ্ছে। পিছন থেকে অফিসার চড়া গলায় কিছু একটা বলল, জবাবে কলামের যাদের হাতে অস্ত্র আছে, লাইন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল তারা। দেখাদেখি রানাও। আলাদা এক সারিতে দাঁড়াল দলটা।

এক সার্জেন্ট এগিয়ে এসে প্রশ্ন করতে শুরু করল লোকগুলোকে, বোঝা গেল কার কাছে কি পরিমাণ গুলি আছে জানতে চাইছে। রানার পালা এলে মুখ খুলল না ও, দ্রুত শূন্য ব্রীচ দেখাল কেবল। দুটো ক্লিপ ওর হাতে গুঁজে দিয়ে সরে গেল লোকটা। অস্ত্র নামানো হলো সামনের এক ট্রাক থেকে, যাদের নেই, তাদেরকে দেয়া হলো। কিন্তু সবাইকে নয়, কয়েকজন বাদ রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত–টান পড়েছে।

একটা ক্লিপ রাইফেলে ভরে অন্যটা পকেটে ভরল রানা। ভাবছে। বোঝা যাচ্ছে ফ্যাভেলের আক্রমণে বিপাকে পড়ে গেছে সেরারিয়েরের সাপ্লাই কর্পস। ঠিকমত জোগান দিতে পারছে না অস্ত্র-গোলাবারুদ। লজিস্টিক বিঘ্ন। কিন্তু নিজের সমস্যার সমাধান হওয়ার পথ কি? চারদিকে দেখে নিয়ে মাথা দোলাল রানা। হতাশ। কোন পথ নেই। তবে আশা ছাড়ল না। যুদ্ধের সময় কখন কি সুযোগ—পরিবর্তন আসে, কে বলতে পারে?

আবার এগিয়ে চলার নির্দেশ এল। খানিকটা এগিয়ে ডানে ঘুরল কলাম। রানা বুঝল ফায়ারিঙ লাইনের মুখোমুখি হতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের। জায়গাটা বস্তি এলাকা, খুব সম্ভব সেইন্ট পিয়েরের সবচেয়ে নিচু আয়ের মানুষরা থাকে। সব টিনের ঘর। কেরোসিন তেলের ক্যান পিটিয়ে সোজা করে তাই দিয়ে বানানো চার দেয়াল, ছাতও একই জিনিসের। করোগেটেড আয়রনের ছাতও আছে দুয়েকটার। মানুষের ছায়া পর্যন্ত নেই বস্তিতে, হয় পালিয়ে গেছে, নয়তো বাড়িঘরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে।

বস্তি ছাড়িয়ে খানিকটা এগোতে থামার নির্দেশ এল। সামনে ঘর-বাড়ি নেই, নোংরা এক বড় মাঠ। আড়াআড়ি লম্বা সারিতে দাঁড় করানো হলো ওদের। বোঝা গেল এখান থেকে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করতে হবে। চিন্তা-ভাবনার সময় হলো না, প্রায় একই মুহূর্তে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার নির্দেশ দিল অফিসার। যন্ত্রপাতি নেই কিছু, কাজেই বেয়োনেট দিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে পড়ল সবাই।

শহরবাসীর ফেলে রেখে যাওয়া যাবতীয় নোংরা-আবর্জনা সরিয়ে ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করে নিজের জন্যে এক নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করল রানা। বুলেট সরকারী হোক বা বিদ্রোহীদের, বাগে পেলে বিদেশী বলে খাতির করবে না। গর্তে বসে চারদিকে তাকাল ও পালাবার পথের খোঁজে। ঠিক ওর পিছনেই নিজের গর্তে বসে আছে সেই সার্জেন্ট, যে ওকে গুলি দিয়েছিল। হাতের রাইফেল রানার সামান্য ডানে তাক্ করে রেখেছে। বান্দা বড় কঠিন চীজ।

তার পিছনে রয়েছে ক্যাপ্টেন। কয়েকজন সৈন্য আছে তার সাথে। সাব-মেশিনগান সই করে অপেক্ষায় আছে দলটা, কারও পালাবার উপায় নেই। ক্যাপ্টেনের সামান্য পিছনে বস্তির শেষ প্রান্ত, জীপ গাড়িটা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তেড়িবেড়ি দেখলে ভাগবে ওটা নিয়ে।

ঘুরে সামনে নজর দিল ও। মাঠটা বেশ লম্বা, প্রায় পৌনে এক মাইল। চার-সাড়ে চারশো গজ পাশে। ওমাথায় কিছু দালান-কোঠা আছে, মানুষজনের দেখা নেই ওগুলোতেও। সম্ভবত জায়গা ফাঁকা পেয়ে ওখানে জড়ো হয়েছে সরকারী বাহিনী, এখান থেকে ওদের সাহায্য করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হাল্কা অস্ত্রের ঠুস্-ঠাস্ এখনও চলছে সমানে। একটা প্রজেক্টাইল উড়ে এসে পড়ল ওর পঞ্চাশ গজ সামনে, ঝপ্ করে মাথা নামিয়ে নিল রানা, কানে তালা লাগানো শব্দে ফাটল ওটা, একরাশ আবর্জনা এসে পড়ল ওর মাথায়, পিঠে। গা ঝাড়া দিয়ে আবার মাথা তুলল।

এটা ফ্রন্ট লাইনের বিকল্প, ভাবল রানা। সামনের ওরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে বলে তাড়াতাড়ি একটা যেমন-তেমন বিকল্প লাইন খাড়া করা হয়েছে

এদের ধরে এনে। জায়গা হিসেবে এটা মন্দ হয়নি, তবে গুলি যা সামান্য কিছু আছে তা দিয়ে শত্রুকে আধঘণ্টাও ঠেকিয়ে রাখা যাবে কি না সন্দেহ। তারপরও সমস্যা আছে। যদি সরকারী সৈন্য আরও পিছু হটতে বাধ্য হয়, সামনের মাঠ ক্লিয়ার না হওয়া পর্যন্ত এদের ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে থাকতে হবে সেম সাইড হওয়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল স্রেফ বসেই আছে ওরা, কিছু করার নির্দেশ আসছে না। গরমে জড় পদার্থের মত বসে থাকতে থাকতে ঘুম এসে গেল রানার। মুখ তুলে আকাশ দেখল—মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই, ঝকঝকে নীল আকাশ। একটু বেশি ঝকঝকে যেন, তার মধ্যে আগুনের গোলার মত জ্বলছে সূর্য। গুমোট, বাতাস একেবারেই নেই। গুমোট গরম অনুভব করলেই শুধু বোঝা যায় হারিকেন হয়তো আসবে, নইলে আর কোন লক্ষণই নেই।

পালাবার ইচ্ছে নতুন করে জাগল মনে। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সরতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি ফ্যাভেলের সাথে দেখা করার সুযোগ তৈরি করে নিতে পারবে ও। অন্তত চেষ্টা করতে পারবে। এখানে আটকে থাকলে কোনটাই হবে না। কিন্তু যতবার পিছনে তাকায় রানা, চোখাচোখি হয়ে যায় সার্জেন্টের সাথে, নজরদারীতে ঢিল দিচ্ছে না ব্যাটা মুহূর্তের জন্যেও। পিছনের দলটাও অনড়।

কি ভেবে একটা সিগারেট সার্জেন্টকে ছুঁড়ে দিল রানা। চোখ কুঁচকে ওটা দেখল সে, তুলে নিয়ে নাকের সামনে ধরে শুঁকে দেখল। অবাক হলো লোকটা, তবে রানার উদ্দেশে মৃদু হাসিও দিল। ধরিয়ে চোখ বুজে টানতে লাগল। ফ্রেশ আমেরিকান তামাকের ঘ্রাণে ভরে উঠল অনেকটা জায়গা। রানাও হাসল, একটা নিজে ধরিয়ে সামনে তাকাল। আশা করল দু'জনের মধ্যে একটা অলিখিত বন্ধুত্বের চুক্তি বহাল হলো এই মুহূর্ত থেকে।

হঠাৎ করে ফ্রন্ট লাইনে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, গোলাগুলির আওয়াজ বেড়ে গেল বহুগুণ। চোখ কুঁচকে কি চলছে ওখানে দেখার চেষ্টা করল ও। এতক্ষণে মানুষের দেখা পাওয়া গেল, সামনের বাড়িঘরের আড়ালে ছোটাছুটি করছে। ঠিকই অনুমান করেছিল রানা, ওরা সরকারী। পালাচ্ছে। গলার রগ ফাটিয়ে চিৎকার করে নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন, সার্জেন্টের গলা শোনাল ভয়তাড়িত, হিস্টিরিয়া রোগীর মত। ফ্রন্ট লাইন ভেঙে পড়েছে বুঝতে পেরে ভয় পেয়েছে ব্যাটারা।

দেখতে দেখতে মাঠ ভরে গেল জলপাই রঙের সরকারী টিউনিকে, দিশেহারার মত দিগ্বিদিক পালাচ্ছে ওরা। রিট্রিট করার যে নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, তার বালাই নেই। এলোপাতাড়ি দৌড়ঝাঁপ করছে। রানার দু'দিকের প্রত্যেকে গুলি করতে লেগে পড়েছে। নির্দেশ পেয়েছে বলে নয়, বরং ওর মনে হচ্ছে ভয় তাড়াবার জন্যে। 'কাছে এসো না কিন্তু, আমার কাছে বন্দুক আছে,' অনেকটা সেরকম ভাব ব্যাটাদের।

এর মধ্যেও যারা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারল, পালাতে গিয়ে বোকার মত সোজা না দৌড়ে এঁকেবেঁকে ছুটল, তারা বেঁচে গেল। অন্যরা পিছনের মেশিনগানের সহজ টার্গেট হলো, পাখির মত ধুপধাপ আছড়ে পড়ল গুলি খেয়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যে মাঠ ভরে উঠল লাশে। মাত্র দশ গজ সামনে একজনকে আছড়ে

পড়তে দেখে চট্ করে গর্তে বসে পড়ল রানা। অবশ্য একটু পরই ফের মাথা তুলল কচ্ছপের মত।

অনবরত শেল পড়ছে এখন মাঠের সর্বত্র, ধুলো-মাটি আর আবর্জনা স্তম্ভের মত খাড়া লাফিয়ে উঠছে আকাশে। আরেক সৈন্যকে ছুটে আসতে দেখল রানা, তীব্র আতঙ্কে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে পড়ার জোগাড় হয়েছে তার, বড় হাঁ হয়ে আছে মুখ, ভেতরে চকচক করছে ধবধবে সাদা দাঁত। পা দুটো পিস্টনের মত ওঠা-নামা করছে, মাটি কাঁপছে তার প্রতি পদক্ষেপে। একেবারে সোজা ছুটছে বোকা লোকটা। তবু, আর কয়েক পা এগোলেই রানার গর্তের স্তূপ করা মাটির আড়ালে গা ঢাকা দিতে পারত।

কিন্তু হলো না। একেবারে শেষ মুহূর্তে মাথার হাতুড়ির ভয়ঙ্কর এক বাড়ি খেলো যেন লোকটা, হুমড়ি খেয়ে চার হাত-পা ছড়িয়ে ধড়াস করে আছড়ে পড়ল। স্থির হয়ে গেছে মুহূর্তে। ধুলো সরে যেতে মাত্র কয়েক হাত দূরে পড়ে থাকা তার ঘামে ভেজা মুখটা দেখল রানা চোখ বড় করে। চোখ পুরো খোলা তার, অবিশ্বাস ফুটে আছে চাউনিতে। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না মৃত্যু সত্যিই তাকে ছুঁয়েছে। নাকে মানুষটার ঘামের গন্ধ পেল রানা। বিশ্বাস ওর নিজেরও হতে চাইছে না।

কি অদ্ভুত ব্যাপার, এই ছিল, এখন নেই। তাজা রক্তের গন্ধে পেটের ভেতর পাক্ খেয়ে উঠল ওর। মাথার পিছনের বড় এক গর্ত দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছে লোকটার। লালের মধ্যে হলদে আভাস—মগজ।

অল্পক্ষণের মধ্যে পুরো দৃশ্যপট বদলে গেল। এখন আর একজন দু'জন নয়, দলে দলে ছুটে আসছে সরকারী সৈন্য, সবার চেহারায় আতঙ্কের মুখোশ। বিকল্প ডিফেন্স লাইনের প্রত্যেকের অবস্থাও এক, গর্তে থাকার এখনও জানে বেঁচে আছে বটে, তবে মনে মনে মরে গেছে। ক্যাপ্টেন আর সার্জেন্টের গুলি করার ভয়ে উঠতে পারছে না, নইলে বহু আগেই পগার পার হয়ে যেত।

রানা ভাবছে বিশৃঙ্খলা আরেকটু বাড়ুক, তাহলে সটকে পড়তে সুবিধে হবে।

পুরো আধঘণ্টা চলল পিছু হটা আর অনবরত গুলি, বিস্ফোরণ। রানা ভাবল এখনই শুরু হবে বিদ্রোহী বাহিনীর ধাওয়া, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। মর্টার ছোঁড়া কিছুক্ষণের জন্যে থেমে ফের শুরু হলো। এবার সরাসরি ওদের বিকল্প লাইন বরাবর। মাথা গুঁজে পড়ে থাকল ও, সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলল এক সময়। মনে হলো যেন অনন্ত কাল ধরে চলছে গোলাগুলি। পরে অবশ্য ঘড়ি দেখে বুঝল মাত্র পনেরো মিনিট। আবার আচমকা থেমে গেল সব।

এবার নিশ্চই ফ্যাভেল বাহিনীর মপিং-আপ অপারেশন শুরু হবে, ভাবল ও। মাথা তুলে ধোঁয়া আর ধুলোর পর্দার ওপাশটা দেখার চেষ্টা করল। নাহ্, তেমন লক্ষণ নেই। পিছনে তাকাল। ক্যাপ্টেনের জীপ চিৎ হয়ে জ্বলছে দাউ দাউ করে, পিছনের দুই হুইল গায়েব। গাড়ির মালিকের চিহ্ন নেই কোথাও, তবে জীপের পাশেই একটা রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখল। শুধুই দেহ, মাথা-হাত-পা কিছুই নেই। উড়ে গেছে শেলের ঘায়ে।

রানার পাশের গর্তের লোকটা মাথা জাগাল। ভয়ে আর ধুলোবালিতে চেহারা

হয়েছে অবর্ণনীয়। পিছনে কেউ নেই দেখে সাহস করে উঠে পড়ল সে, ক্রল করে পিছিয়ে যেতে শুরু করল। কয়েক গজ পিছিয়ে উঠেই দৌড় দিল। ঠিক তখনই এক ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট, কড়া গলায় ডাকে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে নির্দেশ দিল। কানেই গেল না লোকটার, ভূতের তাড়া খাওয়া দিশেহারার মত তার কয়েক হাতের মধ্যে দিয়ে ছুটে গেল। গুলি করতে এক সেকেন্ডও দেরি করল না সার্জেন্ট। বাকিটা দেখার ইচ্ছে হলো না রানার, মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সামনে নজর দিল। এখনও বিদ্রোহীদের অ্যাসল্টের খবর নেই। কি ঘটছে ভেবে পেল না ও। এত দেরি করছে কেন ব্যাটারা? ওর ভাবনা শেষ হতে পারল না, তার আগেই একেবারে কাছে কোথাও একযোগে গর্জে উঠল অনেকগুলো হাল্কা অস্ত্র। একটা মেশিনগানও। সার্জেন্টকে লাট্টুর মত পাক খেয়ে আছড়ে পড়তে দেখল রানা। ফের সেঁধিয়ে গেল গর্তে। টের পেল গুলি বন্ধ হতেই চারদিকে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে, গর্ত ছেড়ে উঠে পালাতে শুরু করেছে অন্যরা। কিন্তু রানা নড়ল না, ওর কেন যেন মনে হলো লোকগুলো সমস্যায় পড়তে যাচ্ছে।

হলোও তাই। সামান্য বিরতি দিয়ে ফের শুরু হলো গুলি, আহতদের চিৎকার আর গোঙানিতে ভরে উঠল পরিবেশ। তৈরি হয়ে নিল ও মানসিকভাবে, মাথার ওপর কারও পায়ের আওয়াজ পেলে মরার ভান করে পড়ে থাকবে। কিন্তু তার দরকার হলো না। এল না কেউ। অস্ত্রের হুঙ্কার থেমে গেল। কিন্তু তখনই মাথা তুলল না ও, অসীম ধৈর্যের সাথে পনেরো মিনিট পড়ে থাকল ঘাপ্টি মেরে।

নাক জাগাতেই মাঠের ওপাশে একদল সশস্ত্র লোককে দেখতে পেল রানা। এদিকে আসছে। পিছনে তাকিয়ে জ্যান্ত কাউকে দেখতে পেল না ও, নিশ্চিন্ত হয়ে গর্ত ছাড়ল। সামনে নজর রেখে পিছাতে শুরু করল। শেলিঙের ফলে জায়গায় জায়গায় উৎক্ষিপ্ত মাটির স্তূপ আর লাশের আড়াল থাকায় সুবিধেই হলো, নিরাপদে বস্তি পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে পারল। একটা ঘরের আড়ালে পৌঁছে উঠে পড়ল ও, তাকিয়ে দেখল মাঠের সিকি অংশ এর মধ্যে পেরিয়ে এসেছে দলটা।

এখন ওরা যা নড়তে দেখবে, তাই সই করে গুলি ছুঁড়বে, জানে রানা। কাজেই ব্যস্ত হয়ে উঠল গা ঢাকা দেয়ার জন্যে। একটার পর একটা ঘরের পাশ কাটিয়ে বস্তির মাঝখানের দিকে এগিয়ে চলল। এই ফাঁকে গায়ের টিউনিক খুলে ফেলল ও, শক্ত ড্রিল কাপড় দিয়ে জোরে জোরে ঘষে মুখের রঙ যতদূর সম্ভব তুলে ফেলার চেষ্টা করল। এখন ওদের চোখে পড়লেও গুলি খাওয়ার ভয় কিছুটা কম থাকবে।

তবু সাবধানের মার নেই ভেবে একটা ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিল রানা। খুলে গেল ওটা মৃদু ক্যাঁচ শব্দ তুলে। ঢুকে পড়ল। ছোট কবুতরের খোপের মত দুটো রুম, অন্ধকার। ভেতরে কেউ আছে কি না দেখে নিশ্চিন্ত হলো ও। নেই। মাছি ভন্ ভন্ করছে সারা ঘরে। প্রথম রুমের দেয়ালে দুটো ছবি টাঙানো—একটা আর্নল্ড শোয়ার্জেনিগারের টার্মিনেটর-টুর স্টিল ছবি, অন্যটা সেরারিয়েরের। পরেরটা একটানে খসিয়ে খাটের তলায় ছুঁড়ে দিল রানা।

অস্ত্র রেখে দ্বিতীয় রুমের এক কোণের মাকড়সার জালের মত ফাটাচেরা

ওয়াশ বেসিনের দিকে এগোল। ট্যাপ খুলে পানির ধারা দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে মুখ ধোয়ায় লেগে পড়ল। ঝাড়া পাঁচ মিনিট চেষ্টা করেও কালি পুরো ওঠানো গেল না, এখনও হালকা নিগ্রোই রয়ে গেছে ও। ওয়াটার প্রুফ রঙ এত সহজে চামড়ার মায়া ছাড়তে রাজি নয়। হতাশ হয়ে পড়তে যাচ্ছিল তুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েই গেল ভেবে। সান ফের্নান্দেজের অধিবাসীদের মধ্যে এই রঙের অনেকে আছে।

হঠাৎ অন্য একটা বুদ্ধি এল। শার্টের বোতাম সব খুলে ফেলতেই বাদামি বুক-পেট বেরিয়ে পড়ল ওর। হয়েছে এবার, আপনমনে হেসে উঠল রানা বেসিনের আয়নায় নিজের আজব গায়ের রঙ দেখে। শার্ট খুলে কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধল কুলি-কামিনের মত। আপাতত কিছু সময় গায়ের রঙ প্রদর্শন করতে হবে, পরে নিরাপদ বুঝে গায়ে চড়ানো যাবে ওটা। তৈরি হয়ে খাটের কিনারায় বসে থাকল ও।

আধ ঘণ্টাখানেক পর একটা গাড়ির আওয়াজ শুনে উঠে পড়ল। আওয়াজ শুনে মনে হলো এদিকেই আসছে। রাস্তার দিকের একটা জানালা খুলে উঁকি দিল ও। হ্যাঁ, তাই। আরও খুশির কথা যে ড্রাইভার ওরই বয়সী এবং এ-দেশী নয়। গাড়িটা ল্যান্ড রোভার, ভেতরে আর কেউ নেই।

সঙ্গে আনা নিজের কয়েকটা জাল আইডির ভেতর থেকে লন্ডন হেরাল্ড পত্রিকার কার্ডটা বের করে একছুটে বেরিয়ে এল রানা। 'হেই!' চেঁচিয়ে ডাকল ড্রাইভারকে। 'হ্যালো, *আরিটেজ!*'

ঘুরে তাকাল ড্রাইভার, পরমুহূর্তে জোর ঝাঁকি খেয়ে থেমে পড়ল ল্যান্ড রোভার। দ্রুত লোকটার জানালার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। আইডি হাতে ধরা।

'কে আপনি?' অবাক হয়ে ইংরেজিতে প্রশ্ন করল চালক।

ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ও লোকটার ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট শুনে। 'আমার নাম মাসুদ রানা। লন্ডন হেরাল্ডের ওঅর করেসপন্ডেন্ট।' কার্ডটা তুলে দিল তার হাতে।

ওটা দেখল চালক, তারপর অবিশ্বাসের চোখে রানার আপাদমস্তক নজর বোলাল। 'যুদ্ধ তো সবে গতকাল শুরু হলো, এরমধ্যে পৌঁছলেন কি করে? গায়ের এক রঙ, মুখের আরেক রঙ, ব্যাপারটা কি?'

'সে অনেক কথা, এখন বলার সময় নেই।'

পাশের সীট থেকে নিজের সাব-মেশিনগান তুলে নিল যুবক। 'উঠুন। ফ্যাভেলের ইন্টারভিউ নিতে চান তো? আসুন।'

আরে! ভাবল রানা, এ যে না চাইতেই ছাতিটা। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।' শার্ট গায়ে দিয়ে উঠে বসল প্যাসেঞ্জারস সীটে। 'ধন্যবাদ। ফ্যাভেলের বন্ধু নিশ্চই আপনি, ইয়ে...'

গিয়ার দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল যুবক। হেসে উঠল। 'তা বলতে পারেন। বন্ধুই। এডওয়ার্ড আমার নাম।'

'বাঁচলাম। আপনাকে পেয়ে অনেক সুবিধে হলো। কিন্তু আপনি এ সময় শহরে কেন? সরকারী বাহিনী...'

'এই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে ওরা। খাবড়াবার কিছু নেই।'

গলি-ঘুঁচি পেরিয়ে কোস্ট রোডে এসে পড়ল ল্যান্ড রোভার, তারপর উত্তরে ফুটল-মেট্রিটো ভ্যালির দিকে। সূর্য তখন ডুব দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

সাত

'উহ্, অসহ্য গরম!' বলে উঠল মিসেস জোনস। উইন্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে চোখমুখ কুঁচকে সামনে তাকিয়ে আছে। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের অন্তহীন স্রোতে আটকে পড়ে মেজাজ খারাপ।

সত্যিই অসহ্য গরম, স্বীকার করল ক্রিস্টিনা—মনে মনে অবশ্য। এমনিতেই মহিলার বকবক করার স্বভাব, তারওপর যদি কারও খোলামেলা সায় পেয়ে বসে, বিপদ ঘটে যাবে। মাথা ধরিয়ে ছাড়বে ভ্যাজর ভ্যাজর করে। ঘামে পিঠের সাথে লেপ্‌টে থাকা ব্লাউজ টেনে আলগা করার ব্যর্থ চেষ্টার ফাঁকে কাত হয়ে সামনে তাকাল ও।

'বুড়ো মরার আর জায়গা পাচ্ছিল না?' গজগজ করে উঠল মহিলা। 'এত জায়গা থাকতে আমাদের সামনেই মরল এসে?'

রাস্তা এবং তার দু'পাশের খানিকটা করে ফাঁকা জায়গার কোথাও পা রাখার জায়গা নেই। মালপত্র, মানুষ আর যানবাহনে বোঝাই। অর্ধেকটা বন্ধ হয়ে আছে দুনিয়ার মালপত্রে, বাকিটা দখল করে রেখেছে মানুষ আর বিভিন্ন বাহন। শহর ছেড়ে ভাগছে মানুষ। কোস্ট রোডে ওঠার এই একমাত্র রাস্তাটা চওড়ায় কম, তাই এই দশা। এরমধ্যে কিছুক্ষণ আগে ওদের গাড়ির নাকের সামনেই হঠাৎ এক ঠেলা চাকা ভেঙে বসে গেছে, বাঁধন ছিঁড়ে মালপত্র সব গড়াগড়ি খাচ্ছে পথে।'

চালক বেশ বয়স্ক, তখন থেকেই সাহায্যের আশায় ছোটাছুটি করছে বেচারী, একে-তাকে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফিরেও তাকাচ্ছে না কেউ। সবাই নিজ নিজ সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এদিকে ড্রাইভিং সীটে অসহায়ের মত বসে আছেন কনসাল ফ্লোরটন, গরমে-দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হওয়ার দশা। তাওয়ার মত তেতে আছে সীট, ভেতরটা যেন আভেন। এখনই ফোস্‌কা উঠে যাবে শরীরে, এমন অবস্থা। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা দিমিত্রিওস ম্যানোসের। মোটা মানুষ, স্রোতের মত ঘাম ঝরছে তার সারা গা বেয়ে। শেষ চেষ্টা হিসেবে আরও কয়েকবার হর্ন বাজালেন বৃদ্ধ কনসাল, তারপর হাল ছেড়ে দিলেন। অসম্ভব, আর একচুলও এগোবে না গাড়ি।

এদিকে বেলা প্রায় তিনটে। দুটোর দিকে ঝামেলা বিদেয় হওয়ামাত্র হোটেল ছেড়েছে ওরা, মাত্র পাঁচ মাইল এগোনো সম্ভব হয়েছে এই এক ঘণ্টায়। কোস্ট রোডে ওঠার মাইল দুয়েক আগে সেই যে ফেঁসেছে, ভালমতই ফেঁসেছে।

'এখন কি হবে?' চোটপাট দেখাতে যাচ্ছিল মহিলা, কিন্তু ম্যানোসকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাতে দেখে মনে মনে চুপসে গেল। মাথার পিছনে এখনও টনটন

করছে, মুখে স্বীকার না করলেও হোটেলের সিঁড়ির নিচে কে তাকে মেরেছে, সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি অন্তত আছে তার। হম্বিতম্বির মাত্রা একটু কমেছে তখন থেকে।

'কি হবে দেখতেই পাবেন,' শান্ত গলায় বলে সামনে তাকাল গ্রীক। চপচপে ভেজা রুমাল দিয়ে ঘাড়-মুখ মুছে হাত বের করে নিঙড়ে লোনা পানি ঝরিয়ে নিল ওটার। 'কি করবেন?' প্রশ্ন করল কনসালকে।

'বুঝতে পারছি না,' অসহায় ভঙ্গি করলেন তিনি। 'ভয় হচ্ছে এই গরমে এঞ্জিন সেদ্ধ না হয়ে যায়।' সামনের ঝক্কর মার্কা অসংখ্য কার, বাস, ট্রাক আর ঠেলাগাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। শেষেরগুলোর জ্বালায় ওরাও আটকে গেছে। গাড়ির হর্ন, বড়দের চিৎকার-চেঁচামেচি, দৌড়-ঝাঁপ আর বাচ্চাদের কান্নার মিলিত আওয়াজে মনে হয় নরক ভেঙে পড়েছে বুঝি সেইন্ট পিয়েরের ওপর।

'কোস্ট রোড আর কতদূর?' ক্রিস্টিনা প্রশ্ন করল।

'দু'মাইল,' এক আঙুলে কপালের ঘাম এক পাশ থেকে আরেক পাশে টেনে আনলেন কনসাল। ভেজা আঙুল ঝেড়ে ট্রাউজারে মুছলেন। 'কিন্তু যে পরিস্থিতি, তাতে সন্ধের আগে ওটায় ওঠা যাবে কি না সন্দেহ আছে আমার।'

'অ্যাঁ!' আঁতকে উঠল মিসেস জোনস। 'বলেন কি! ততক্ষণ বসে থাকতে হবে এই গরম টিন-ক্যানের মধ্যে?'

আমল দিল না কেউ। গ্রীক নিজের মনে বলল, 'সময়মত যুদ্ধ বেধে একদিক থেকে ভালই হয়েছে, মানুষ শহর ছাড়ছে।'

'তারপরও অর্ধেক জনসংখ্যা থেকেই যাবে,' কনসাল বললেন। 'বেচারী ক্যাভেলের জন্যে বড় আফসোস হচ্ছে। যুদ্ধে জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত সৈন্য-সামন্ত সহ বানের পানিতে ভেসে যেতে হবে।'

'প্রেসিডেন্টের ভাগ্যেও তাই ঘটবে,' মন্তব্য করল ক্রিস্টিনা।

'হ্যাঁ, তা ঠিক। জ্যাকবসনকে আমার ভাল লেগেছে, তার অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করি আমি, তবু আশা করছি হারিকেনের ব্যাপারে তার যেন ভুল হয়ে থাকে।'

'আমিও।'

গরমে অস্থির হয়ে উঠেছে প্রত্যেকে, আর এক মিনিটও গাড়িতে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। বাকি পথ হেঁটেই যাবেন কি না ভাবলেন একবার কনসাল, অবশ্য পরক্ষণে,ভাবনাটা বাতিল করে দিলেন। খাবার, পানি, কম্বল আছে সঙ্গে, এতকিছু টেনে নেয়া অসম্ভব। ওসব ফেলে রেখে যাওয়ারও উপায় নেই। কতদিন পাহাড়ে থাকতে হবে কে জানে!

'ভাবছি ব্যাক করে অন্য পথ ধরে গেলে কেমন হয়,' দিমিত্রিওস বলল। 'পুবদিকে? নেগ্রিটোর এক মাথা তো ওদিকেই। উত্তরে না গিয়ে যদি পুবে আশ্রয় নেয়া যায়, ক্ষতি কি?'

কপাল কুঁচকে ঘুরে তাকালেন কনসাল। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। 'মন্দ বলেননি, যাওয়া যায়। কিন্তু ওদিকে পাহাড়ের উচ্চতা বোধহয় একটু কম, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল লোকটা। 'সামান্য। আমার মনে হয় তাতে কিছু আসবে যাবে

না। মোটামুটি একশো ফুট উঁচুতে থাকতে বলেছেন আমাদের মিস্টার জ্যাক, সে উচ্চতা পাওয়া যাবে। বেশিই পাওয়া যাবে। তাছাড়া সামনে যে অবস্থা, এই পথে সন্ধের আগে জায়গামত পৌঁছতে পারব কিনা ঠিক কি? পুবদিকে গেলে বরং দিন থাকতে থাকতে উপযুক্ত জায়গা বাছাই করে আশ্রয় নেয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে।'

'ঠিক বলেছেন, সেই ভাল। গরম আর সহ্য হয় না।'

আধ ঘণ্টা ধরে একটু একটু গাড়ি পিছিয়ে আনলেন কনসাল, একটা সাইড রোডে ঢুকে হাঁপ ছাড়লেন। 'বাঁচা গেল।'

জায়গামত যখন পৌঁছল দলটা, তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সামনেই নেগ্রিটো পর্বতমালা। দক্ষিণে চকচক করছে সাগর। ঢেউ প্রায় নেই। নিচে দাঁড়িয়ে একটা রিজ দেখাল গ্রীক, কনসালের মনে হলো বেশি না হোক, একশো ফুটের কম অন্তত হবে না ওটা। তবে সমস্যা হলো রাস্তা নেই, গাড়ি নিয়ে ওঠা যাবে না। ঠিক হলো ওটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে যাওয়া হবে।

রিজের গোড়ায় কয়েকটা পরিত্যক্ত ঘরের পিছনের একটা জংলা জায়গা পছন্দ হতে গাড়ি পার্ক করলেন কনসাল। ওপরে চড়ার আগে গরমে গন্ধ হয়ে ওঠা স্যান্ডউইচ, সেদ্ধ পানি আর কফি দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিল সবাই। এবার ওপরে চড়তে হবে, কিন্তু মিসেস জোনস বেঁকে বসল বোঝা টানতে হবে শুনে।

'না না, ওসব আমি পারব না। আমার হার্টের সমস্যা আছে।'

'কয়েকটা কম্বল টানলে কিছু হবে না আপনার হার্টের,' ক্রিস্টিনা বলল শান্ত গলায়, যদিও চাউনির বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না। 'না হলে আপনাকে আপনার জিনিসপত্রসহ ফেলে রেখে যাব আমরা, হারিকেন এলে একবারে সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে হার্টের।'

'হয়েছে, বাছা! আর ভয় দেখাতে হবে না,' গজ গজ করে উঠল মহিলা। 'বুঝতে পারছি, এই মদ্দা মার্কা মেজাজের জন্যেই এখনও বর জোটেনি তোমার। কই, কি নিতে হবে, দাও।'

কয়েকটা কম্বলের এক বান্ডিল ছুঁড়ে দিল ক্রিস্টিনা, ওটা ধরতে গিয়ে হাতব্যাগ পড়ে গেল তার, বেশ শব্দ করে মাটিতে পড়ল ওটা। মনে হলো ভারী কিছু আছে ওর মধ্যে।

চোখ কুঁচকে ব্যাগটা দেখল ক্রিস্টিনা। 'কি আছে ব্যাগে?'

'আমার জুয়েলারি,' আরেকদিকে তাকিয়ে জবাব দিল মহিলা।

জিনিসপত্র সব নিয়ে দুই দফায় রিজের চূড়ায় উঠতে জান বেরিয়ে যাওয়ার দশা হলো সবার, মিসেস জোনস বাদে অবশ্য। কনসাল বৃদ্ধ, দিমিত্রিওস মোটা, তার ওপর একজনও হেঁটে রিজে চড়া বা বোঝা টানা, কোনটাতেই অভ্যস্ত নয়। কাজেই কনসালের কষ্ট যাতে কম হয়, সেদিকে নজর রাখতে হলো ক্রিস্টিনা ও দিমিত্রিওসকে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট গ্রীকেরই হলো। মিসেস জোনস এক বান্ডিল কম্বল তুলেই খালাস। হাতব্যাগ বুকে চেপে ধরে বসে থাকল, নড়লই না আর।

জিরিয়ে নেয়ার জন্যে কিছু সময় বসল ওরা। চারদিক দেখে নিল। রিজের অন্য পাশে, পশ্চিম দিকে, গাঢ় সবুজ উপত্যকা, ঢালু হয়ে নেমে গেছে। পুরোটা জায়গা জুড়ে বিশাল এক কলাবাগান। একেকটা সারি এক মাইলের বেশি দীর্ঘ।

বাগানের মাঝে এখানে-ওখানে ছোট ছোট ঘর, পাহারাদার থাকে ওগুলোয়। পাকা রাস্তাও আছে ভেতরে—সার্ভিস রোড।

কনসাল খুশি হয়ে উঠলেন। 'যাক্, ছায়ার অভাব হবে না। তাছাড়া বাগানের মাটি নরম, গর্ত খুঁড়তে সুবিধে হবে আমাদের।'

'কলা খাওয়াও যাবে মন ভরে,' বলল মিসেস জোনস। 'কলা আমার খুব প্রিয়।'

'এখনই খাওয়ার মত কলা এর মধ্যে নেই,' মাথা দোলালেন ফুলারটন। 'সব কাঁচা। খেলে পেটে ব্যথা হবে।' দিমিত্রিওস ও ক্রিস্টিনার উদ্দেশে বললেন, 'হারিকেন সম্পর্কে অল্প অল্প জানা আছে আমার। যদি সে দক্ষিণ থেকে আসে, তাহলে বাতাস শুরু হবে পুবদিক থেকে। অর্থাৎ আমাদের গর্ত খুঁড়তে হবে উল্টোদিকে মুখ করে। পরের ঝাপ্টায় অবশ্য পশ্চিম থেকে আসবে বাতাস।'

'তাহলে ওখানে শুরু করে দেয়া যেতে পারে,' হাত তুলে একটা জায়গা দেখাল গ্রীক। 'কি বলেন?'

'হ্যাঁ।' চিন্তিত চেহারায় বাগানের গোড়ার মাটি দেখলেন বৃদ্ধ। গাছের পাতা দেখলেন। 'খুব বাজে কাল্টিভেশন। একদম যত্ন নেয়া হয় না বাগানের। আর কিছুদিন এরকম অবহেলা করা হলে পানামা ডিজিজে মরে যাবে সব গাছ।'

একটু পর বেলচা নিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে পড়লেন কনসাল ও গ্রীক। পাঁচটা গর্ত করা হলো, একটা বেশি করা হলো মালপত্র রাখার জন্যে। ড্রেনের ওপর থেকে তলা পর্যন্ত লম্বালম্বি ড্রেন তৈরি করা হলো যাতে ভেতরে পানি জমতে না পারে। একটা গর্ত খোঁড়ার পর ফুলারটনকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে ক্রিস্টিনা নিজে লেগে পড়ল। অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে বৃদ্ধের। কাজে সাহায্য করা দূরে থাক, মিসেস জোনস ওদের ধারেও ঘেঁষল না। কলাগাছের ছায়ায় বসে থাকল সারাক্ষণ। সূর্য ঢলে পড়েছে, অথচ গরম কমছে তো না-ই, বরং মিনিটে মিনিটে বেড়ে চলেছে। বেলচা চালাবার ফাঁকে সামুদ্রিক বোলতার কথা ভাবল ক্রিস্টিনা, মৃত্যুর আগে নিজের কবর খুঁড়ে তার মধ্যে বসে মরে ওগুলো। ওরাও কি···?

কাজ শেষ হতে প্রায় সন্ধে হয়ে এল। বড় কিছু কলাপাতা কেটে সবগুলো গর্তের মেঝেতে বিছিয়ে দিলেন কনসাল, কিছু রাখলেন ওপরে, ক্যামোফ্লেজড ছাউনির জন্যে। এই সময় ক্রিস্টিনার খেয়াল হলো, গোলাগুলির আওয়াজ বেশ জোরাল মনে হচ্ছে। আগের চেয়ে অনেক কাছে। সন্দেহের কথা জানাতে দিমিত্রিওস কান পাতল। 'হ্যাঁ, তাই তো!' সন্দেহের চোখে এদিক ওদিক তাকাল। 'কিন্তু···তা হয় কি করে?'

'বাতাসের ট্রিক্,' মন্তব্য করলেন কনসাল।

বোকার মত হাসল ওরা দু'জন, কখন যে একটু একটু বাতাস শুরু হয়েছে, খেয়ালই করেনি কেউ। রাত নামল। সময় গড়াতে থাকল। এক সময় যে যার গর্তে ঢুকে পড়ল সবাই, ঘুমিয়েও পড়ল। কিন্তু ক্রিস্টিনার চোখে ঘুম নেই, ফ্যাকাসে আকাশের দিকে তাকিয়ে মাসুদ রানার কথা ভাবছে।

কোথায় ও? ফ্যাভেলের সাথে দেখা করতে পেরেছে, নাকি জ্যাকের মত কোন বিপদে পড়েছে? এখন তা জানার উপায় নেই। যেদিকে যাওয়ার কথা ছিল,

সেদিকে না গিয়ে সম্পূর্ণ উল্টোদিকে চলে এসেছে ওরা। রানা যদি নিরাপদ থাকে, ওদের খুঁজতে যায় সেখানে, স্বভাবতই পাবে না। কি করবে তখন ও? নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় পড়বে। হয়তো নিজের বিপদের কথা ভুলে ওদের খুঁজতে লেগে যাবে। মানুষটা ওই পদেরই, জানে সে। মনটা অতীতে হারিয়ে গেল ক্রিস্টিনার।

নিউ ইয়র্কের একদল ভয়ঙ্কর স্প্যানিশ গুণ্ডার মাদক চোরাচালানীর খবর ছেপে ভীষণ বিপদে পড়েছিল ও চার বছর আগে। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কিছু কর্মচারীর যোগসাজশে ইওরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে নানান মাদক আমদানি করত ওরা। তথ্য প্রমাণ হাতে পেয়ে খবর ছেপে দিল ক্রিস্টিনা, কড়া অ্যাকশন নিল পুলিস। হাতেনাতে ধরা পড়ল এয়ারওয়েজের দুই কর্মচারী, চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেল, এদিকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল স্প্যানিশ গ্যাঙ।

সহজে মেনে নিল না ওরা ব্যাপারটা, ক্রিস্টিনার পিছু নিল। একদিন ধরে ফেলল ওকে ম্যানহাটনে। প্রত্যেকে সশস্ত্র ছিল, হয়তো মেরেই ফেলত, পারেনি মাসুদ রানার জন্যে। গুণ্ডাগুলোর হাতে পিস্তল-ছোরা দেখে মানুষজন যখন ভয়ে পালাচ্ছে, ও তখন এগিয়ে এসেছিল ক্রিস্টিনার সাহায্যে, একা। রানার গুলি খেয়ে আহত হয়ে ধরা পড়ল দুই স্প্যানিশ, অন্যরা পালিয়ে গেল। সেই থেকে বন্ধুত্ব ওদের।

ও জানে কতবড় দুর্দান্ত সাহসী রানা, কত বড় ওর অন্তর। যে কারও জন্যে যখন-তখন মারাত্মক ঝুঁকি নিতে পারে ও। তাই তো কাল অতরাতে আবার বেরিয়েছিল জ্যাককে ছাড়িয়ে আনতে। পারেনি বলে আবার বেরিয়েছে আজ বিপদের পরোয়া না করে। সহজে হার মানার দলে পড়ে না রানা, এই জন্যেই জিতে যায় সব কিছুতে। পরাজয় এ ধরনের একরোখা মানুষের কাছে সহজে ভিড়তে পারে না।

কিন্তু এবার কি পারবে? একে বিদেশ-বিভূঁই, সবকিছু অচেনা-অজানা, তারওপর এই পরিস্থিতি, কি করতে পারবে ও একা? ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, চোখ মেলতেই আকাশে চাঁদ দেখতে পেল ক্রিস্টিনা। গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। চারদিকে অশুভ নীরবতা। তাড়াতাড়ি গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও, কনসাল ও দিমিত্রিওসকে ডেকে তুলল। ব্যাপারটা নিয়ে যখন নিচু গলায় কথা বলছে ওরা, নিচের দিক অনেক মানুষের চলার, কথা বলার আওয়াজ এল।

ঘাবড়ে গেল সবাই। গ্রীক্ ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'কারা ওরা?' ভয়ে ঘেমে উঠল সে দেখতে দেখতে।

কলাবাগানের সার্ভিস রোডে, অনেক নিচে, কয়েকটা ট্রাকের আওয়াজ উঠল। এদিকেই আসছে। অনেক দেরিতে টের পাওয়া গেল ওরা কারা। সেরারিয়েরের সেনাবাহিনী! যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালিয়ে এসে গা ঢাকা দিয়েছে এখানে। কাল আবার লড়াইয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

যে যার জায়গায় জমে বসে থাকল সবাই, এখন সামান্য নড়াচড়াও চোখে পড়ে যেতে পারে ওদের। যদি তেমন কিছু ঘটে, পরিণতি কি হবে ভাবতেও সাহস হলো না কারও। আজই সকালে মাসুদ রানা একটা সম্ভাবনার কথা বলেছিল হোটেল ছাড়ার আগে, সে কথা ভেবে গায়ে কাঁটা দিল ক্রিস্টিনার।

ক্যাপ সারাতের সর্বোচ্চ পয়েন্ট একটা টিলা, সী-লেভেল থেকে পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু। ওটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মার্কিন নৌ ঘাঁটির চারশো ফুট দীর্ঘ ল্যাটিস রেডিও মাস্ট। অনেকগুলো রাডার অ্যান্টেনা আছে ওটার মাথায়।

তার একটার কাজ ওয়েভ-গাইড ধরে তাকে নিখুঁতভাবে ইলেক্ট্রনিক সিগন্যালে পরিণত করা। এসব সিগন্যাল বহু মিলিয়নবার অ্যামপ্লিফাইড হয়ে বেজের এক আন্ডারগ্রাউন্ড রুমে সেট করা রেডারের ক্যাথোড-রে পর্দায় গাঢ় সবুজ আভা হয়ে ফুটে ওঠে।

এই মুহূর্তে সেই পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে পেটি অফিসার (থার্ডক্লাস) গ্লেন লংম্যান। সবুজ আভায় পিত্তের রঙ পেয়েছে তার চেহারা। খুব ক্লান্ত সে, পরিশ্রান্ত। দীর্ঘসময় ধরে এই এক খুদে পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড়-মাথা-চোখ সব ধরে গেছে। ভীষণ একঘেয়ে লাগছে। দিন কেটেছে তার ব্যাটল স্টেশনে, তারপর সামান্য একটু ঘুম দিয়েই রেডার রুমে। বিশ্রাম আর ঘুমের অভাবে চোখ জ্বালা করছে লংম্যানের।

দিনটা বেশ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কেটেছে আজ। সেইন্ট পিয়েরের দিক থেকে ভেসে আসা বিরতিহীন গুলির আওয়াজ শুনে ভালই লাগছিল। শহরের আকাশে কালো ধোঁয়া দেখে আরও বেড়ে গিয়েছিল উত্তেজনা, কিন্তু যেই রাত নামল, অমনি সব উৎসাহ-উদ্দীপনা গায়েব হয়ে গেল লংম্যানের। এখন আর মোটেই ভাল লাগছে না। টানা কয়েক ঘণ্টার ঘুম ছাড়া ভাবতে পারছে না কিছু। লম্বা হাই তুলে ঘড়ি দেখল পেটি অফিসার- ভোর পাঁচটা। আর মাত্র এক ঘণ্টা, তারপর ছুটি।

মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল সে, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে খচখচ করে উঠল। মনে হলো যেন বালুকণা ঢুকে গেছে ভেতরে। পাতা টানটান করে মেলে মুখ বিকৃত করে চোখের মণি বার কয়েক ওপর-নিচে, ডানে-বাঁয়ে ঘোরাল লংম্যান, পলক ফেলল পিট্‌পিট্ করে। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। স্ক্রীনে নজর দিল সে, গোল পর্দায় অনবরত ঘুরতে থাকা লম্বা ট্রেসিং লাইনের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওটার সাথে চোখও ঘুরছে তার। তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল, আচমকা এক ঝাঁকি খেয়ে সোজা হলো সে।

পর্দায় পিনের মাথা সাইজের খুদে একটা সবুজ ঘূর্ণি দেখতে পেয়েছে পলকের জন্যে- যেন আকাশ থেকে পড়েছে ওটা, পর্দার এক কোণে দেখা দিয়েই হুট করে মিলিয়ে গেছে। চোখ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে থাকল লংম্যান, ট্রেসিং লাইনে ঘুরে এসে আবার ওই জায়গায় পৌঁছার অপেক্ষায় আছে। যদি তার ভুল না হয়ে থাকে, লাইন জায়গামত পৌঁছলে আবার দেখা যাবে ঘূর্ণিটা।

হ্যাঁ, আছে। দেখা যায় কি যায় না, পিচ্চি এক ইলেক্ট্রনিক ফুসকুড়ির মত ভেসে উঠতে না উঠতেই ফের গায়েব হয়ে গেল। ওটার দিক নির্দেশনা নিল লংম্যান, ১৭৪ ডিগ্রী। ভয়ের কিছু নেই, অনেক দূরে আছে। দক্ষিণে। স্ক্রীনের একেবারে এক প্রান্তে। ওদিক থেকে বিপদ আসার কোন সম্ভাবনা নেই এ মুহূর্তে। তেমন কিছু যদি আসেই, আসবে সেইন্ট পিয়েরের দিক থেকে–ভাঁড়

সেরারিয়েরের সো-কলড্ বিমান বাহিনীর গোটা তিনেক ডাকোটা। তাও এ মুহূর্তে সেরকম কিছু ঘটার চান্স নেই। দিনের বেলা কিছু সময় উড়েছিল ওগুলো, কয়েক চক্কর দিয়ে নেমে পড়েছে আধ ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু তাহলে কি ওটা?

আবার পর্দায় তাকাল গ্লেন লংম্যান, দক্ষিণে কেমন একটু অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে মনে হচ্ছে। একজন অভিজ্ঞ রেডার অফিসার সে, অল্পক্ষণেই বুঝে নিল কি হতে পারে এর অর্থ—ঘূর্ণিঝড়। দিগন্তরেখা যেখানে বাঁক খেয়ে নেমে গেছে, সেখানে কোথাও রয়েছে ওটা, রেডারের চোখের আড়ালে। পর্দার সোজা রেডার বীম কেবল ঝড়ের ঝুঁটি সনাক্ত করতে পেরেছে, দেহটা নয়।

খানিক ইতস্তত করে টেলিফোনের রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল লংম্যান। অবশ্য মনস্থির করে একটু পর যখন ওটা তুলল, তখন সামান্যতম দ্বিধাও থাকল না ভেতরে। কারণ তার ওপর কড়া নির্দেশ আছে, অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই ডিউটি অফিসারকে খবর দিতে হবে। তক্ষুণি।

সুইচ বোর্ডের নাম্বার ঘোরাল সে, ও প্রান্তের সাড়া পেয়ে বলল, 'ডিউটি অফিসার লেফটেন্যান্ট ক্রেগের কানেকশন দাও।' মনে মনে সন্তুষ্টি বোধ করল ব্যাটার আরামের ঘুম বরবাদ হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে।

পরদিন ঠিক সকাল আটটায় অফিসে ঢুকল হুইটনি স্মিথ। রাতের ওয়েদার রিপোর্ট পরিচ্ছন্নভাবে টাইপ করে সাজিয়ে রাখা আছে তার ব্লটিঙ-প্যাডের ওপর। ধীরেসুস্থে তুলে নিল সে ওগুলো। অন্যমনস্ক ছিল বলে রিপোর্টের মর্ম উদ্ধার করতে একটু সময় লাগল। যখন করল, আচমকা হার্পুনের মত বুকের মধ্যে গেঁথে গেল তথ্যটা। এক মুহূর্তও দেরি না করে হামলে পড়ল সে টেলিফোনের ওপর, কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'রেডার সার্ভেইল্যান্স দাও, ডিউটি অফিসার! হারি আপ্!'

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো রিপোর্টে নজর বুলিয়ে খরচ করল হুইটনি স্মিথ, হাত কাঁপছে একটু একটু। রিপোর্ট শীট কাঁপছে। অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না। ক্লিক্ করে উঠল মাইক্রোফোন। 'লেফটেন্যান্ট ক্রেগ!...হোয়াট! ছুটিতে?...তুমি কে?...ও, বিলিংস! দক্ষিণের যে ব্যাড ওয়েদার পিক্ করেছে রেডার, ব্যাপারটা আরেকবার চেক্ করো তো!'

ডেস্কে অস্থির চিত্তে তবলা বাজাবার ফাঁকে বিলিংসের মৌখিক রিপোর্ট শুনল ওয়েদার চীফ, তারপর দড়াম করে আছড়ে রাখল রিসিভার। কপালে চিকন ঘাম দেখা দিল সেকেন্ডের মধ্যে। ঠিকই বলেছিল জ্যাক! নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে সরে এসেছে ম্যাবেল, সান ফের্নান্দেজের দিকে আসছে! কিন্তু তা কি করে সম্ভব? শীটগুলো গুছিয়ে উঠে পড়ল স্মিথ, হাত-পা সব কাঁপছে। এখনও ভাবছে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি করে সম্ভব হলো? এক নেটিভের অবৈজ্ঞানিক অনুভূতি সত্যি হলো, আর বিজ্ঞান মুখ থুবড়ে পড়ল, এ কি আশ্চর্য কথা! এ অযৌক্তিক! কেন হারামজাদা ম্যাবেল এমন অস্বাভাবিক, অচিন্তনীয় আচরণ করবে? এখন এ খবর কোন মুখে দেব আমি কমোডরকে?

শীটগুলো ফোল্ডারে ভরে রাডার রুমের দিকে চলল সে, হেঁটে নয়, দৌড়ে। স্ক্রীনে এক পলক চোখ বুলিয়েই চেহারা কালো হয়ে গেল, ঝট্ করে বিলিংসের

দিকে ফিরল সে। আঙুল তুলে পর্দা দেখাল। 'এ খবর আরও আগে কেন জানানো হয়নি আমাকে?'

তার চেহারা দেখে মনে মনে কুঁকড়ে গেল বিলিংস। 'কিন্তু, স্যার, লেফটেন্যান্ট ক্রেগ তো আপনাকে...'

'সে তো তিন ঘণ্টা আগের কথা, উজবুক!' খেঁকিয়ে উঠল স্মিথ। 'তারপর থেকে...' প্রচণ্ড উত্তেজনায় অস্থির বোধ করল। রেডার স্ক্রীনের তলার দিকে পুরু হয়ে জমে ওঠা গাঢ় সবুজ আঁকাবাঁকা দাগগুলো ইঙ্গিত করল। ঠক্ ঠক্ করে টোকা দিল ওখানটায়। 'এই যে এগুলো, এগুলো কি, জানো?'

'হ্যাঁ, স্যার। ওয়েদার সামান্য খারাপ...'

'সামান্য খারাপ!' হুঙ্কার ছেড়ে উঠল সে। 'এই শিখেছ এতদিনে! সরে যাও আমার পথ থেকে, গাধা কোথাকার!' যুবককে মৃদু ধাক্কা দিয়ে নিজেই সে সরে গেল, বের হয়ে এসে করিডরে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। শক্তি হারিয়ে ফেলতে আরম্ভ করেছে পা দুটো, বসে পড়তে ইচ্ছে করছে। ঘন ঘন চেটে শুকনো ঠোঁট ভেজাবার চেষ্টা করছে সে। এক্ষুণি খবরটা জানাতে হবে নেভাল চীফকে, এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। কিন্তু কোন মুখ নিয়ে তাঁর সামনে যাবে সে?

একটু দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর অফিসে যাওয়ার মত সাহস সঞ্চয় করে নিল হুইটনি স্মিথ, তারপর যা থাকে কপালে ভেবে এগোল। কিন্তু ফ্রন্ট অফিসে বাধা দেয়া হলো তাকে, বলা হলো, কমোডর এখন ভীষণ ব্যস্ত। আধ ঘণ্টা দেরি করতে হবে। মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল। চোখ পাকিয়ে ডেস্ক অফিসারের দিকে তাকাল সে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'যদি আমি দুই মিনিটের মধ্যে কমোডরের সাথে দেখা করতে না পারি, বিশ বছর জেটিতে অ্যাঙ্কর কেবল বইতে হবে তোমাকে।'

এরপর আর দেরি করতে হলো না, দুই মিনিট শেষ হওয়ার আগেই কমোডরের রুমে ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেল। নিজের চেয়ারে আগের দিনের মত একই ভঙ্গিতে বসে আছেন কমোডর হ্যানসেন, দরজার মৃদু আওয়াজে চোখ তুলে স্মিথকে দেখলেন।

'ওয়েল, কি এমন জরুরী প্রয়োজন পড়ল, কমান্ডার?' বললেন তিনি।

'স্যার, ব্যাপারটা ম্যাবেল নিয়ে,' চোখকান বুজে কোনমতে বলে ফেলল সে। 'ওটা একটু...'

একটা পেশীও নড়ল না কমোডরের, এমন কি চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না। 'কি হয়েছে, ম্যাবেল কি?'

'স্যার...' শুরু করেও আবার থেমে গেল সে।

'বলুন!' উৎসাহ জোগালেন যেন নেভাল চীফ, তবে এবার কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। উৎকণ্ঠা গ্রাস করেছে তাঁকে।

'স্যার, ম্যাবেল দেখা যাচ্ছে গতিপথ থেকে সামান্য সরে এসেছে।' ঘেমে গোসল করে উঠল লোকটা।

'*দেখা যাচ্ছে?*' ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। 'এসেছে, কি আসেনি?'

'হ্যাঁ, স্যার! এসেছে।'

'তারপর?'

কমোডরের কঠিন চোখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল হুইটনি স্মিথ। ঠোঁট চাটল। ধড়ফড় করছে বুকের মধ্যে। 'ম্যা-ম্যাবেল সরে এসেছে গতিপথ ছেড়ে, সোজা এদিকেই আসছে, স্যার!' একটু থামল তাঁর মেজাজ বোঝার জন্যে। 'এরকম কথা ছিল না, স্যার! এ অবিশ্বাস্য। সমস্ত থিওরির বাইরে। পশ্চিমে সরে কিউবার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার কথা ছিল ওটার, অথচ শেষ মুহূর্তে কেন ঘুরে গেল, কিছুতেই সেটা মাথায় আসছে না আমার, স্যার! মিটিওরোলজিক্যাল সায়েন্স...'

'বক্‌বক বন্ধ করুন, স্মিথ!' এই প্রথম নড়ে বসলেন কমোডর। 'কত ঘণ্টা সময় আছে আমাদের হাতে?'

ফোল্ডারটা চীফের টেবিলে রেখে কাঁপা হাতে খুলল সে। দ্রুত নজর বোলাল রিপোর্ট শীটে। 'একশো সত্তর মাইল দূরে আছে ওটা, স্যার। ঘণ্টায় এগারো মাইল গতিতে এগিয়ে আসছে, তার মানে পনেরো ঘণ্টা সময় আছে আমাদের হাতে। বড়জোর ষোলো ঘণ্টা। এর মধ্যে...'

সুইভেল চেয়ার নিঃশব্দে ঘুরে গেল কমোডরের, পাশের এক ফাইলিং র‍্যাকের ওপর সার দিয়ে রাখা কয়েকটা টেলিফোনের একটার দিকে হাত বাড়ালেন। 'একজিকিউটিভ অফিসারকে দাও...কমান্ডার হ্যারি! প্ল্যান "কে" অনুযায়ী কাজ শুরু করুন, রাইট নাউ!' ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'আটটা একত্রিশ বাজে। হ্যাঁ, এখনই। অফ কোর্স, ইমিডিয়েট ইভ্যাকুয়েশন।'

ফোন রেখে ওয়েদার-ইন-চার্জকে দেখলেন তিনি। 'এ নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই, কমান্ডার। কাল বেজ ভ্যাকেট না করার সিদ্ধান্ত আমিই নিয়েছিলাম, আপনি নন্। তাছাড়া জ্যাকবসন যা বলেছেন, সবই তাঁর অনুভূতির ওপর নির্ভর করে বলেছেন, ওর মধ্যে ফ্যাক্টস্ ছিল না।'

'জানি, স্যার। তবু, আমি বোধহয় খুব বেশি কঠোর ছিলাম ওর ব্যাপারে। একেবারেই আমল দিইনি।'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কি আর করা, যা হওয়ার হয়ে গেছে। একটাই দুঃখ যে এতবড় বিপদে সেইন্ট পিয়েরের মানুষের কোন কাজে লাগতে পারলাম না। কেবল নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে হচ্ছে। যদি কিছু পারি, ফিরে এসে করব। ভাবছি, জাহাজ নিয়ে সাগরে বেরিয়ে বড়রকম কোন বিপদে পড়তে হবে কি না! প্ল্যান "কে" সম্পর্কে জানা আছে আপনার?'

'জ্বি, স্যার।'

'যান তাহলে। শুরু করে দিন।' স্মিথকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে নরম গলায় বললেন, 'জ্যাকবসন কোথায়?'

'অফিসে নেই, স্যার। কাল বিকেলে বেরিয়ে আর ফেরেনি।'

লোকটা বেরিয়ে যেতে উঠলেন কমোডর, ক্যাপ সারাতের আপাতত শেষ কিছু অফিশিয়াল ডিউটি সারতে হবে। প্রথমে গোপনীয় সমস্ত ডকুমেন্টস একটা সিসার পাত বসানো খুব ভারী ব্রীফকেসে ভরলেন তিনি। প্রয়োজন দেখা দিলে সাগরে ফেলে দেবেন, নিজের ভারেই তলিয়ে যাবে ওটা।

কাজ সেরে ফোন করলেন ব্যক্তিগত সহকারীকে।

কাজটা যত সহজ হবে ভেবেছিল রানা, ঠিক ততটাই কঠিন হয়ে দেখা দিল। বিদ্রোহী নেতা জুলিও ফ্যাভেলের দেখা নেই, যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে চরকির মত। নেগ্রিটো পাহাড়ের গোড়ায় প্রাচীন এক বিল্ডিঙে তার 'ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার্স', সেখানে ওকে বসিয়ে রেখে সেই যে গেছে এডওয়ার্ড, প্রায় তিন ঘণ্টা হতে চলল তারও কোন পাত্তা নেই। ফ্যাভেল কোথায় আছে দেখতে গেছে।

হেডকোয়ার্টার্সে প্রাইভেট সৈনিকদের আনাগোনার কমতি নেই, কেউ না কেউ প্রতি পাঁচ-দশ মিনিট পরপরই আসছে রিপোর্ট করতে। বুক ফুলিয়ে হাসতে হাসতে আসছে তারা, সিনিয়র অফিসারদের কাছে রিপোর্ট করছে। তাদের আলোচনা শুনে মোটামুটি বোঝা যায় সরকারী বাহিনী সব ফ্রন্টে হেরে যাচ্ছে। তাদের বড় একটা অংশ টিকতে না পেরে পুব নেগ্রিটোয় পালিয়ে গেছে, কাল হয়তো নতুন করে ফ্যাভেল বাহিনীকে আক্রমণ করবে ওরা। সেরারিয়েরের ডান হাত, জেনারেল ওকাচার অধীনে আছে সে অংশ। ঢোকা-বের হওয়ার পথে মাসুদ রানাকে কৌতূহলের চোখে দেখছে সবাই, তবে এগিয়ে এসে কথা বলার আগ্রহ দেখাচ্ছে না কেউ।

বিল্ডিংটা বেশ বড়, ফরাসীদের তৈরি। দেয়ালের বেশিরভাগ প্লাস্টারই গায়েব, দরজা-জানালার পাল্লাও সব নেই। আটটা বেজে গেছে দেখে অস্থির হয়ে উঠে পড়ল রানা; আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না। এক সিনিয়র অফিসারকে দেখতে পেয়ে এগোল। ওর ইচ্ছের কথা শুনে হাসল লোকটা। 'ফ্যাভেলের সাথে দেখা করতে চান, ব্লাঙ্ক? আমিও তো চাই, সবাই চায়। কিন্তু তিনি ব্যস্ত, এক জায়গায় বসে নেই।'

'এখানে তার আসার চান্স আছে?' প্রায় হতাশ, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও।

'আছে, যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়। তাঁকে কি দরকার আপনার, কে আপনি?' যেন এইমাত্র ওর উপস্থিতি চোখে পড়েছে, এমনভাবে তাকাল অফিসার।

শুনেও না শোনার ভান করল রানা। 'খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর দিতে চাই তাকে।'

'কি?'

'সেটা তাকেই বলব। জানাবার হলে সে জানাবে আপনাদের।'

মাথা ঝাঁকাল অফিসার। 'ভাল। তবে খেয়াল রাখবেন, খবরটা যদি গুরুত্বপূর্ণ না হয়, খাঁচা থেকে আপনার লিভার বের করে আনবে ফ্যাভেল।'

আগের জায়গায় ফিরে এল ও। বসে পড়ল। ক্রিস্টিনা, জ্যাকের কথা ভাবল, ওরা কে কি অবস্থায় আছে অনুমান করার চেষ্টা করল। ক্রিস্টিনাকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই, ওকে সাহায্য করার মানুষ আছে। সমস্যা জ্যাককে নিয়ে—কাজপাগল, আপনভোলা মানুষ, কি অবস্থায় আছে এখন কে জানে!

কখন যে চোখের পাতা ভারী হয়ে বুজে এল, টেরই পেল না ও। বসা অবস্থায়ই তলিয়ে গেল গভীর ঘুমের অতলে। শক্ত হাতের ঝাঁকি খেয়ে যখন তাকাল, দিনের আলো ফুটেছে তখন। কোথায় আছে বুঝে উঠতে কয়েক সেকেন্ড লাগল ওর, তারপর ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে গেল।

'টেক ইট ইজি,' হেঁড়ে গলায় কেউ বলল। "ব্যস্ত হবেন না।"

সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক দানব মানুষটা। কম করেও চুয়াল্লিশ ইঞ্চি চওড়া বুকের ছাতি। সারা গালে ঘন, কুচকুচে কালো দাড়ি। পরনে জিনস আর সস্তা নাইকি স্যান্ডো গেঞ্জি। দু'চোখ টকটকে লাল। 'আপনি মাসুদ রানা?'

চোখ কচলে মাথা ঝাঁকাল ও। 'হ্যাঁ।'

'আসুন, ফ্যাভেল আপনার অপেক্ষায় আছে।' ঘুরে আগে আগে হাঁটতে লাগল দানব। ঘড়ি দেখে নিজের ওপর চরম বিরক্ত হলো ও—প্রায় সাতটা। আশ্চর্য, এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা রাত স্রেফ ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল? 'মীটিঙ খুব সংক্ষেপে সারবেন,' বলল লোকটা। 'ফ্যাভেল এমনিতেই ব্যস্ত মানুষ। আজ তো আরও।'

একটা করিডর ধরে বিল্ডিঙের পিছনদিকের এক বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছে দাঁড়াল সে। দরজায় হাত রেখে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল। 'অপেক্ষা করুন, কনফারেন্স শেষ হয়েছে কি না দেখতে হবে।'

লোকটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ামাত্র উদ্বেগ শুরু হয়ে গেল রানার। ফ্যাভেল কি বিশ্বাস করবে ওর কথা? যদি না করে? এ মুহূর্তে দেশ জয়ের আনন্দে আছে, ক্ষমতার গদি মাত্র কয়েক হাত দূরে, এ সময় নতুন এক সমস্যা···। চিন্তায় ছেদ পড়ল দরজা খুলে যেতে। মুখ বের করে তাকাল দানব। নির্বিকার। 'আসুন।'

ভেতরে ঢুকল ও। রুমটা বেশ বড়। বাতাসে ভেজা গন্ধ। বড় এক টেবিল ঘিরে বসে আছে বেশ কয়েকজন, প্রত্যেকে কাটখোট্টা চেহারার। বেশিরভাগের গালে দাড়ি, আছাঁটা। আলোচনা চলছিল, রানা ঘরে পা রাখতে থেমে গেল, ঘুরে তাকাল এদিকে পিছন ফিরে বসা মানুষগুলো। এক রাত আগের প্রেসিডেন্টের প্রি-ব্যাটেল কনফারেন্স রুমের দৃশ্য রানার চোখে ভেসে উঠল। ওখানে জাঁকজমক ছিল, ক্ষমতার দম্ভ ছিল, উত্তেজনা ছিল—এখানে তার কোনটাই নেই।

কালকের ল্যান্ড রোভার চালক এডওয়ার্ডকে এদিকে মুখ করে বসা দেখল ও, মুখ টিপে হাসল সে চোখাচোখি হতে।

'এই হচ্ছে ফ্যাভেল,' এডওয়ার্ডের বাঁদিকের গড় উচ্চতার হ্যাঙলা মানুষটিকে দেখাল দানব। লোকটার গায়ের রঙ মোটামুটি ফর্সাই বলা চলে, ক্লীন শেভড্। চোখের রঙ নীল। পরিষ্কার খাকি ডেনিম আর ওপেন-নেকড্ শার্ট পরে আছে। উঠে দাঁড়াল সে, টেবিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ডান হাত বাড়াল হাসিমুখে। 'মিস্টার মাসুদ রানা! বসুন, প্লীজ! কাল এডওয়ার্ডের মুখে শুনলাম আপনি আমার ইন্টারভিউ নিতে চান, অথচ আজ শুনছি অন্য কথা। তো···বসুন, বসুন!' ঝরঝরে ইংরেজিতে বলল সে, কোন টান নেই। 'কোন পত্রিকার রিপোর্টার যেন আপনি?'

বসল রানা। স্থির চোখে সরাসরি ফ্যাভেলের চোখের দিকে তাকাল। 'আসলে আমি সাংবাদিক নই।' বলেই খেয়াল করল এডওয়ার্ডের চোখ কুঁচকে উঠেছে, অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে সে।

'আচ্ছা!' ফ্যাভেলের নীল চোখে কৌতুকের আভাস ফুটল। 'তো কি আপনি? নাম···'

'নাম ঠিকই আছে, ওটা মিথ্যে নয়। সাংবাদিক পরিচয় পেলে আপনি দেখা দিতে বেশি আপত্তি করবেন না ভেবে মিথ্যে পরিচয় দিয়েছি।'

'কিন্তু আপনার আইডি...?'

'ওরকম আইডি অনেক আছে আমার সাথে,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল ও। 'যখন যেটা প্রয়োজন মনে করি, বের করি। এডওয়ার্ডকে কাল দেখিয়েছি লন্ডন হেরাল্ডের আইডি, তার আগের রাতে লিবারেশন নোইয়ের লক্-আপ ইন চার্জ সাউস ইন্সপেক্টর রসিউকে দেখিয়েছি ইন্টারপোলের খুব বড় এক কর্মকর্তার আইডি।'

'কিন্তু কেন?' চোখ পিট্ পিট্ করে উঠল বিদ্রোহী নেতার। 'এর কারণ কি? আমার সাথে মিথ্যে পরিচয়ে দেখা করার কি প্রয়োজন পড়ল আপনার?'

এডওয়ার্ডের চেহারা কঠিন হয়ে উঠল। দাড়িওয়ালা দানবকে দেখে মনে হলো এখনই বুঝি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। অন্যদের অবস্থাও মোটামুটি এক। আর যা-ই হোক, অন্তত একটু আগের বন্ধুসুলভ অভিব্যক্তি নেই কারও চেহারায়, গায়েব হয়ে গেছে।

'আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন, মিস্টার মাসুদ রানা!' চেহারা শান্ত থাকলেও কণ্ঠ অসহিষ্ণু শোনাল ফ্যাভেলের।

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও। 'বরং নিজের সময় নষ্ট করে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আপনার খুব বড় এক উপকার করতে এসেছি আমি, মিস্টার ফ্যাভেল। বিষয়টা যদি গুরুত্বপূর্ণ না হত, বারো-তেরো ঘণ্টা বসে থাকতাম না আপনার দেখা পাওয়ার আশায়, নিজের কাজে চলে যেতাম।'

'হ্যাঁ, তা জানি,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'আপনার এখানে আসার খবর আমি সন্ধের পর পেয়েছি। ভোর তিনটেয় এখানে পৌঁছে ঘুমে দেখেছি আপনাকে। কোন সন্দেহ নেই প্রচুর সময় নষ্ট করেছেন। কিন্তু কেন? আপনি আসলে কে?'

'আগে বরং কাজের কথা শেষ করি, তারপর ওসব শুনবেন।'

হেলান দিয়ে বসল ফ্যাভেল, সঙ্গীদের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল দৃষ্টি। 'বেশ, তাই হোক। বলুন, কি আপনার কাজের কথা!'

বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে শুরু করল ও। 'আজ চারদিন হলো এ দেশে বেড়াতে এসেছি আমি। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে এখানে, গ্রেনাডান, ক্যাপ সারাত নেভাল বেজের অ্যাসিসটেন্ট ওয়েদার অফিসার সে। ড্যানিয়েল জ্যাকবসন।'

'আই সী!'

'যেদিন আমরা এলাম...'

'আমরা?' এডওয়ার্ড প্রশ্ন করল।

'সাথে এক বান্ধবী আছে আমার, লন্ডন টাইমসের নিউ ইয়র্ক করেসপন্ডেন্ট। জেনুইন। আমার মত নকল নয় তার আইডি। যাই হোক, যেদিন আমরা এলাম, তার আগের দিন ওয়েদার মনিটরিঙ ফ্লাইটে আটলান্টিকে গিয়েছিল আমার বন্ধু। ওদিকে খুব বড় এক ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়েছে দেখে এসেছে সে, ম্যাবেল নাম ওটার। ও শিওর, সান ফের্নান্দেজের দিকে আসছে ওটা, এখন থেকে ষোলো, কি সতেরো ঘণ্টার মধ্যে হিট্ করবে।'

ফ্যাভেলকে মাথা দোলাতে দেখে তাড়াতাড়ি যোগ করল ও, 'আরেকটু বলে নিই। আমার এই বন্ধুটি নিজের ক্ষেত্রে খুবই বিশ্বস্ত বিশেষজ্ঞ। অন্য লাইনের

মানুষ ছিল কিন্তু কয়েক বছর আগে সেইন্ট কিট্‌সে এই ঘূর্ণিঝড়েই আত্মীয়-স্বজন সবাইকে হারিয়ে এই লাইনে এসেছে। লন্ডনে পড়াশুনা সেরে এসে জয়েন করেছে ক্যাপ সারাতে। তবে···ম্যাবেলের এই দ্বীপেই হিট করার ব্যাপারে আবহাওয়া বিজ্ঞান অবশ্য শিওর নয়। কিন্তু জ্যাকবসন হান্ড্রেড পার সেন্ট শিওর। আমিও···'

'হতে পারে না,' মাথা দোলাল এডওয়ার্ড। 'উনিশশো দশের পর এই দ্বীপে কোন ঘূর্ণিঝড় হয়নি। তাছাড়া আপনিই বলছেন আবহাওয়া বিজ্ঞান তার ধারণাকে সমর্থন করেনি।'

'হ্যাঁ, বলেছি। তবে এ-ও ঠিক, জ্যাকবসন এই অঞ্চলের মানুষ। এখানকার কারও কারও মধ্যে যে প্রায় অলৌকিক অনুভূতি শক্তি আছে, ওর মধ্যেও তার কিছুটা আছে। বিনাদ্বিধায় বিশ্বাস করা যায় তাকে।'

'সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু···'

'ম্যাবেলের বাতাসের গতি একশো সত্তর মাইল ছিল কাল পর্যন্ত, এরমধ্যে বেড়েছে কি না জানি না। যদি আসে, ভয়ঙ্কর বন্যা নিয়ে আসবে। তারপর সেইন্ট পিয়েরেতে প্রাণ আছে, হাঁটে-চলে, এমন কিছুর অস্তিত্বই থাকবে না,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল ও।

'আপনার বন্ধু নিশ্চই জানেন, উনিশশো দশ সালের পর এ দ্বীপে কোন্ হারিকেন আঘাত করেনি?' বলল ফ্যাভেল। কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

'জানে। আর এই এক রেফারেন্স শুনতে শুনতে আমারও অরুচি ধরে গেছে। উনিশশো দশ সালের মধ্যে কি কোন ম্যাজিক আছে? প্রকৃতি কি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে একশো বছরের আগে আর কোন হারিকেন হবে না এ দ্বীপে? পরেরটা দু'হাজার দশ সালে আসবে, এমন কিছু নিশ্চয়তা আছে?'

'না, তা নেই,' মৃদু গলায় বলল ফ্যাভেল। 'কয় ঘণ্টা পর ওটা হিট্ করবে বললেন?'

'ষোলো থেকে সতেরো ঘণ্টা।' মন তেতো হয়ে উঠল মাসুদ রানার। 'পরশু রাতে খবরটা জানাতে গিয়েছিলাম সেরারিয়েরকে, কানেই তোলেনি সে আমার কথা। উল্টে মেরে ধরে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

এতক্ষণে যেন কানে কিছুটা হলেও পানি গেল ফ্যাভেলের। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে রানা সেরারিয়ের এবং তাকে সতর্ক করতে যে ঝুঁকি নিয়েছে, উড়িয়ে দেয়া যায় না ব্যাপারটা। হেলাফেলা করা যায় না, উচিত হবে না।

'কিন্তু এ কাজে আপনি কেন?' বলল সে। 'কমোডর কেন অফিশিয়াল ওয়ার্নিং জানাননি? আপনার সেই বন্ধুই বা কোথায়?'

'জ্যাকবসন অন্যের দোষে হাজত খাটছে, তাই বাধ্য হয়ে আমি নেমেছি এ কাজে। আর কমোডর ওয়ার্নিং ইস্যু করেননি কারণ কাল বিকেল পর্যন্ত বেজের চীফ ওয়েদার অফিসার তাঁকে ম্যাবেল সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য দিতে পারেনি। তাছাড়া কাকেই বা জানাবেন? এতদিন হোম মিনিস্টার ওনাদি ছিল ওয়েদার ডিপার্টমেন্টের হেড। তিন দিন আগে তাকে সরিয়ে সেরারিয়ের নিজেই সে দায়িত্ব নিয়েছে। যুদ্ধের এমন অবস্থায় নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া এ খবর দিলে সে বিশ্বাস তো

করতই না, বরং যুদ্ধ থেকে তার মন অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত করত কমোডরকে। তার জায়গায় আর কেউ হলে কিছু না কিছু অবশ্যই করতেন তিনি।'

মাথা ঝাঁকাল ফ্যাভেল। 'যুক্তি আছে।'

'আপনার সাথে হাত মিলিয়ে তিনি যুদ্ধের গতি ঘোরাবার ষড়যন্ত্র করছেন, এ ধরনের অভিযোগ তোলাও সেরারিয়েরের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।'

আবার কৌতুক ফুটল বিদ্রোহী নেতার চাউনিতে। 'বেড়াতে এসে চারদিনেই এ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন দেখছি!'

'দু'দিনে, অ্যাকচুয়ালি,' পকেট থেকে তোবড়ানো সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা। একটা ধরিয়ে টানতে লাগল। বাসি মুখে বিস্বাদ লাগার কথা, কিন্তু লাগল না। হয়তো মনের চাপ ঝেড়ে ফেলার সুযোগ হয়েছে বলেই।

'আপনার বন্ধু হাজতে কেন?' প্রশ্ন করল সে। জবাব শুনে চোখ কপালে তুলল। 'বলেন কি! জারভিস কুপারকে আটক করেছে আহাম্মকের দল? ইন্টারপোলের আইডি দেখিয়ে তাদের ছাড়াতে গিয়েছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পারিনি। আমার সাথে ব্রিটিশ কনসালও ছিলেন।'

'ফুলারটন?'

'হ্যাঁ। প্রেসিডেন্টের ওখানেও তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম।' পরিণতি কি হয়েছিল খুলে বলল ও, গালের কাটা দাগটা দেখাল। গতকালকের পুরো ঘটনাও বলল।

এডওয়ার্ড অসহিষ্ণু হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল ফ্যাভেল। 'জানি কি বলতে চাও তুমি, এড। যুদ্ধের পরিণতি এখন সম্পূর্ণ আমাদের অনুকূলে, এই মুহূর্তে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়, এই তো? কিন্তু ভেবে দেখো, আমার দেখা পাওয়ার জন্যে ভদ্রলোক কতবড় ঝুঁকি নিয়েছেন কাল। তুমি যেখান থেকে এঁকে তুলে এনেছ, সেখানে আমাদের হাতেই এঁর মৃত্যু হতে পারত। ভেতরে কিছু যদি না-ই থাকবে, অনর্থক এত ঝুঁকি কে নিতে যাবে?'

সমর্থনের আশায় অন্যদের দিকে তাকাল ফ্যাভেল। 'অন্তত আরেকটু ডিটেইলস্ আলোচনা করতে দোষ কোথায়? সত্যিই যদি ম্যাবেল আসে, আমাদের ভবিষ্যৎ কোর্স অভ অ্যাকশন বদলাতে হবে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'আপনার বন্ধুকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইন দ্য মীন টাইম, আপনি কি পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে পারবেন আমাদের?'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'নিশ্চয়ই! নইলে প্রেসিডেন্টের কাছে কেন যাব?'

'আপনি নিশ্চয়ই এই লাইনের লোক নন?'

'না। তবে ম্যাবেল সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ছবি দিতে পারব আপনাকে। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে সব।'

'গুড! তোমরা কেউ একজন ক্ষফির কথা বলবে, প্লীজ?' দানব বেরিয়ে গেল রুম থেকে। 'আপনি শুরু করুন, মিস্টার মাসুদ রানা। বুঝতে অসুবিধে হলে আমি প্রশ্ন করব।'

সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে নড়েচড়ে বসল ও।

'প্রেডিক্টেড কোর্স?' প্রথম প্রশ্ন ফ্যাভেলের। 'তাতে কি ম্যাথেল সরাসরি এদিকেই আসবে এমন কোন শিওরিটি ছিল?'

'না। তবে হারিকেন সোজা পথে চলে না। এঁকেবেঁকে চলে। সান ফের্নান্দেজের পাশ কাটাবার সময় সামান্য একটু বাঁক ঘুরলেই...'

'যদি না ঘোরে?' বাধা দিল এডওয়ার্ড।

যুবকের দিকে কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে থেকে দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও, 'ঘুরবে! কোন সন্দেহ নেই।'

'কি করে এত শিওর আপনি?' ফ্যাভেল বলল।

'পরশু ক্যাপ সারাত থেকে শহরে ফেরার সময় পাহাড়ে এক বুড়ো ক্যারিব ইন্ডিয়ানকে দেখেছি আমি দড়িদড়া দিয়ে মজবুত করে ঘরের চাল বাঁধতে।'

মাথা দোলাল বিদ্রোহী নেতা। 'আমিও কাল একজনকে দেখেছি একই কাজ করতে। ভেবেছি...'

'ফর গড'স সেক!' চরম বিরক্তির সাথে বলে উঠল এডওয়ার্ড। 'এসব কি হচ্ছে? এটা ফোকলোর সোসাইটির মীটিঙ নয়, এখানে ফ্যাক্টস্ নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি আমরা।'

'থামো, এড!' বিরক্ত হলো ফ্যাভেল। 'আমি একজন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান। এসব পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারি না।' রানার দিকে ফিরল। 'লোকটার সাথে কথা বলেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলল সে?'

'বলল, খুব বড় ঝড় আসছে। শুধু তাই নয়, কখন আসবে, বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সময়টাও বলেছে। জ্যাকবসন আর তার সময়ের হিসেব একদম মিলে গেছে।'

বিরক্ত সঙ্গীর দিকে ফিরল নেতা। 'ইনি যার কথা বলছেন, আমি বাজী ধরে বলতে পারি সে এখন কি করছে। পাহাড়ের কোন গুহায় বসে ক্যারিব ঝড়ের দেবতা হানরাকেনকে ডাকছে। যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, ঘুরে দেখে আসতে পারো একবার।'

'হয়তো আপনার ধারণাই ঠিক,' রানা বলল নিজের মনে। 'লোকটা বলছিল হাতের কাজ শেষ হলে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেবে সে।'

মাথা ঝাঁকাল ফ্যাভেল। 'এদের এই অনুভূতি হেসে উড়িয়ে দিতে বাধে আমার। অতীতে অনেকবার দেখেছি, প্রায়ই ফলে যায় এসব ভবিষ্যদ্বাণী।'

'সহজ একটা বিষয় তোমার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে, ফ্যাভেল,' এডওয়ার্ড বলল। 'এই ভদ্রলোকের বন্ধু না হয় হাজতে, লেটেস্ট খবর জানতে পারছে না। কিন্তু তার চীফ তো বেজেই আছে, সে তো নজর রাখছে ওয়েদারের ওপর। পরিস্থিতি যদি এতটাই খারাপ হবে, তাহলে কমোডর কেন এখনও ঘাঁটি ভ্যাকেট করছেন না? এখনও কোন্ ভরসায় বেজে পড়ে আছেন তিনি? হারিকেন এলে বন্যা আসবে, এ কথা তো তাঁকে জানানো হয়েছে। আর বন্যা যদি আসে, সবচে' আগে

ধ্বংস হবে তাঁর বেজ। সব জেনেও কোন ভরসায় বসে আছেন তিনি? জুলিও, তুমি ভুলে যাচ্ছ দেশের জন্যে লড়াই করছ তুমি। আসল কাজ বাদ দিয়ে আর কোনদিকেই এখন নজর দেয়া উচিত নয় তোমার। এতে জয় পিছিয়ে যাওয়ার...'

চেহারা দেখে মনে হলো রেগে উঠেছে নেতা। গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি বলতে চাইছ, এটা দেশের কাজ নয়? এ কাজ আমি দেশের জন্যে করছি না? আমার দেশের মানুষের জন্যে করছি না? ওয়েল, তাদের জন্যেই করছি। এতে যদি আমার জয় পিছিয়ে যায়, যাবে। অনেক বছর তো পাহাড়ে কাটিয়েছি, না হয় আরও কয়েক বছর কাটাব, নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে আবার লড়ব সেরারিয়েরের বিরুদ্ধে। কিন্তু জয় পিছিয়ে যেতে পারে বলে ষাট হাজার সাধারণ মানুষের প্রাণ নিয়ে জুয়ো খেলতে রাজি নই আমি। এ মুহূর্তে ক্ষমতার চাইতে এদের প্রাণের দাম অনেক বেশি আমার কাছে। বিপদে সাধারণ মানুষের বাঁচার পথ যদি দেখাতে না-ই পারলাম, তাহলে কিসের নেতা আমি? কি হবে অমন নেতৃত্ব দিয়ে?'

এক হাত এডওয়ার্ডের কাঁধে রাখল সে। চেহারা আমূল বদলে গেছে, কণ্ঠও একদম স্বাভাবিক। 'তুমি তো আমার বহুদিনের সঙ্গী, বন্ধু। ভেবে বলো দেখি, এই ধরনের কাজে আমাকে কখনও ভুল সিদ্ধান্ত নিতে দেখেছ তুমি?'

'না,' মাথা দোলাল যুবক। 'তবে সবকিছুতেই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে, জুলিও। আমার ধারণা যেদিন তেমন কোন ভুল করবে তুমি, সেদিন হয়তো...'

'আমার মৃত্যু হবে, এই তো? তার বেশি কিছু তো হবে না? ভেবো না, কিছুই ঘটছে না তেমন। এবার একটা ম্যাপ নিয়ে এসো দেখি। পুরো...'

ভারী, গুম গুম শব্দের সাথে মাটি কেঁপে উঠল। কয়েক সেকেন্ড পর ঘরের সবার ভেতরের জমা বাতাস বেরিয়ে গেল অদৃশ্য এক টান খেয়ে। 'কি ব্যাপার!' সামলে নিয়ে বলল ফ্যাভেল। 'কিসের শব্দ?'

পরমুহূর্তে আবার এল একই আওয়াজ, মেঘ ডাকার মত গুরুগম্ভীর, দূরাগত। কাঁপতে শুরু করল বিল্ডিঙ। 'ভূমিকম্প নাকি?' কে একজন বলল।

'না। মনে হয় বম্বিং করছে এয়ার ফোর্স। চলো দেখি!'

হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল প্রত্যেকে। বিল্ডিঙের পিছনের ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে খানিকটা উঁচুতে উঠতেই একযোগে সবার চোখে পড়ল ব্যাপারটা—উত্তরের আকাশ ছেয়ে আছে ধূসর রঙের পুরু ধোঁয়ায়। নিয়মিত বিরতি দিয়ে এখনও ভেসে আসছে সেই গম্ভীর গুম গুম আওয়াজ।

'আমেরিকানরা বেজ খালি করে সরে পড়ছে,' সহজ কণ্ঠে বলল রানা। 'যাওয়ার আগে নিজেদের গোলাবারুদ ধ্বংস করে দিয়ে যাচ্ছে যাতে সেরারিয়ের ওগুলোর নাগাল না পায়।'

ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো বিদ্রোহী নেতা। 'তার মানে ম্যাবেল আসছে!'

রানা কিছু বলল না। আর সবার চোখ আঠার মত সেঁটে আছে উত্তরের আকাশে। মেঘের পরিধি ক্রমেই বাড়ছে ওদিকে।

আট

প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে দিমিত্রিওস ম্যানোস। নিজের গর্তের পাশে শুয়ে ঘামছে দরদর করে। নিচে, কলাবাগানে ক্যাম্প করেছে সেরারিয়েরের আর্মি। এখানে-ওখানে আগুন জ্বেলেছে, আগুন আর চাঁদের আবছা আলোয় দূর থেকে এক-আধটা মানুষের কাঠামো চোখে পড়ছে। হাঁটাহাঁটি করছে ওরা, নিচু কণ্ঠে কথা বলছে। কনসাল ফুলারটন নিচে গেছেন লোকগুলো কি করছে দেখতে। দিমিত্রিওসের সাহসে কুলায়নি, কয়েক পা গিয়ে ফিরে এসেছে কাঁপতে কাঁপতে। ওদের উপস্থিতি যদি কোনমতে টের পেয়ে যায় ব্যাটারা, কি ঘটবে কল্পনা করে ঘামছে সে।

নিজের গর্তে ক্রিস্টিনার অবস্থাও প্রায় এক। তবে একটা সুবিধে আছে ওর, এই ধরনের বিপদের সম্ভাবনার কথা ভেবে রানা তার পিস্তলটা দিয়ে গেছে। বাধ্য হলে আত্মহত্যা করবে ক্রিস্টিনা, তবু ধরা দেবে না পশুগুলোর হাতে। প্রথমে সেফটি ক্যাচ অফ করতে হবে, তারপর নল কপালের পাশে ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিলেই ঝামেলা শেষ। গণধর্ষণের শিকার হওয়ার চাইতে সেই বরং ভাল হবে। মনস্থির করতে পেরে স্বস্তি বোধ হলো, গর্ত থেকে মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকাল সে। 'ম্যানোস!' ডাকল ফিসফিস করে।

'আমি এখানে,' সাড়া দিল গ্রীক।

'কনসাল কোথায়?'

'এখনও ফেরেননি।'

'ওরা কারা, কি করছে?'

'সরকারী সৈন্য। অনেক লোক।'

মিসেস জোনস গুঙিয়ে উঠল।

'ধারেকাছে কেউ আছে ওদের?' ক্রিস্টিনা বলল।

'আছে। দুইশো ফুট দূরে হবে বেশি হলে। জোরে কথা বললে শুনে ফেলবে।'

'তাহলে খোলা জায়গায় থাকা ঠিক না। গর্তে ঢুকে পড়ুন, মাথার ওপর কলা পাতা টেনে দিন।'

'আমার খুব ভয় করছে,' বলল মিসেস জোনস। গলা একটু চড়া শোনাল। 'খুব ভয় করছে।'

'আমারও করছে,' তার গর্তের দিকে মুখ করে বলল ও। 'জোরে কথা বলবেন না, শুনে ফেলবে ওরা।'

উল্টে গলার জোর আরও বেড়ে গেল মহিলার। 'কিন্তু ওরা ধরতে পারলে খুন করবে আমাদের! রেপ করবে!'

'দোহাই লাগে, আস্তে!' রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল ক্রিস্টিনার।

'ওদের কানে যাবে।'

আরেকবার গোঙানি শোনা গেল মহিলার, তারপর চুপ মেরে গেল। একটুপরই আবার তার নাকী সুরের ফোঁপানি শোনা গেল, অনেক নিচু গলায় অবশ্য।

ওদিকে পরিস্থিতি দেখে আসতে গিয়ে ফেঁসে গেছেন ফুলারটন, মহাসমস্যায় পড়েছেন। বাগানের ভেতরের সার্ভিস রোড কখন যে অতিক্রম করে আরেক পাশে চলে এসেছেন, খেয়ালই করেননি, এখন তার খেসারত দিতে হচ্ছে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে একটার পর একটা আর্মি ট্রাক বাগানে ঢুকছে, আলো করে রেখেছে রাস্তা, এপারে আসার কোন সুযোগই মিলছে না তাঁর। সেরারিয়েরের সেনাবাহিনী এত ট্রাক কোথায় পেল ভেবে তাজ্জব হয়ে গেছেন। প্রথমে তীব্র আতঙ্কে কিছুক্ষণ পাগলের মত ছোটাছুটি করেছেন বৃদ্ধ, কিন্তু লাভ হয়নি, এক দলের হাত থেকে পালাতে গিয়ে আরেক দলের খপ্পরে পড়তে পড়তে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন।

পর পর কয়েকবার একই কাণ্ড ঘটতে সাহস আর দম, দুটোই হারিয়ে মাটিতে শুয়েই পড়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর একটু সুস্থ হতে চারদিক তাকিয়ে বুঝলেন, সার্ভিস রোড ছেড়ে উল্টোদিকে অনেক দূর সরে এসেছেন তিনি। পাক্কা দেড় ঘন্টা লেগেছে পথটা খুঁজে বের করতে। পথ পেয়েছেন বটে, তবে ওটা পার হওয়ার মত সাহস পাননি। তাই পড়ে আছেন মরার মত। কখন ওপারে যাওয়ার সুযোগ জুটবে তার অপেক্ষায় আছেন।

ফুলারটন ভালই জানেন এদের হাতে ধরা পড়লে কি ঘটবে। প্রচারণার ব্যাপারে সেরারিয়ের যথেষ্ট চতুর এবং ওস্তাদ। সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিজের মনমত করে গড়ে তুলেছে সে। এদের মন আর মাথা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করে। সমস্ত সাদা চামড়ার বিদেশী এদের কাছে শত্রু, সবার চেয়ে বড় শত্রু আমেরিকান, এবং আমেরিকান মানেই সেরারিয়েরের মিথলজির স্পাই। সোজা হিসেব—সাদা মানুষ সমান সমান আমেরিকান, আমেরিকান সমান সমান স্পাই। এদের পেলে পাকড়াও করো, প্রয়োজনে শূট করো।

নিজের চামড়া সাদা, তাই বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে সাহস পাচ্ছেন না ফুলারটন। পড়ে আছেন। কয়েক গজ দূরে একদল সৈনিক বসে আছে অন্ধকারে, টের পাওয়া যাচ্ছে। আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। তার যেটুকু কানে এসেছে, তাতে বোঝা যায় সম্পূর্ণ হতাশ এরা। বুঝে ফেলেছে যুদ্ধের পরিণতি কি হবে। নির্বোধ অফিসারদের পিণ্ডি চটকাচ্ছে লোকগুলো। কাল এরা এখান থেকে ফ্যাভেলের বিরুদ্ধে নতুন অভিযান শুরু করবে। জেনারেল ওকাচার নেতৃত্বে।

তাই যদি হয়, ভাবছেন বৃদ্ধ, তাহলে ওঁদের উচিত হবে প্রথম চান্সেই এখান থেকে সরে পড়া। কিন্তু ভাবনা পর্যন্তই, পরিকল্পনা কাজে লাগানোর কোন সুযোগ পাচ্ছেন না। শেষ পর্যন্ত যখন পেলেন, তখন ফর্সা হতে শুরু করেছে আকাশ। লোকগুলো বেঘোরে নাক ডাকাচ্ছে টের পেয়ে উঠে পড়লেন বৃদ্ধ, পা টিপে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। গাছের আড়ালে আড়ালে ওপরদিকে এগোতে থাকলেন।

এদিকে দিনের আলো ফুটতে দেখে খুশিতে অস্থির হয়ে উঠল মিসেস

জোনস্। বিপদ কেটে গেছে ভেবে গর্তের কিনারা গলিয়ে মাথা তুলল। ওপরের কলাপাতার ক্যামোফ্লেজের খস্‌খস্ শব্দ শুনে ক্রিস্টিনাও তাকাল মুখ তুলে। এবং জমে গেল। গর্তের কিনারায় উঠে বসেছে মহিলা, হাতব্যাগ থেকে ছোট একটা আয়না বের করে চেহারা দেখছে। ক্রিস্টিনার ইচ্ছে হলো চড়িয়ে সব কটা দাঁত ফেলে দেয় মেয়েছেলেটার। কিন্তু তাহলে ওকেও বেরোতে হয়, ঝুঁকি আছে, তাই ইচ্ছে বাতিল করে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'নিচে নামুন! নিচে নামুন, ইউ ব্লাডি ফুল!'

পাত্তা দিল না মহিলা। 'দাঁড়াও, বাছা! কাদামাটি মেখে চুলের কি ছিরি হয়েছে, দেখতে দাও।'

দিমিত্রিওসের পাতার ক্যামোফ্লেজে খস্ খস্ আওয়াজ উঠল। ক্রিস্টিনা বুঝল, কি ঘটছে দেখার জন্যে মাথা তুলতে যাচ্ছে সে। লোকটাকে সতর্ক করার জন্যে মুখ খুলেছিল ও, কিন্তু শেষ মুহূর্তে গলায় কথা আটকে গেল আরেকটা দৃশ্য চোখে পড়তে, হাঁ বন্ধ করার কথাও ভুলে গেল। হঠাৎ এক সৈনিক বাগান থেকে বেরিয়ে একেবারে খোলা জায়গায় উদয় হয়েছে, হাই তুলছে বিকট হাঁ করে। বোঝা যায় সবে ঘুম থেকে উঠে এসেছে, আড়মোড় ভাঙছে। কাজটা সেরে ডানে-বাঁয়ে তাকাল সে খুব সম্ভব পেটের চাপ কমাবার জায়গার খোঁজে। তখনই চোখ পড়ল তার মহিলার ওপর। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল কিছু সময়, তারপর চওড়া হাসি ফুটল মুখে। এগিয়ে আসতে শুরু করল সে।

মনে মনে আঁতকে উঠল ক্রিস্টিনা, আর কিছু করার নেই এখন। খুব সাবধানে মাথা নামিয়ে নিল, পাতার ফাঁক দিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। শেষ মুহূর্তে হয়তো তার অবচেতন মন বিপদ টের পেয়ে গেল, কি সৈনিকের পায়ের শব্দ শুনে ফেলল মহিলা, ঝট্ করে মুখ তুলেই সশব্দে আঁতকে উঠে আয়নাটা ছেড়ে দিল। থাবা মেরে তুলে নিল হাতব্যাগ। কাঁধ থেকে রাইফেল আগেই নামিয়ে নিয়েছিল সৈনিক, চট্ করে ওটা তুলল তাকে ভয় দেখানোর জন্যে।

প্রায় একই মুহূর্তে পর পর তিনটা গুলির শব্দ ভয়াবহ প্রতিধ্বনি তুলল ভোরের গরম বাতাসে, কেঁপে উঠল উপত্যকা। চিৎকার করে উঠল লোকটা, একটা পাক্ খেয়েই দড়াম করে আছড়ে পড়ল মহিলার পায়ের কাছে। ছিট্‌কে সরে গেল সে রক্তাক্ত দেহটার কাছ থেকে।

এক লাফে গর্ত ছেড়ে উঠে পড়ল গ্রীক, ছুটে গেল লোকটার দিকে। ঘন ঘন মোচড় খাচ্ছে তার দেহ, বুক-পিঠ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তাকে ধরল সে, পরক্ষণে দু'হাত রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে দেখে আঁতকে উঠে ছেড়ে দিল। বোকার মত তাকিয়ে থাকল হাতের দিকে। বিপদ টের পেয়ে খুব দ্রুত উঠে এল ক্রিস্টিনা।

'একে গুলি করা হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যানোস। 'বজ্জাত মহিলা গুলি করেছে লোকটাকে!'

'ও-ও আমাকে ধরতে আসছিল!' তারস্বরে চেঁচিয়ে উপত্যকা মাথায় তুলল মিসেস জোনস। 'আমাকে রেপ করতে আসছিল! ও-ও...' হাতে ধরা একটা পিস্তল নাচাল। 'এটা দিয়ে...' বাকি কথা বলার সুযোগ হলো না। তার গাল সই

করে গায়ের জোরে খোলা হাতের এক চড় বসিয়ে দিল ক্রিস্টিনা। পড়ে গেল সে মাথা ঘুরে, নিথর হয়ে গেল। ওদিকে লোকটার নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে গেছে।

'জলদি!' রুদ্ধশ্বাসে বলল ও। 'লাশটা গর্তে ঢোকান, আমি একে...'

'এ তো আমার পিস্তল!' হাত বাড়িয়ে মহিলার মুঠো থেকে অস্ত্রটা ছাড়িয়ে নিল বিস্মিত গ্রীক, বিপদের কথা খেয়ালই নেই।

'সে পরে দেখা যাবে!' ধমকে উঠল ও, দুই হ্যাঁচকা টানে অজ্ঞান মহিলাকে তার গর্তের মুখে নিয়ে এসেছে ততক্ষণে। 'আগে লাশটা...'

কথা শেষ করার সময় পাওয়া গেল না, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল ওদের সরকারী সৈন্যরা। মাটিতে নিজেদের এক সঙ্গীর লাশ আর কাছেই পিস্তল হাতে ম্যানোসকে দেখে খুব দ্রুত হিসেব কষে ফেলল একজন, গুলি করল সঙ্গে সঙ্গে। পরক্ষণে চারদিক থেকে কয়েকটা বেয়োনেট ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ করে কোচের মত গেঁথে ফেলল হতভাগ্য গ্রীককে। না মরা পর্যন্ত অনবরত কুপিয়ে তার দেহ ঝাঁঝরা করে দিল ওরা।

সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা পড়ল ক্রিস্টিনা। দূর থেকে পুরো ঘটনা দেখলেন কনসাল। বসে থাকলেন স্থবিরের মত। নড়ার শক্তি নেই।

ঝিম মেরে কটে পড়ে আছে ড্যানিয়েল জ্যাকবসন। কাল একবার কথা বলে সেই যে তাকে সেলে ফেরত পাঠিয়েছে সাব-ইন্সপেক্টর রসিউ, তারপর আর বের হওয়ার সুযোগ হয়নি। সে-ও আর আসেনি। পুরো একটা দিন-রাত সেলেই কেটে গেছে তার ও জারভিস কুপারের। অসহনীয় দীর্ঘ সময়।

জ্যাকবসন পরে জেনেছে, কাল যখন ওকে জেরা করা হচ্ছিল, কুপারকে তখন পাশের এক রুমে বসিয়ে রেখেছিল রসিউ। আগে ওকে 'কাহিল' করে পরে লেখককে ধরার ইচ্ছে ছিল তার। একসঙ্গে দু'জনের স্বীকারোক্তি আদায় করতে চেয়েছিল। পরে কেঁচে যায় পুরো ব্যাপারটা। জ্যাকবসনের মুখে কুপারের গুণ-কীর্তন শুনে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে গিয়েছিল রসিউ, কি জেনেছে সেই জানে, তবে তাকে সেলে পাঠিয়ে দিতে দেরি করেনি। সে কাল দুপুরের ঘটনা।

সময়মত খাবার দিতে এক সেপাই আসে কেবল, নিঃশব্দে খাবার রেখে চলে যায়। প্রশ্ন করলে জবাব দেয় না। আজ অবশ্য আসেনি সে। কাজেই বাইরের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারছে না ওরা। কেবল বুঝতে পারছে বাইরে গোলাগুলি হচ্ছে না, একদম থেমে গেছে। ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কি আছে ভাবতে ভাবতে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিল জ্যাকবসন, কাঁধে ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল তাড়াতাড়ি। ভেবেছিল রসিউ বুঝি, কিন্তু না, এ অন্য কেউ। এক শেতাঙ্গ যুবক, সিভিলিয়ান। বেশ কঠোর চেহারা। তার সঙ্গে আরও চার সশস্ত্র যুবক। পাকা খুনী একেকটা।

'জ্যাকবসন আপনি, না এই লোক?' পাশের কটে ঘুমন্ত লেখককে দেখাল যুবক।

চেহারার সাথে তার সম্পূর্ণ বেমানান নরম গলা শুনে বিস্মিত হলো ও। 'আমি। কেন, আপনি কে?'

'আমি এডওয়ার্ড। উঠুন। ফ্যাভেল আর মাসুদ রানা আপনার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে...'

তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল বিশেষজ্ঞ, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল যুবকের দিকে। 'ঠিক বুঝলাম না! ফ্যাভেল...মাসুদ রানা...?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করুন, সময় নেই। আরও অনেক কাজ পড়ে আছে আমাদের। ইনি সেই লেখক?'

'হ্যাঁ।' তাকিয়েই আছে জ্যাকবসন, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা।

এগিয়ে গেল এডওয়ার্ড, আস্তে গোটা দুই ঝাঁকি দিয়ে ঘুম ভাঙাল কুপারের। 'তাড়াতাড়ি উঠুন। বেরোতে হবে আমাদের।'

'কোথায়...?' ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

'হোটেল ইম্পিরিয়ালে, ফ্যাভেলের হেডকোয়ার্টার্সে।'

'অ্যাঁ! ফ্যাভেল জিতে গেছে? সেরারিয়ের...'

'বেশি কথা বলার সময় নেই এখন, জলদি চলুন,' বলল যুবক। 'হেডকোয়ার্টার্সে গিয়ে সব শুনবেন।'

'কিন্তু পুলিস?' বলল জ্যাকবসন। 'ওরা...'

'সব ভেগেছে। কেউ নেই।'

ইম্পিরিয়ালের লাউঞ্জের এক মাথায় বসেছে ফ্যাভেলের ওয়র কাউন্সিলের মীটিঙ। খানিক আগে এখানে সরিয়ে আনা হয়েছে হেডকোয়ার্টার্স। ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে বড় এক টেবিল আনিয়ে তার ওপর ম্যাপ বিছানো হয়েছে, ওটার ওপর ঝুঁকে আছে ফ্যাভেলসহ অন্য কয়েকজন। পুরানো হেডকোয়ার্টার্সের কনফারেন্স রুমে ছিল এরা সবাই।

টেবিল থেকে একটু দূরে বসে আছে মাসুদ রানা। চিন্তিত। একটার পর একটা সিগারেট টেনে চলেছে। ক্রিস্টিনার কথা ভাবছে, ভাবছে কনসাল, দিমিত্রিওসের কথা। নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পেরেছে কি না ওরা, কোন সমস্যায় পড়েছে কি না, এইসব চিন্তা ঘুরছে মাথায়। জ্যাকবসনকে আনতে যেতে চেয়েছিল রানা, কিন্তু ফ্যাভেল যেতে দেয়নি।

'অনেক কষ্ট করেছেন,' বলেছে সে। 'এবার বিশ্রাম করুন, ওসব আমাকে দেখতে দিন। কোন চিন্তা করবেন না।'

নেতা তো বটেই, অন্যদের কাছেও রানা এখন হিরো, কদর প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে ওর। কে কত বেশি খাতির-যত্ন করতে পারে ওর, সেই প্রতিযোগিতা চলছে সবার মধ্যে। সাড়ে ছয় ফুটি দানব সবার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে এ ক্ষেত্রে। টিপার নাম লোকটার, ফ্যাভেলের ব্যক্তিগত সহকারী। রানার পায়ে পায়ে লেগে আছে মানুষটা।

গরম লাগছে খুব। ঘামে ভিজে গায়ের সাথে লেপটে আছে সবার শার্ট। ইলেক্ট্রিসিটি এখনও চালু হয়নি। কর্তৃপক্ষকে ফল্ট খুঁজে বের করার জরুরী নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে ফ্যাভেল, কাজ চলছে। এ মুহূর্তে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে, ম্যাপের

দিকে তাকিয়ে আছে একভাবে। কোন ধাঁধার জবাব খুঁজছে মনে হয়।

এরমধ্যে শত্রু অবস্থানের ব্যাপারে যে সব খবর পাওয়া গেছে, তাতে জানা গেছে সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে সেরারিয়ের এখনও অনেক এগিয়ে আছে ফ্যাভেল থেকে। সব মিলিয়ে প্রায় পনেরো হাজার সৈন্য তার, ফ্যাভেলের তার অর্ধেকের সামান্য বেশি। সরকারী সৈন্যের একটা দল সেইন্ট পিয়েরে ছেড়ে পশ্চিমে সরে গেছে, সেরারিয়ের নিজে ওটার নেতৃত্বে রয়েছে। অন্য দল আছে পুবে, নেগ্রিটো পাহাড়ে, জেনারেল ওকাচা সে দল পরিচালনা করছে। সুখের কথা, আর্টিলারি শক্তি বলে কিছু নেই ওদের, সব ফেলে ভেগেছে কাল।

এদিকে বিদ্রোহীরা খোদ রাজধানী দখল করে আছে। নেগ্রিটোর উত্তর প্রান্তও তাদের নিয়ন্ত্রণে। ওই জায়গা হাতছাড়া হওয়ার চান্স নেই, যদি ফ্যাভেলের বাহিনী এলাকা ছেড়ে চলেও আসে, তবুও না। কারণ ওদিকে যেতে হলে সরকারী বাহিনীকে সেইন্ট পিয়েরে হয়ে যেতে হবে। ফ্যাভেল শহরে থাকা পর্যন্ত তা কখনোই সম্ভব হবে না ওদের পক্ষে। আগের দিন শোনা গিয়েছিল আজ ভোরে পুবদিক থেকে বিদ্রোহীদের ওপর পাল্টা হামলা শুরু করবে জেনারেল ওকাচা। কিন্তু প্রায় দশটা বাজতে চলেছে, এখনও সেরকম কিছু ঘটছে না। পশ্চিমে সেরারিয়েরের বাহিনীও চুপ। ও তরফ থেকে হামলা না আসা পর্যন্ত ফ্যাভেলও আগ বাড়িয়ে কিছু করতে চাইছে না।

এগিয়ে এল সে, ধপ্ করে বসে পড়ল রানার সামনে। শার্টের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছে বলল, 'বড় সমস্যায় পড়ে গেলাম, কি যে করব বুঝতে পারছি না।'

'কোন ব্যাপারে?' প্রশ্ন করল ও।

'তখন বললেন আপনার দেশে প্রচুর ঝড়-বন্যা হয়। বন্যার সময় কি ধরনের প্রস্তুতি নেন আপনারা?'

'মানুষজন সরিয়ে ফেলি নিরাপদ জায়গায়। উঁচু-উঁচু সাইক্লোন শেল্টার আছে, ওখানে গিয়ে ওঠে কোস্টাল এলাকার মানুষজন।'

'আফসোস, আমার দেশে একটা শেল্টারও নেই। বন্যা হয় না বলে কোন সরকারই এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি।'

সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা, ফ্যাভেলকে অফার করল। 'তাতে কি? আপনাদের নেগ্রিটো আছে, ওখানে নিয়ে যান সবাইকে।'

চোখ বড় করে তাকাল নেতা। 'বলেন কি? এত মানুষ...ষাট হাজার মানুষকে এরমধ্যে পাহাড়ে নিয়ে তোলা কি মুখের কথা নাকি? সময় কোথায়? আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা।'

'এরমধ্যেই সম্ভব।'

'কি করে?' চ্যালেঞ্জ ফুটল ফ্যাভেলের চেহারায়।

'আপনার দু'হাজার ট্রুপস্ পাঠিয়ে দিন শহরে, সবাইকে উত্তরে সরে যেতে বলবে ওরা। প্রয়োজন হলে...'

'মাই গুডনেস! কি বলছেন আপনি? ট্রুপস্ আমার আছেই তো মাত্র সাত হাজারের মত, ওখান থেকে এত লোককে এ কাজে লাগালে কি অবস্থা হবে ভেবে

দেখেছেন? যদি এই সময় সেরারিয়ের বা ওকাচা, একজনও আক্রমণ করে বসে, তখন?'

চোখ কুঁচকে হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'আমার মনে হয় খুব একটা অসুবিধে হবে না তাতে।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ফ্যাভেল। 'কি রকম? একে সময় বেশি নেই, তারওপর...'

'সরকারী বাহিনীর লেটেস্ট খবর কি?' বাধা দিল ও।

'কোন খবর নেই। গ্যাট হয়ে বসে আছে।'

'ভাল কথা। আপনি আপনার আর্টিলারিকে দুই ভাগ করে পুবে আর পশ্চিমে পাঠিয়ে দিন, শেলিঙ করে ব্যতিব্যস্ত রাখবে ওরা সরকারী বাহিনীকে। জায়গা ছেড়ে ওরা যাতে না নড়তে পারে, সেই ব্যবস্থা করবে।'

'তারপর?'

'এই ফাঁকে অন্য দু'হাজার ট্রুপস্ শহর খালি করবে। প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে ওদের। ভালভাবে বললে মানুষ যদি না শোনে, দুটো-একটা বেয়োনেট চার্জ বা গুলিও করতে অর্ডার দেবেন ওদের। স্রেফ মানুষকে ভয় দেখানোর জন্যে। এতে কাজ হবে।' ঘড়ি দেখল ও। 'এখনই যদি কাজ শুরু করেন, সন্ধের আগে শহর খালি হয়ে যাবে। উত্তরে যেতে হবে সরাইকে, সী-লেভেলের কম করেও একশো ফুট ওপরে আশ্রয় নিতে হবে।'

'তারপর!' রুদ্ধশ্বাসে বলল ফ্যাভেল, মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হলো শুধু শুনছেই না, কিছু যেন ভাবছেও।

'কাজ শেষ হলে আপনার ট্রুপস্ রিট্রিট করবে। ধীরেসুস্থে একটু একটু করে পিছিয়ে আসবে ওরা। সময় কম বুঝলে ট্রান্সপোর্ট রেডি রাখবেন, যাতে সময় থাকতে...'

'বুঝতে পেরেছি!' উরুতে চটাশ্ করে চাপড় মারল সে। 'আপনাকে যে কি ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব, বুঝতে পারছি না, মিস্টার রানা। আপনি জানেন না কতবড় উপকার হলো আমার।'

চট্ করে উঠে পড়ল সে। উত্তেজনায় কাঁপছে রীতিমত। 'আমার বাহিনীকে রিট্রিট করতে দেখলে সরকারী বাহিনী এগিয়ে এসে শহর দখল করবে। আর...আর আমি, ইতিহাসে প্রথমবার অস্ত্র হিসেবে হারিকেনকে ব্যবহার করব ওদের বিরুদ্ধে। বন্যার পানিতে ধুয়েমুছে যাবে সরকারী বাহিনী, একটা গুলিও খরচ করতে হবে না আমাকে।'

বোকার মত লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। বুঝতে পারেনি ওর পরামর্শ এভাবে বুমেরাঙ হয়ে দেখা দেবে, চতুর ফ্যাভেল এই ফন্দি আঁটবে। 'কি বলছেন আপনি! পনেরো হাজার মানুষ ভেসে যাবে!'

'অবশ্যই!'

'তার কি প্রয়োজন? আপনি একটু বেশি পিছিয়ে গেলে ওরাও হায়ার গ্রাউন্ডে উঠে আসতে পারে। তারপর না হয়...'

মাথা দোলাল নেতা। 'না, আর যুদ্ধ নয়। আর লড়াই চাই না আমি। অনেক

হয়েছে। সেরারিয়েরের কসাই বাহিনীর ব্যবস্থা ম্যাবেলই করবে এবার।'

'কিন্তু এ তো ম্যাস মার্ডার!' বলল রানা।

'যুদ্ধ মানেই তো তাই। আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, মিস্টার রানা। জানি খারাপ লাগছে আপনার। কিন্তু আপনি এ দেশে নতুন, সেরারিয়ের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। শুনুন, ক্ষমতায় বসার পর থেকে এ পর্যন্ত জানা হিসেবমতে বিশ হাজার মানুষ খুন করেছে তার আর্মি আর সিক্রেট পুলিস। হিসেবের বাইরে কত মেরেছে কে জানে! পাহাড়ী গোখরাকে সুযোগ দিতে রাজি আছি আমি, কিন্তু ওকে নয়। ওর সৈন্যদের সবাই একেকটা খুদে সেরারিয়ের, ওদেরকে দয়া দেখানোর কোন যুক্তি আমি দেখি না। এই হারিকেন এবং আপনার আমার সাথে যোগাযোগ, দুটোকে আমি আমার প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করি। নইলে যুদ্ধের ঠিক এই মুহূর্তে এতবড় দুই সুযোগ...' থেমে শ্রাগ করল। 'আমার অন্তত তাই মনে হয়।'

ও চুপ করে আছে দেখে বুঝল সে ওর মনের কথা। কাছে এসে কাঁধে হাত রাখল। 'ভাবছেন ভাল করতে গিয়ে খারাপ করে ফেলেছেন, তাই না? মন খারাপ? কিন্তু আপনি জানেন, পরিস্থিতির কারণে মানুষকে অনেক সময় অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপারও মেনে নিতে হয়। উনচল্লিশে যখন অটো ফ্রিচ আর লিসে মেইটনার ইউরেনিয়াম অ্যাটম আলাদা করেন, তখন তাঁরা কি জানতেন অ্যাটম বোমায় কত মানুষ মরবে হিরোশিমা-নাগাসাকিতে? জানতেন না। ওই জিনিস মানুষ ধ্বংসের কাজে লাগবে, সেটাই জানতেন না ওঁরা। ওগুলো না ফাটানো হলে যুদ্ধ হয়তো আরও কিছুদিন চলত, মৃতের সংখ্যা বহুগুণ বাড়তে পারত।'

'মনে হয় না,' বলল অন্যমনস্ক রানা। 'জাপানের তখন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য ছিল না। আমেরিকা পার্ল হারবারের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ওদের ওপর বোমা ফেলেছে। এমনিতেও অ্যাটম বোমার ক্ষমতা পরীক্ষা করার জায়গা পাচ্ছিল না ওরা।'

'মানি। কিন্তু অন্যায়টা আগে জাপানীরা করেছে, তা তো ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'হ্যাঁ। তবে এক অন্যায় দিয়ে আরেক অন্যায়ের প্রতিকার করা যায় না। যা হোক, আমার ইচ্ছেমত নিশ্চয়ই চলবেন না আপনি, এ যুদ্ধ আপনার আর সেরারিয়েরের। জিততে হলে শত্রুকে হারাতেই হবে যে ভাবে হোক। অতএব ডোন্ট বদার।'

'গুড,' বলল ফ্যাভেল। 'ওদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই, জঞ্জাল তাই ছেঁটে ফেলাই ভাল। তাতে আমার জনগণের সুবিধে হবে। জমি বাড়বে, খাবার উদ্বৃত্ত থাকবে, দাম কমবে।'

চুপ করে থাকল রানা। লোকটার সিদ্ধান্ত পছন্দ হোক আর না হোক, ব্যাপারটা মেনে নেয়া ছাড়া এখন উপায় নেই। ষাট হাজার সাধারণ মানুষকে বাঁচাবার বিনিময়ে পনেরো হাজার খুনীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে যাচ্ছে ফ্যাভেল, এ একদিক থেকে মন্দ নয়। সেরারিয়ের তো এ নিয়ে চিন্তাও করেনি।

লাউঞ্জের সুইং দরজার ঠিক সামনে কড়া ব্রেক কষার আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল ও—এডওয়ার্ডের ল্যান্ড রোভার। পিছন থেকে ঝপাঝপ্ লাফিয়ে নামল তার

...চার সঙ্গী, সামনে থেকে জ্যাকবসন ও জারভিস কুপার। ভেতরে ঢুকল ওরা। রানার সাথে চোখাচোখি হতে ক্লান্ত মুখে হাসি ফুটল বিশেষজ্ঞের।

ফুটলে যেমন টগবগ করে পানি আলোড়িত হতে শুরু করে, এগারোটার দিকে সেইন্ট পিয়েরের সর্বত্র অনেকটা সেইরকম আলোড়ন শুরু হলো, একযোগে। যারা বাড়িতে ছিল, পিঁপড়ের মত পিলপিল করে পথে বেরিয়ে এল। বেরোতে বাধ্য হলো।

জুলিও ফ্যাভেলের পরিকল্পনা ছিল নিষ্ঠুর, সোজাসাপ্টা। ইভ্যাকুয়েটিঙ ফোর্সের চীফ এডওয়ার্ড তা খুবই দক্ষতার সাথে কাজে লাগাল। পুব আর পশ্চিম শহরতলিতে একযোগে হাজির হলো তার ফোর্স, লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষমাণ সেরারিয়ের ও ওকাচা বাহিনীর অবস্থান লাইনের সামান্য আগে থেকে কাজ শুরু করে দিল। ঘরে ঘরে গেল তারা, প্রথমে নরম সুরে হারিকেনের খবর জানাল, বন্যার ব্যাপারে সতর্ক করল, তারপর একটু কঠোর হলো—তক্ষুণি প্রত্যেককে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল। প্রয়োজন মত কাপড়, কম্বল নিতে পারে সবাই, খাবার ও পানি যে যত পারে। ব্যস্, আর কিচ্ছু না। বড় এক পিঁপড়ের গর্তে কাঠি ভরে মাটি এলোমেলো করে দিলে যা হয়, ঠিক তেমনি হলো অবস্থা—মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে পথে বেরিয়ে পড়ল। গন্তব্য নেগ্রিটো—উত্তরে।

কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে, তাও সবাইকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়া হলো। কাজটা করা হলো যাতে সরকারী ও বিদ্রোহী বাহিনীর ক্রস ফায়ারের মধ্যে পড়ে না যায় মানুষ, ফ্যাভেল বাহিনীর স্বচ্ছন্দে চলাচলের পথে যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটল এর মধ্যে। বছরের পর বছর পয়সা দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে সমাজের সব স্তরে নিজের কিছু দালাল সৃষ্টি করেছে সেরারিয়ের, তারা বাগড়া দেয়ার চেষ্টা করল। অন্যদের নিরুৎসাহিত করার চেষ্টাও বাদ দিল না। তাদের কয়েকজনকে ভয় দেখানো হলো প্রথমে, তাতেও যখন কাজ হলো না, হাজারো মানুষের চোখের সামনে রেয়োনেট চার্জ করা হলো বেশিরকম অবাধ্য আট-দশজনকে। ফল হলো জাদুর মত। দেহগুলো রাস্তার পাশে সরিয়ে রাখা হলো অন্যদের জন্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে। গতি বেড়ে গেল মিছিলের।

পদ্ধতিটা নিষ্ঠুর। তবে এর প্রয়োজন ছিল। কাজ হলো চমৎকার।

ওদিকে সরকারী বাহিনীকে জায়গায় বসে থাকতে বাধ্য করল ফ্যাভেলের দুই আর্টিলারি ইউনিট। জ্যাকবসনের পরামর্শে এক হাজার সৈনিকের আরেকটা দলকে নেগ্রিটোর উত্তর ঢালে পাঠাল সে, যতগুলো সম্ভব গর্ত খুঁড়তে লেগে পড়ল তারা। সবকিছুই ঝড়ের গতিতে চলতে লাগল—সুনিয়ন্ত্রিতভাবে।

আরেক ছোট্ট দল, ইনফর্মার, ব্রিটিশ কনসালের গাড়ি খুঁজতে লেগে গেল। ওটা কোথায় আছে জানা গেলেই ক্রিস্টিনাদের অবস্থানও জানা যাবে।

বিমান বাহিনী কিছু করতে পারল না, উড়তেই পারল না প্লেন। সব ক'টার ফুয়েল ট্যাঙ্কে চিনি ঢুকিয়ে বরবাদ করে দিয়েছে ফ্যাভেলের 'ইন্টেলিজেন্স উইং'।

*

দুপুর দুটো। ইম্পিরিয়ালের ছাতে দাঁড়িয়ে আছে রানা ও জ্যাকবসন। জ্যাকবসন চোখে দূরবীন লাগিয়ে আকাশ দেখছে। ঘণ্টাখানেক আগে প্রথমে ছোট এক টুকরো মেঘ দেখা দিয়েছে, বাড়তে বাড়তে তা এখন দক্ষিণ দিগন্তের অনেকটা ঢেকে ফেলেছে। পলকা, ভঙ্গুর মেঘ। একটু একটু করে বাড়ছে বিস্তৃতি।

গরম অসহ্য হয়ে উঠছে। বাতাস এখনও স্থির। সূর্যকে ঘিরে রেখেছে সাদাটে একটা বৃত্ত—ভয়ঙ্কর বিপদের পূর্বাভাস।

দূরবীন নামিয়ে রানার দিকে তাকাল বিশেষজ্ঞ। আরেকদিকে তাকিয়ে আছে ও, অন্যমনস্ক। চোখের কোণ আর কপাল কুঁচকে আছে। জ্যাকবসনের নড়াচড়া টের পেয়ে ঘুরল। 'কেমন বুঝছ?' প্রশ্ন করল দূরাগত কণ্ঠে।

'ভাল নয়, রানা। সময়ের আগেই এসে পড়বে মনে হচ্ছে।'

'কতক্ষণ সময় আছে আর?'

'ঘণ্টাতিনেক, বোধহয়।'

রানার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ আরও গাঢ় হলো। 'শুরুটা কেমন হবে?'

'হঠাৎ করে বাতাস শুরু হবে, ঘণ্টায় কম করেও ষাট মাইল বেগে।'

'ক্লাড একইসঙ্গে...'

'না। ঘণ্টাখানেক পর। শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত মেঘ এখন ভারী হতেই থাকবে, বাতাসও বাড়তে থাকবে একটু একটু করে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জ্যাকবসন। ক্রিস্টিনার খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত। খারাপ লাগছে মেয়েটার কথা ভেবে। কোথায় কি অবস্থায় আছে কে জানে! 'নিচে যাবে? ফ্যাভেলকে জানানো দরকার।'

খবর শুনে চমকে উঠল বিদ্রোহী নেতা। ইভ্যাকুয়েশন ফোর্সকে তক্ষুণি নির্দেশ পাঠাল কাজ দ্রুত শেষ করতে। পুব আর পশ্চিমের আর্টিলারি ইউনিটসহ শহরে অপেক্ষমাণ সমস্ত প্রাইভেট সৈন্যকে তিনটে থেকে রিট্রিট শুরু করতে খবর পাঠানো হলো। পিছিয়ে সিটি স্কয়ারে আসতে হবে সবাইকে, ওখানে তাদের জন্যে ট্রুপ ক্যারিয়ার অপেক্ষা করবে।

কাজের গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল এডওয়ার্ড।

করোগেটেড আয়রনের বেড়ার গায়ের ছোট্ট এক ফুটোয় চোখ রেখে বসে আছে ক্রিস্টিনা। কি চলছে বাইরে, দেখার চেষ্টা করছে। মিসেস জোনসের বাঁশির মত তীক্ষ্ণ গলার একটার পর একটা অভিযোগ কানেই তুলছে না।

ধরা পড়ে আতঙ্কে জান উড়ে গিয়েছিল ওর। রানার পিস্তলটা তখন সঙ্গে ছিল না, খুব দ্রুত গর্ত ছেড়ে উঠে পড়তে হয়েছে বলে ওটা আনার কথা ভুলেই গিয়েছিল। তবে ভাগ্য ভাল, যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে বলে ভয়ে সিটিয়ে ছিল ও, সেরকম কিছু ঘটেনি। ধরা পড়ার সাথে সাথে ওদের দায়িত্ব নিয়েছে বয়স্ক এক কর্নেল, বাগান পাহারাদারদের একটা ঘরে এনে আটকে দিয়েছে। তা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগে। কর্নেল এমনকি ওদের জন্যে একজন গার্ডও বসায়নি ঘরের বাইরে, শেক দরজার বাইরের বোল্ট লাগিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজে চলে গেছে।

বাঁচার কম চেষ্টা করেনি তখন ওর সঙ্গী মহিলা। কর্নেলের সাথে সমানে চেঁচিয়েছে। বিশ্রী গালাগালি করে তার ভূত ভাগাবার বহু চেষ্টা করেছে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছে গলার জোরে, লোকটাকে হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে—সে এক আমেরিকান, তার সাথে এ ধরনের আচরণ করার পরিণতি ভবিষ্যতে খুব খারাপ হবে ইত্যাদি বলে। ভাগ্য ভাল কর্নেল ইংরেজি বোঝে না, তাহলে এত হুমকি-ধামকি, নোংরা গালাগালির পরিণতি কি হত কে বলতে পারে?

বাইরে সেনাবাহিনীর ট্রাক একটার পর একটা স্টার্ট নিচ্ছে, পেট বোঝাই করে চলে যাচ্ছে দ্রুত। চারদিকে একটা গমগমে ভাব, কি চলছে বুঝতে পারছে না ক্রিস্টিনা। একসময় মহিলার বক্‌বকানি অসহ্য হয়ে উঠতে ঘুরে তাকাল ও। 'দোহাই লাগে একটু চুপ করুন,' ত্যক্ত কণ্ঠে বলল। 'আপনি কি চান ওরা কেউ এসে গুলি করে মুখ বন্ধ করুক আপনার? যে ভাবে বিরক্ত করছেন, তাতে ওরা তাই করবে যে কোন সময়।'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল তার। হুপ্ করে মুখ বুজে ফেলল। অবশ্য বেশিক্ষণের জন্যে নয়। 'এ অসহ্য! দেশে ফিরে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানাতে হবে ব্যাপারটা,' বলল সে অনেকটা পরিস্থিতির অসহায় শিকারের অভিযোগের মত।

'যদি ফিরতে পারেন!' দাঁতে দাঁত চাপল ক্রিস্টিনা। 'যদি পারেনও, মনে রাখবেন দিমিত্রিওসকে খুনের দায়ে আপনার নামে অভিযোগ আনব আমি। আপনার গাধামির জন্যে শুধু শুধু মরতে হয়েছে মানুষটাকে।'

চোখ কুঁচকে উঠল মহিলার। 'বলছ কি তুমি, বাছা! আমেরিকান হয়ে আরেক আমেরিকানকে ফাঁসাবে?' ঢোক গিলল।

'হ্যাঁ, যদি আপনি আপনার চোয়াল বন্ধ না রাখেন।' একটু থামল ও। দিমিত্রিওস ভাল মানুষ ছিল, নিরীহ মানুষ। কত কষ্ট পেয়ে মরেছে বেচারী, ভাবতে পারেন? আপনিই খুন করেছেন তাকে। এত সহজে সে কথা ভুলব না আমি, মনে রাখবেন। দরকার হলে ওই অপরাধে যমের বাড়ি পাঠাব আপনাকে। কাজেই সাবধান, বুঝেশুনে কথা বলবেন।'

ভয়ে চেহারা শুকিয়ে গেল মহিলার, ঘরের এক কোণে সরে কুঁকড়ে বসে থাকল। চোখে পরিষ্কার আতঙ্ক। মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকাল ক্রিস্টিনা, নিজের আচরণে নিজেই বিস্মিত। জীবনে এই প্রথম কারও সাথে এত কড়া কথা বলল ও। একই অবস্থা বাইরের, সৈন্য নিয়ে একটার পর একটা ট্রাক চলে যাচ্ছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এখানে-ওখানে গল্প করছে সৈন্যরা, সিগারেট টানছে। এরাও যাবে, আশা করছে ক্রিস্টিনা, আস্তে আস্তে সবাই চলে যাবে। তারপর, যদি একটা চান্স পাওয়া যায়, যদি...

এক ঘন্টা পর, বাইরে সব ধরনের কোলাহল থেমে গেছে, কথাবার্তার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না বেশ কিছুক্ষণ থেকে। কাউকে দেখাও যাচ্ছে না। সবাই চলে গেল নাকি? খুব তেষ্টা পেয়েছে, কি করা যায়? হঠাৎ কনসালের কথা খেয়াল হলো ওর—কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? ধরা পড়েছেন? বন্দী করা হয়েছে, নাকি মেরেই ফেলা হয়েছে?

'আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে,' বলে উঠল মিসেস জোনস।

চমকে উঠল ক্রিস্টিনা, অবশ্য সামলে নিল পরক্ষণে। 'শাটাপ্!' সামনে একজোড়া পায়ের আওয়াজ উঠল। খুব সতর্ক। কে! দেখা যাচ্ছে না মানুষটাকে। অস্থির হয়ে উঠল ক্রিস্টিনা। ফুটোয় কান পাতল। কয়েক সেকেন্ড নীরবে কেটে গেল, আর কোন সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ একটা অস্ফুট গলা শোনা গেল, কেউ কোন প্রশ্ন করল হয়তো, পরমুহূর্তে জোর এক 'ঠাস!' আওয়াজ। তারপর কারও হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়ার শব্দ। বুকের রক্ত ছলকে উঠল ক্রিস্টিনার। তবে কি...

ভাবনা শেষ হলো না, ঝটাং করে দরজার বোল্ট টানল কেউ, ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা। খোলা দরজায় ঘর্মাক্ত ফুলারটনকে দেখে বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ওরা একসাথে। 'গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলেই একলাফে উঠে দাঁড়াল ক্রিস্টিনা। 'আপনি?'

'সময় নেই,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন বৃদ্ধ। 'তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে আমাদের। জলদি বেরোও, কেউ এসে পড়তে পারে যে কোন সময়।'

একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল ক্রিস্টিনা, মিসেস জোনসের দিকে ফিরেও তাকাল না। ফুলারটনও না। মুহূর্তে বাগানের ভেতর ঢুকে পড়লেন ক্রিস্টিনার হাত ধরে টানতে টানতে। হাঁসফাঁস করতে করতে তাদের পিছন পিছন ছুটল মহিলা, এখনও বুকের সাথে চেপে ধরে আছে হাতব্যাগটা।

নয়

সময়মত পিছিয়ে আসতে শুরু করল বিদ্রোহী বাহিনী। জয় হয়েছে ভেবে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে সমস্ত সমরনীতি গুলে খেয়ে ফেলল সেরারিয়ের, নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে একেবারে খোলামেলা মাঠে বেরিয়ে এসে তাড়া করল ওদের। এমন সুযোগ ছাড়া মহাবোকামি হবে মনে করে ঘুরে দাঁড়াল ফ্যাভেলের আর্টিলারি ইউনিট, মেতে উঠল হত্যার নেশায়।

এক ধাক্কায় কম করেও পাঁচশো সৈন্য হারাল প্রেসিডেন্ট। তখনই তার খেয়াল হলো যে আর্টিলারি শক্তি বলে কিছু নেই তার। যেটুকু ছিল আগের দিন বিদ্রোহীরা তা দখল করে নিয়েছে। তবে আশা ছাড়ল না সে, কারণ সাত হাজারেরও বেশি সৈন্য আছে হাতে। শত্রু বড়জোর হাজার খানেক। সংখ্যার বলে বলীয়ান হয়ে এগোনো অব্যাহত রাখল সে। নগর প্রান্তে কষ্টেসৃষ্টে পৌঁছতে পারলে বাড়িঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করবে ভাবছে, শত্রুর আর্টিলারি অকেজো করে দেয়ার একটা সুযোগ আসবে তাহলে। তারপর ফ্যাভেলের ক্ষমতায় বসার সাধ জন্মের মত ধুলোয় মিশিয়ে দেবে সে।

মুখোমুখি যুদ্ধে এত অল্প সৈন্য নিয়ে প্রায় সাত গুণ বড় এক মারমুখী বাহিনীর মোকাবিলা করা চরম বোকামি, বিদ্রোহী ইউনিটের অধিনায়ক জানে তা। তবু ঘাবড়াল না। বোঝে, আরেকটু পিছাতে পারলে সে-ও বাড়িঘরের আড়াল পাচ্ছে। সরকারী বাহিনী শহরে ঢুকে নিজেদের ঠিকমত গুছিয়ে নেয়ার সুযোগ পাওয়ার

আগেই শেলিং করতে করতে যথেষ্ট দূরে সরে যেতে পারবে তার দল। অসুবিধে নেই, প্রচুর গোলাবারুদ আছে এখনও। তাছাড়া তাদের অস্ত্রশস্ত্রও সব অত্যাধুনিক, অটোম্যাটিক। সরকারীগুলোর মত মান্ধাতা আমলের নয়।

জুলিও ফ্যাভেল যখন সেরারিয়েরের সাথে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার সিদ্ধান্ত নেয় মাস তিনেক আগে, তখন ইটালি থেকে আমদানি করা হয়েছে এসব অস্ত্র, গোলাবারুদ। এডওয়ার্ড এবং হেনরি এসব পেতে সাহায্য করেছে তাকে। গত সাত বছর ধরে এ কাজ করে আসছে তারা। আন্তর্জাতিক অস্ত্র চোরাচালানি।

কাজেই নিশ্চিন্তে চালিয়ে যেতে থাকল অধিনায়ক। ঠিক শহরে ঢোকার মুখে সমস্ত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার ফন্দী আঁটল সে দুটো সম্ভাবনার কথা ভেবে। এতে প্রথম কাজ হবে শত্রু আগুনের জন্যে বাড়িঘরের ভেতরে আশ্রয় নিতে পারবে না, দ্বিতীয় কাজ, আগুন আর ধোঁয়ার আড়াল পাবে তারা। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পিছু হটার গতি দ্রুততর করা যাবে।

ওদিকে জেনারেল ওকাচা সুযোগ পেয়েও নড়েনি জায়গা ছেড়ে। সেরারিয়েরের মত গর্দভ নয় সে, ঘটে খানিকটা হলেও বুদ্ধি রাখে। শত্রু ইউনিট হঠাৎ রিট্রিট করতে শুরু করায় সন্দেহ জন্মাল তার, তৎক্ষণাৎ ওদের পিছু না নিয়ে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। চারটার দিকে যখন মনে হলো আর্টিলারির হুঙ্কার যথেষ্ট দূরে সরে গেছে, নামতে শুরু করল সে পাহাড় থেকে। তার সৈন্যসংখ্যা আট হাজার। যে এক হাজারকে ক্যাপ সারাত ঘেরাও করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল, মার্কিন মেরিনরা বিনা নোটিশে ঘাঁটি ছেড়ে সরে পড়ায় বেকুব হয়ে ফিরে আসে তারা। কাছে বলে ভিড়ে যায় ওকাচা বাহিনীর সাথে। সমতল ভূমিতে নেমে এল ওকাচা।

অভিযান শুরু করার জন্যে তৈরি। ওদিকে তখন সেইন্ট পিয়েরের এ-প্রান্ত দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসের গতি বেশ বাড়ছে, রাস্তায় পড়ে থাকা কাগজপত্র উড়ছে। চাপ খেয়ে কাত হয়ে পড়েছে আগুনের শিখা, ভয়াবহ পড়পড় আওয়াজ করছে।

পুরো আকাশ অন্ধকার।

চারটা। কলাবাগানের বড় এক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ক্রিস্টিনা। কনসাল ও মিসেস জোনসও পিছন পিছন নির্ভয়ে এল। সরকারী বাহিনী যে অংশে ছিল, তার উল্টোদিকে এসে গা ঢাকা দিয়ে ছিল ওরা দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা।

উপায় ছিল না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে ক্রিস্টিনার যা মনে হয়েছে, ঘটনা আসলে তা ছিল না। এলাকা ছেড়ে যায়নি সরকারী বাহিনী, রাতের নিরাপদ আশ্রয় থেকে খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন ওদের, মাইলদুয়েক পশ্চিমে। ঝোপের আড়ালে বসে এতক্ষণ ব্যাটাদের কার্যকলাপ দেখেছে তারা। ভেবেছে না জানি কি করতে যাচ্ছে ওকাচা বাহিনী, কিন্তু দেখা গেল উল্টো। উঁচু এক রিজের আড়ালে বসে প্রায় সারাদিন ফ্যাভেলের আর্টিলারির হাত থেকে গা বাঁচিয়েছে, নড়ার সুযোগও পায়নি। এখন অবশ্য নেই ওরা। একটু আগে শেষ সৈন্যটাও পাহাড় ছেড়ে নেমে পড়েছে, পরিষ্কার দেখা গেছে সব এখান থেকে।

এখনও দেখা যাচ্ছে, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে হেঁটে শহরের দিকে যাচ্ছে। আরও সামনে, আকাশ কালো হয়ে আছে ধোঁয়ায়।

'আগুন লেগেছে মনে হয়?' বলে উঠল মিসেস জোনস।

'লেগেছে না লাগানো হয়েছে, কে জানে?' সিগারেট ধরানোর ফাঁকে ফুলারটন বললেন। একটু ভেবে ক্রিস্টিনার দিকে ফিরে মৃদু হাসি দিলেন। 'মনে হয় লাগানোই হয়েছে। কাজটা ফ্যাভেলের।'

'কেন আগুন লাগাবে ফ্যাভেল?' প্রশ্ন করল ও। চেহারা বিষণ্ন।

'এতক্ষণ ভাবছিলাম বিদ্রোহীরা কেন এত গোলা নষ্ট করছে সরকারী বাহিনীর ওপর, শত্রু তো মরছে না একজনও। মনে হয় তার একটা জবাব পেয়েছি এখন।'

চোখ কুঁচকে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছে ক্রিস্টিনা। 'কি সেটা?'

'ফ্যাভেল জানতে পেরেছে হারিকেনের খবর,' হাসি মুখে ওর কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। 'হাসো, মাই চাইল্ড! মাসুদ রানা দেখা করতে পেরেছে লোকটার সাথে, খবরটা বিশ্বাস করাতে পেরেছে।'

'কি করে বুঝলেন?'

মাথা দোলালেন কনসাল। 'বুদ্ধি খাটাও; তুমিও বুঝবে। সারাদিন এই যে এত গোলা খরচ করে গেল বিদ্রোহীরা, কেন? সরকারী বাহিনীকে এখানে বসিয়ে রাখার জন্যে। কথা নেই বার্তা নেই চলে গেল কেন ওরা? নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার জন্যে।' ঘড়িতে টোকা দিলেন তিনি। 'ক'টা বাজে দেখেছ? হারিকেনের হিট করতে আর বেশি দেরি নেই। ফ্যাভেলের বাহিনী রিট্রিট করে উত্তরে যাচ্ছে, চাইছে এরা ওদের অনুসরণ করে সমতলে নেমে যাক্। বুঝলে কিছু?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ও। চিন্তিত।

'খুব সহজ ব্যাপার। বিদ্রোহীরা পাহাড়ে উঠে নতুন করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেবে, এরা ওপরে যেতে চাইলে বাধা দেবে।'

চোখ বড় বড় হয়ে উঠল মেয়েটির। 'আপনি...বলতে চাইছেন ফ্যাভেল এদের বন্যার পানিতে চুবিয়ে মারার...ওহ্, গড!'

'এইতো দেখি বুঝেছ।' সিগারেটে লম্বা টান দিলেন বৃদ্ধ। 'দূরে কোথাও থেকে সারাদিন ভারী শেলিঙের আওয়াজ এসেছে, খেয়াল করেছ?' ওকে মাথা দোলাতে দেখে বললেন, 'খুব সম্ভব এদের অন্য ব্যাটেলিয়ানকে আর কোথাও একই কায়দায় আটকে রেখেছিল ওরা। এখন সে আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না, তার মানে ওরাও সরে পড়তে শুরু করেছে।'

মাথা ঝাঁকাল অন্যমনস্ক ক্রিস্টিনা, আনন্দে চোখের কোণ শিরশির করছে ওর। মাসুদ রানা সত্যিই পেরেছে? এবারও তাহলে একরোখা মানুষটার জয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত? বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল তার। কে জানে ওদের খোঁজ না পেয়ে কতখানি অস্থির হয়ে আছে রানা, কত দুশ্চিন্তায় আছে।

'মাসুদ রানার সাফল্যে আমি গর্বিত, জানো?' বললেন বৃদ্ধ। 'সেরারিয়েরের মত ক্ষমতালোভী নির্বোধের মরাই ভাল। তার ভালর জন্যেই সেদিন...' গলা কেঁপে গেল। 'ছেলেটাকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে এমন মার মেরেছে ওরা, এত অপমান করেছে, আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল দেখে। ওর মত একটা ছেলে

যদি থাকত আমার! এমন জেদী, একরোখা, কর্তব্যপরায়ণ ছেলে...'

'শুনেছি ওরা আপনাকেও মেরেছে।'

'একটা-দুটো গুঁতো-ধাক্কা মেরেছে অবশ্য, তার বেশি নয়। আমার বরাদ্দ মারও ও সেধে খেয়েছে আমাকে আড়াল করতে গিয়ে।' একটু বিরতি দিলেন। 'সেই অপমানের প্রতিশোধ রানা নিতে পেরেছে বলে আমি খুশি হয়েছি। খুব খুশি হয়েছি। ওর জন্যে প্রার্থনা করব আমি। মানুষের জন্যে এত যার দরদ, অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে যে নিজের জীবনের পরোয়া করে না, তার জন্যে প্রার্থনা করব না তো কার জন্যে করব?'

নীরবে আকাশ দেখলেন তিনি, বুকে বাতাসের ধাক্কা খেয়ে বুঝলেন এবার গর্তের কাছে যাওয়ার সময় হয়েছে। সুযোগটা সময়মত এসেছে বলে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। মাসুদ রানা ও ফ্যাভেল নামে দুই ভাগ্য নিয়ন্তাকেও ধন্যবাদ জানাতে ভুল হলো না তাঁর।

'চলো, ওপরে যাওয়া যাক,' ক্রিস্টিনাকে বললেন মৃদু গলায়। 'বেচারী দিমিত্রিওসকে কবর দিতে হবে। খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে মানুষটা।' দীর্ঘশ্বাস মোচন করে মহিলার দিকে তাকালেন। কেউ কথা বলছে না তার সাথে, দেখেও দেখছে না, তাই মন ভার। 'আপনিও চলুন,' সহজ, স্বাভাবিক ভাবে বললেন।

ক্রিস্টিনার কাঁধে ভর দিয়ে এগোলেন বৃদ্ধ। দেহ-মনের ওপর দিয়ে আজ অনেক বড় ধকল গেছে, পরিস্থিতি মনের জোর প্রায় পুরোটাই শুষে নিয়েছে। ওদের মুক্ত করতে যে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়েছেন বৃদ্ধ, এই বয়সে তা মানায় না তাঁকে।

সব শুনে ক্রিস্টিনার মনে হয়েছে, এত সাহস ওর নিজের হত কিনা সন্দেহ। দিন হওয়া সত্ত্বেও পালাননি কনসাল, গা ঢাকা দিয়ে ওদের ওপর নজর রেখেছেন দূর থেকে। যখন দেখা গেল সবাই সরে গেছে জায়গা ছেড়ে, মাত্র একজন সৈন্য ওদের পাহারায় আছে, পা টিপে টিপে এগিয়েছেন। বুকের ধড়ফড়ানি পাত্তা দেননি। আসার পথে কলাগাছ ঠেকা দেয়ার মোটা এক ডাল কুড়িয়ে এনেছিলেন, গার্ড লোকটাকে গাছের সাথে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দেখে কাছে গিয়ে মাথায় এক বাড়িতে ঘুমটা আরও গভীর করে দিলেন।

বিপদমুক্ত হওয়ার পর ভয়ঙ্কর সেই স্মৃতি মনে করে বহুবার কেঁপে কেঁপে উঠেছেন বৃদ্ধ। সময়ে যে কাউকে একটা চড় মেরে দেখেনি জীবনে, অসময়ে তার এত সাহস আর শক্তি কোত্থেকে এল, কনসাল নিজে যেমন সে প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাননি, ক্রিস্টিনাও তাই।

'ছেলেটার সাথে তোমার বন্ধুত্ব কতদিনের, মাই চাইল্ড?' সস্নেহে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'চার বছরের।'

'তার মানে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ তোমরা, তাই না?' মেয়েটিকে মাথা দোলাতে দেখে আবার বললেন, 'দেশে ফিরে প্রথম চান্সেই বেঁধে ফেলো ওকে। এমন স্বামী লাখেও একটা পাবে না তুমি।'

তা হওয়ার নয়, দীর্ঘশ্বাস মোচন করে মনে মনে নিজেকে শোনাল ক্রিস্টিনা।

মাসুদ রানা ওরকম কোন বাঁধনে বাঁধা পড়ার নয়।

'তোমার মনও রানার মত নরম,' আনমনা কণ্ঠে বললেন কনসাল। 'দিমিত্রিওসকে ওরা যখন গুলি করল, তুমি খুব কেঁদেছ। আমি দেখেছি। কেঁদে কেঁদে ওকে আর বেয়োনেট চার্জ না করার জন্যে সবাইকে অনুরোধ করে বুক ভাসিয়েছ, অথচ লোকটা তোমার প্রায় অচেনা।' একটু থেমে মাথা ঝাঁকালেন। 'তোমাদের দু'জনের জুটি মানাবে ভাল।'

বিকেল চারটা। বাতাসের বেগ ক্রমে বাড়ছে, রাস্তা থেকে ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে সবকিছু। ঘন মেঘের ব্যস্ত আনাগোনা আরও বেগ পেয়েছে, উত্তরে ছুটছে। শহরের আগুনের শিখাও উত্তরে হেলে আছে, খাড়া হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। এক ঘর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে আরেক ঘরের ওপর চড়াও হচ্ছে। ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার, এটা-ওটা পোড়ার গন্ধে দম নেয়া দায়।

সেরারিয়েরের বাহিনী এগিয়ে আসছে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে, অবশ্য আগুন আর ধোঁয়ার কারণে গতি অনেক ধীর। কালো পর্দার আড়ালে বিদ্রোহীরা কামান তাক করে অপেক্ষা করছে কিনা, একটু পর পর ছোট ছোট পার্টি সামনে পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে তবে পা বাড়াচ্ছে মূল কলাম। যথেষ্ট পিছিয়ে পড়েছে তারা এই কারণে।

ফ্যাভেল বাহিনীর সে চিন্তা নেই, নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে চলেছে তারা।

এডওয়ার্ডের ল্যান্ড রোভারে চেপে হোটেল ছাড়ল ওরা—রানা, জ্যাকবসন, ফ্যাভেল, টিপার ও গাড়ির মালিক। বিরান শহরের মধ্যে দিয়ে হু-হু করে ছুটে চলল। রানা নীরব, চিন্তিত। এখনও কোন খবর পাওয়া যায়নি ওদের, গাড়িসহ চার-চারজন মানুষ একেবারে উধাও কি করে হয় ভেবে পাচ্ছে না। উত্তরে যাওয়ার কথা ছিল ওদের, নেগ্রিটোর উত্তর ঢালে গর্ত করে অপেক্ষা করার কথা ছিল, অথচ সেখানে পাওয়া যায়নি কাউকে।

বহুজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিন সাদা চামড়ার সাথে মারাকা ক্লাবের মালিককে দেখেছে কি না কেউ গতকাল। দেখেনি। কোথায় গেল ওরা ভেবে দিশা করতে পারছে না রানা। অবশ্য একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে আশার টিমটিমে আলো জ্বলছে মনে, সেটাকেই আরেকটু উস্‌কানোর চেষ্টা করছে। একটা সম্ভাবনার কথা হঠাৎ ওর মনে জেগেছে, সেটা হচ্ছে কনসাল হয়তো শেষ মুহূর্তে কোনমতে ক্যাপ সারাত পৌঁছতে পেরেছেন ওদের নিয়ে। সান ফের্নান্দেজ থেকে চলে গেছেন আমেরিকানদের সাথে। হতে পারে তা। একেবারে অসম্ভব নয়।

এখানে পড়ে থাকার চেয়ে ওটাকেই সবচেয়ে নিরাপদ ভেবেছে ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। সেরারিয়েরের অফিসারদের অনেকেই দিমিত্রিওসের খদ্দের—খাবার আর মাসোহারা দুটোই নিয়মিত পায়, হয়তো তাদের কাউকে ধরেপড়ে কোনরকমে বেজে যাওয়ার উপায় করে নিয়েছে লোকটা। হতে পারে উপায় ছিল না, তাই খবরটা ওকে জানিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে যেতে পারেনি।

আর যাই হোক, এক কথায় উড়িয়ে দেয়ার মত নয় এ সম্ভাবনা। তবু, কিছুটা

খুঁতখুঁতে ভাব এখনও আছে রানার মনে। ক্রিস্টিনাকে কয়েক বছর ধরে চেনে ও, জানে ওর ব্যাপারে মেয়েটি কী ভীষণ দুর্বল। সে ওকে এমন স্বার্থপরের মত হুট করে ছেড়ে চলে যাবে, চিন্তা করা আসলেই একটু কঠিন। তারওপর আবার ওরই চাপে পড়ে এ দেশে আসতে হয়েছে রানাকে, অনেক জরুরী কাজ ফেলে। শ্রাগ করে চিন্তার ইতি টানতে চাইল ও–প্রাণ বাঁচাতে মানুষ কত কিছুই তো করে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। এ ক্ষেত্রেও হয়তো তাই ঘটেছে। জ্যাকবসনের সাথে এ নিয়ে কথা হয়েছে রানার, সম্ভাবনাটা ওরও মনে ধরেছে।

পথের পাশে একটু পরপর তিনটে লাশ দেখে বিস্মিত হলো বিশেষজ্ঞ। তিনজনই পুরুষ, সাধারণ। 'এরা কারা?' প্রশ্ন করল সে।

'পাবলিক,' বলল ফ্যাভেল।

'কিভাবে মারা গেছে?'

শ্রাগ করল লোকটা। 'বোধহয় আমার লোকদের হাতে।'

'মানে! কি বলছেন এসব?'

সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। একঘেয়ে সুরে বলল, 'কয়েক ঘণ্টার নোটিশে কোন শহর জনশূন্য করতে হলে কত কি করতে হয়, সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে, মিস্টার জ্যাকবসন?'

জবাব দেয়ার মত কথা খুঁজে পেল না ও। সামান্য যেতে না যেতে আরেকটা লাশ চোখে পড়ল, এটা এক যুবতীর। ফুলের প্রিন্টওয়ালা ড্রেস পরা, মাথায় হলুদ ব্যানডানা, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ভাঙাচোরা পুতুলের মত। যেন মন উঠে গেছে বলে খেলা শেষে ফেলে রেখে গেছে কোন ছোট মেয়ে। ড্রেস কোমর পর্যন্ত উঠে আছে তার, থেকে থেকে বাতাস পেয়ে ফুলে উঠছে ঢোলের মত। নিচে কিছু পরা নেই। তাড়াতাড়ি মুখ নিচু করল জ্যাকবসন। রিয়ার ভিউ মিররে দেখে ফেলল তা বিদ্রোহী নেতা। এক হাত সীটের র‍্যাকে রেখে ঘুরে তাকাল।

'এসবের জন্যে মনে মনে হয়তো আমাকেই দায়ী করছেন আপনি, আসলে তা কিন্তু নয়। আমি, আপনি, আপনার বন্ধু, সবাই সমান দায়ী। চমকে উঠলেন তো? ভেবে দেখুন, আপনার আছে জ্ঞান, আমার আছে ক্ষমতা। হারিকেনের কথা আপনি যদি না জানতে পেতেন, মিস্টার রানা এসে আমাকে না জানাতেন, এর কিছুই ঘটত না। আমি খবরটা জেনে ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে শহর খালি করেছি। কাজটা সহজ ছিল না।'

'তাই বলে মানুষ মারতে হবে?' বলল জ্যাকবসন। রানা বাইরে তাকিয়ে আছে।

চেহারা খানিকটা কঠোর হলো ফ্যাভেলের। 'কোনরকম পূর্ব প্রস্তুতির বালাই ছিল না, কোন প্ল্যান ছিল না, আবহাওয়ার পূর্বাভাসও ছিল না। তারওপর সবাই জানে সান ফের্নান্দেজে হারিকেন হয় না। এই অবস্থায় এত সংক্ষিপ্ত সময়ে কাজটা সম্ভব করার কোন উপায় ছিল না এছাড়া। মানুষকে লাশ দেখিয়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য করেছে আমার লোকেরা। এসব মৃত্যুর জন্যে আপনি যদি কাউকে দায়ী করতে চান, তাহলে প্রেসিডেন্ট সেরারিয়েরকে করুন। মিস্টার রানা তাকে জানাতে গিয়েছিলেন, কানে তোলেনি সে।'

গলা নিস্তেজ হয়ে এল বিশেষজ্ঞের। 'কত মানুষ মারতে হয়েছে?'

'কে জানে?' সামনে ঘুরে বসল সে। 'এই হিসেব না করে কত হাজার মানুষকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করা গেছে, সে হিসেব করলে হত না? বিশ হাজার? ত্রিশ...না চল্লিশ হাজার? পরে দেখব হিসেব করে।'

'আরও অন্তত পনেরো হাজার মানুষ হত্যা করতে যাচ্ছেন আপনি, জুলিও ফ্যাভেল,' বলে উঠল মাসুদ রানা। 'হয়তো এখনও সময় আছে...'

'এখন? সরি, এখন সে কথা চিন্তা করাও পাগলামি। ও হ্যাঁ, রিট্রিট করার যে সহজ পরামর্শটা দিয়েছিলেন, সে জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এত সহজ, অথচ কার্যকর পথ অমন চট্ করে আপনার মাথায় এল কি করে, চিন্তা করলে ভারি অবাক লাগছে আমার। সত্যি।'

সিগারেট ধরাল সে। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এখন স্বয়ং ঈশ্বরেরও ক্ষমতা নেই সেরারিয়েরকে রক্ষা করে। ওরা তো পরের কথা, আমরাই এখন ভালয় ভালয় শেল্টারে পৌঁছুতে পারি কি না, আমি তাই ভাবছি। যদি পারি, সেটা হবে আমাদের পরম সৌভাগ্য।'

ঝুঁকে ফ্লোরবোর্ডে ছাই ঝাড়ল সে। 'আমি ক্রিশ্চিয়ান, তবে বহু বছর হলো ধর্মচর্চা করার সুযোগ হয়নি। সময় পেলে মাঝেমধ্যে বাইবেল নিয়ে বসি,' আয়নায় রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'একসময় আপনাদের কোরানের ইংরেজি অনুবাদও পড়েছি। দুটোতেই একটা প্রাচীন কাহিনী আছে। আপনাদের মুসা নবী, বা আমাদের মোজেজ একবার অত্যাচারী মিশরীয় রাজাদের হাত থেকে বাঁচাতে একদল ইহুদী নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে পড়ল লোহিত সাগর। ওদিকে তাড়া করে আসছে রাজার সৈন্য।

'উপায় না দেখে তিনি তখন হাতের ছড়ি ছুঁইয়ে পানিকে বললেন দু'ভাগ হয়ে যেতে, ভাগ হয়ে গেল পানি, ওপারে চলে গেলেন তিনি সবাইকে নিয়ে। রাস্তা পেয়ে রাজার সৈন্যরাও তাড়া করে যাচ্ছিল, কিন্তু অন্য পারে পৌঁছে মুসা নবী সাগরকে বুজে যেতে নির্দেশ দিলেন। মিশরীয়দের প্রতিটা সৈনিক, ঘোড়া, রথ, তলিয়ে গেল পানির তোড়ে। ভেসে গেল।'

হাসি চওড়া হলো তার। 'পড়েছেন সে গল্প, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ।'

'দেখুন তাহলে, ঈশ্বরের নবীও প্রয়োজনে হাজার হাজার মানুষ মেরে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।' শ্রাগ করল সে। 'আমি তো অতি সাধারণ মানুষ।'

পাহাড়ের ওপরে পিল্ পিল্ করছে মানুষ। আশি গজ উচ্চতা থেকে ওপরদিকে দশ ফুট পর পর চার সারিতে আড়াআড়ি কয়েক হাজার গর্ত করা হয়েছে, মোটামুটি চার ফুট ডায়ার। কোন কোনটায় ছোটখাট আস্ত একটা পরিবারই আশ্রয় নিয়েছে। সাধারণ মানুষ, যারা প্রথম দিকে পৌঁছেছে, তাদের দিয়েও এ কাজ করিয়েছে ফ্যাভেলের বিশেষ বাহিনী। দূর থেকে দেখে ভয় হয় পাহাড় হয়তো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

তারপরও সবার জায়গা হয়নি। প্রচুর মানুষ ঘোরাঘুরি করছে, অনেকে

এখনও গর্ত খুঁড়ছে, নিজের আশ্রয় নিজে তৈরি করে নিচ্ছে।

'আর পনেরো মিনিট,' জীপ থেমে দাঁড়াতে বিদ্রোহী বাহিনীর এক অফিসার এগিয়ে এসে বলল। 'এরমধ্যে বাকি সবাইকে তুলে নিচ্ছি আমরা। তারপর ওদের ঠেকানোর কাজে হাত দেব।'

মাথা ঝাঁকাল ফ্যাভেল। ঘাড় তুলে ডানে-বাঁয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলো। 'ভালই হয়েছে কাজ। এত ভাল হবে ভাবিনি।'

এখানেও ধোঁয়া। ওর মধ্যে দিয়ে দক্ষিণের সাগর দেখার চেষ্টা করল রানা জ্যাকবসনের ইঙ্গিতে। বাতাসের তোড়ে ওদের বুক-পেট, বাহুর সাথে সেঁটে আছে শার্ট। পিছনদিক ফুলে উঠেছে, ফত্ ফত্ করছে। ট্রাউজারেরও এক অবস্থা, চুল টান টান হয়ে আছে পিছনদিকে। ওদের দেখে জারভিস কুপার এগিয়ে এল। লোকটাকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল ফ্যাভেল।

'আর দেরি নেই,' রানার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল জ্যাকবসন। না চ্যাঁচালে শোনা যায় না, বাতাস টান মেরে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

তাকিয়ে থাকল ও। আগের সেই চকচকে ভাব নেই সাগরের, অপরিষ্কার দস্তার শীটের মত দেখাচ্ছে। অনেক নিচে নেমে এসেছে যেন দক্ষিণের আকাশ, সাগর ছুঁতে যাচ্ছে। খুব নিচু দিয়ে উড়ছে লোহাটে-ধূসর রঙের ভারী মেঘ, প্রচণ্ড বৃষ্টি আর গর্জনশীল বাতাস নিয়ে এগিয়ে আসছে। এরমধ্যেই সাঁঝের আঁধার নামিয়ে ছেড়েছে পাহাড়ে। বাতাসের ঝাপটায় চোখ খুলে তাকিয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল অল্পসময়ের মধ্যে।

কম করেও পঞ্চাশ মাইল বেগে বইছে এখন বাতাস, দমকার সময় ষাটে উঠে যাচ্ছে। কাঁধে টোকা পড়তে ঘুরল মাসুদ রানা—এডওয়ার্ড। পিছনে ইঙ্গিত করে ফ্যাভেলকে দেখাল, ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। 'ওপরে চলুন!' কানের কাছে মুখ এনে বলল সে। 'খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না, ফ্যাভেল ডাকছে।'

বেশি কষ্ট করতে হলো না, পিছন থেকে বাতাস প্রায় ঠেলে তুলে দিল ওদের। ওরা পৌঁছতে না পৌঁছতে বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে দেখল রানা। ব্যাপার বোঝার জন্যে ঘুরে নিচে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে এক সারি সরকারী সৈন্যের ওপর চোখ পড়ল। এখনও দূরে আছে যথেষ্ট, তবে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে। হালকা অস্ত্র নিয়ে অনবরত গুলি করছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গেল ফ্যাভেলের আর্টিলারি বাহিনী। নিচের গুহার সারির দশ-পনেরো ফুট নিচে আগে থেকেই তৈরি ছিল ভারী কামান, মিসাইল লঞ্চার ইত্যাদি। হেভি মেশিনগান, বাজুকা, শোল্ডার বোর্ন হালকা রকেটও আছে।

জলপাই রঙের ইউনিফর্ম পরা সরকারী সৈন্যের বড় একটা ঢেউ এগিয়ে আসছে। একটুপরই দ্বিতীয় ঢেউ দেখা দিল। বাধা দিল না ফ্যাভেল, আরও এগিয়ে আসার সুযোগ দিল ওদের। বাতাস খুব দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। শত্রুর অগ্রাভিযানের দিকে চোখ রেখে জ্যাকবসনের বাহু চেপে ধরল সে। ঘড়ি দেখল—প্রায় সাড়ে পাঁচটা। 'কোথায় আপনার ব্লাডি হারিকেন?' প্রশ্ন করল সে।

মুখ তুলে দক্ষিণ ইঙ্গিত করল ও। 'ওই যে আসছে, আর দেরি নেই। ওই যে মেঘ, ওগুলোকে বলে নিমবোস্ট্র্যাটাস আর ক্র্যাস্টোনিমবাস। বৃষ্টি আর বাতাস নিয়ে আসছে ওই মেঘ। সাগরের দিকে খেয়াল করুন। সাদা সাদা ফেনা দেখতে পাচ্ছেন? এর অর্থ ঢেউয়ের আকার আরও বাড়ছে।'

'আর কতক্ষণ? বাতাসের গতি কত অনুমান করতে পারেন?'

মাথা ঝাঁকাল জ্যাকবসন, চোখের সামনে এক হাত তুলে বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচার সংগ্রাম করছে। 'স্বাভাবিক ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন মাইল, দমকায় ষাট থেকে পঁয়ষট্টি হবে।'

ততক্ষণে চতুর্থ ঢেউ দেখা দিয়েছে সরকারী বাহিনীর। আরও আসছে, আরও। ওপর থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে দেখছে সবাই। প্রথম ঢেউটা পৌঁছে গেছে পাহাড়ের পায়ের কাছে, এখনই উঠতে শুরু করবে।

চেহারা শুকিয়ে গেল জারভিস কুপারের। কোনরকমে একটা ঢোক গিলে বলল, 'জিজাস! ওরা কত হাজার? ফ্যাভেল বসে আছে কেন এখনও?'

শহরের দিক থেকে ঠুস্ ঠাস্ গুলির শব্দ আসছে প্রায়ই। ধোঁয়াও বেড়ে গেছে অনেক। বোধহয় ঘরবাড়ি আর বাকি নেই, সবগুলোয় আগুন ধরে গেছে। প্রথম ঢেউ উঠে আসতে শুরু করল। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা হয়ে এঁকেবেঁকে উঠছে, জায়গা বদল করছে হঠাৎ হঠাৎ, মাঝে মধ্যে হাঁটুর ওপর বসে কয়েক পশলা গুলি ছুঁড়ছে। তবু নীরব ফ্যাভেল বাহিনী, পাল্টা গুলি ছোঁড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তাদের মধ্যে।

ওরা উঠে আসছে ঠিকই, কিন্তু দখিনা বাতাস পাশ থেকে প্রবল এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এরইমধ্যে। ইচ্ছেমত এগোতে দিচ্ছে না। কয়েকটা ক্যাপ উড়ে যেতে দেখল রানা, চার-পাঁচজন সৈন্য ভারসাম্য হারিয়ে গড়াতে শুরু করল। নেমে যাচ্ছে গড়িয়ে। ব্যস্ত হয়ে মাটি, ছোট ছোট আগাছা ধরে নিজেদের সামাল দিতে চেষ্টা করল, তবে কাজ হলো না। পতনের গতি সামান্য কমেই ফের দ্রুততর হলো। তবু এগোনো থেমে থাকল না। একশো ফুটমত উঠে এল ওরা।

তখনই শুরু হলো বিদ্রোহীদের আক্রমণ। প্রথমে রাইফেল, তার পরপরই মেশিনগান গর্জে উঠল। বাতাসের কারণে আওয়াজ নিচে না পৌঁছলেও বুলেট পৌঁছল জায়গামতই। প্রথম চোটেই কম করেও পঁচিশ-ত্রিশজনকে নিখুঁতভাবে মাঝখান থেকে কাটা পড়তে দেখল রানা—মেশিনগানের কাজ। ঠিক যেন ধারাল কাস্তের এক পোচে কেটে ফেলা হলো একগোছা গমের গাছ।

গুলির সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়তে লাগল ওরা। কেউ নিহত, কেউ আহত হয়ে, অনেকে আবার আড়াল নেয়ার আশায়। খোলা উপত্যকার কোথাও ওই জিনিসের অস্তিত্ব নেই যদিও। রানা খেয়াল করল, ফ্যাভেলের মেশিনগান শত্রুর সামনে ও পিছনে, নির্দিষ্ট দুই লাইন বরাবর গুলি ছুঁড়ছে, বুলেটের জালে আটকে সেলাইয়ের ফোঁড়ের মত গেঁথে ফেলছে শত্রুদের। এগোনো বন্ধ হয়ে গেছে ওদের আরও আগেই। উপায় নেই- সামনে এলে বুলেট, পিছনে গেলেও বুলেট।

দুই লাইনের মাঝে আটকে পড়া শত্রুর ওপর এবার দেদারসে মর্টার ও শেল

বর্ষণ করতে আরম্ভ করল বিদ্রোহীরা। হারিকেন আসছে, গোলাগুলির আর প্রয়োজন হবে না, সেই আনন্দে মনের সুখ মিটিয়ে খরচ করছে গোলাগুলি। শেলের আঘাতে মাটি কাঁপছে থরথর করে, গুঁড়ো মাটি ঝরনার মত লাফিয়ে উঠছে শূন্যে, পরক্ষণে বাতাসের প্রচণ্ড টান হাওয়া করে দিচ্ছে সেসব।

মাত্র পাঁচ মিনিট, তারপর থেমে গেল গুলি। প্রাণ বাঁচানোর এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করল না সরকারী সৈন্যরা, পিছনে সঙ্গীদের লাশের মেলা ফেলে রেখে দিশেহারার মত নিচের দিকে ছুটল। আবার শুরু হলো—রাইফেলের সিঙ্গল শট, মেশিনগানের ব্রাশ। এবার থামল প্রায় দশ মিনিট পর। যখন থামল, জলপাই রঙের ইউনিফর্মে ঢাকা পড়ে গেছে নেগ্রিটোর পায়ের কাছের বিরাট এক এলাকা। একজনও বেঁচে নেই প্রথম দলের। বাকি দলগুলো দূরে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এগোবার সাহস নেই।

কম করেও দেড় হাজার শেষ, গাল কুঁচকে নিচের খণ্ড-বিখণ্ড দেহগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবল মাসুদ রানা। ফ্যাভেলকে এ জন্যে দোষ দিতে পারল না, যে হারামজাদা কসাই সরকারী বাহিনীকে ঠেলে দিয়েছে সামনে, দোষ তার। এমন আহাম্মকের মত ফ্রন্টাল অ্যাটাক চালাতে কে নির্দেশ দিয়েছিল এদের? মুখ ঘুরিয়ে জ্যাকবসনকে দেখল ও। বিস্ফারিত চোখে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে সে, ঠোঁট কাঁপছে। সারা মুখে এক ফোঁটা রক্তও নেই।

'এখন যদি আবার আক্রমণ করে ওরা?' বলে উঠল লেখক। 'এরা যে হারে এতক্ষণ গুলি খরচ করেছে, স্টকে আর আছে কি না সন্দেহ।'

জ্যাকবসন নড়ে উঠল। এত ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যেও ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে দেখে বিস্মিত হলো রানা। 'আর গুলি করার দরকার হবে না,' ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল সে। 'যুদ্ধ শেষ।'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল রানা। ধূসর কুয়াশা ঘিরে ফেলেছে সেইন্ট পিয়েরে। মোচড় খাচ্ছে অনবরত। একেবারে কালির মত কালো হয়ে গেছে আকাশ, মেঘ এত নিচে নেমে এসেছে যে মনে হয় হাত বাড়ালেই বুঝি ধরা যাবে। দেখতে দেখতে ভয়াবহ হয়ে উঠল অবস্থা, বাতাসের ভয়ঙ্কর টানা হুঙ্কারে গায়ের সমস্ত পশম দাঁড়িয়ে গেল ওর।

'রানা, চলো!' ভীত গলায় ডাকল জ্যাকবসন। 'এক্ষুণি গর্তে ঢুকতে হবে।'

সরকারী সৈন্যরা যেখানে ছিল একটু আগে, সেদিকে একপলক তাকাল ও ঘুরে দাঁড়াবার সময়। কিচ্ছু দেখা গেল না, কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে জায়গাটা।

'চলো,' পা চালাল ও। বড় এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল হাতের উল্টো পিঠে—বেশ বড়। হঠাৎ চারদিক দিনের মত ঝলসে উঠল, ঘন-কালো মেঘের পুরু পর্দা চিরে জ্বলে উঠল ভয়ঙ্কর অশুভ এক হালকা নীলচে দ্যুতি—একই মুহূর্তে কানের তালা ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল। কেঁপে উঠল ধরণী। ভারী কামান গর্জনের মত গুম গুম আওয়াজ তুলে একটু একটু করে দূরে সরে গেল তার রেশ।

তারপর শুরু হলো বৃষ্টি।

সেইন্ট পিয়েরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত একটা ঘরও বাকি নেই তখন, সব জ্বলছে ফাত ফাত শব্দে। আকাশ লাল হয়ে আছে আগুনের রঙ মেখে। মাত্র

পনেরো মিনিটে নিভে গেল আগুন পানির তোড়ে।

প্রথম ঘণ্টায় বৃষ্টি হলো দুই ইঞ্চি। অসম্ভব বড় বড় ফোঁটা, বাতাসে উড়ে এসে খুদে একেকটা শ্র্যাপনেলের মত আছড়ে পড়ে। বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে ব্যথা লাগে, এমন অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম অর্জন করল রানা। নিজে ঝড়-বৃষ্টির দেশের মানুষ, ওসব সম্পর্কে কম জানে না। কিন্তু এমন কথা শোনেওনি কোনদিন। মুঠো সাইজের একেকটা ফোঁটা, এত জোরে এসে আছড়ে পড়ছে যে যেখানে পড়ে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানকার রক্ত চলাচল বন্ধই হয়ে যায়। অসাড় হয়ে থাকে জায়গাটা।

প্রথমে কিছুক্ষণ শিল ভেবেছিল ও, কিন্তু একটুপরই ভুলটা ভাঙল। দেখল গর্তের কিনারায় পড়ে খুদে বোমার মত বিস্ফোরিত হচ্ছে ওগুলো। ব্যাপার বুঝতে পেরে হাঁ হয়ে গেল ও, চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল। ধারণা হলো একেক ফোঁটা বৃষ্টির পানিতে স্টান্ডার্ড সাইজের চায়ের কাপ ভরে যাবে। অবশ্য বেশিক্ষণ দেখতে হলো না, গালে আর ঘাড়ে দু'ফোঁটা পানির ভয়ঙ্কর গোত্তা খেয়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও। মাথা গুঁজে ঝপ্ করে বসে পড়ল গর্তের তলায়।

ওর পাশে ব্যথায় ক্রমাগত গোঙাচ্ছে লেখক, চ্যাঁচাচ্ছে চাঁদি ফেটে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে বলে। মাথা নিচু করলে মুগুর পড়ে পিঠে, হাত দিয়ে মাথা ঠেকাতে গেলে হাতের বারোটা বাজে, সব মিলিয়ে মহাযন্ত্রণায় পড়েছে সে।

বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় নেচে-কুঁদে একাকার করছে। তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে, কিন্তু একই গর্তে থেকেও রানা বা জ্যাকবসন, কেউই শুনতে পাচ্ছে না তার গলা।

ওদিকে হুঙ্কার শুনে বাতাসের গতি অনুমান করার চেষ্টায় আছে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ। তার ধারণা এ মুহূর্তে কম করেও ফোর্স টুয়েলভ, অর্থাৎ অ্যাডমিরাল বিউফোর্টের আবিষ্কার বিউফোর্ট স্কেল অনুযায়ী পঁয়ষট্টি নট বা ঘণ্টায় চুয়াত্তর মাইল বেগে বইছে বাতাস। প্রতি স্কয়্যার ফুটে সতেরো পাউন্ড প্রেশার। উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। এখনই এই অবস্থা, আসল তো পড়েই আছে এখনও।

ম্যাবেলের সর্বোচ্চ বাতাসের গতি তার হিসেবে ঘণ্টায় একশো সত্তর মাইলে পৌঁছবে। তখন এই প্রেশার দাঁড়াবে একশো পাউন্ডেরও বেশি। ভাল স্বাস্থ্যের পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষকে অনায়াসে শূন্যে তুলে ফেলবে তখন বাতাস, উড়িয়ে নিয়ে যাবে যতদূর তার খুশি। বড়সড় একটা গাছ শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে পারবে, খাবলা মেরে খোলা মাঠের মাঝখান থেকে বড় বড় মাটির চাঙ তুলে নিতে পারবে, সেইন্ট পিয়েরের মত শহরের সমস্ত বাড়িঘরও ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে অনায়াসে।

বিকট গোঙানি বেড়েই চলেছে বাতাসের। একেবারে টইটম্বুর গর্তে বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছে ওরা তিনজন। যেদিকে ঢাল, গর্তের সেদিকটায় আধ হাতখানেক চওড়া করে ড্রেন কাটা আছে—মুখ থেকে তলা পর্যন্ত খাড়া। হড়হড় করে ফুল প্রেশারে পানি বের হচ্ছে ও পথে, তবু কমছে না একচুল। কানায় কানায় ভরে আছে। সবগুলো গর্ত থেকে সমান তোড়ে বের হচ্ছে পানি, উপত্যকা ধুয়ে প্রবল স্রোতে বয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে।

জ্যাকবসনের জানা আছে এ অবস্থা বেশিক্ষণ থাকবে না, গতি আরও খানিকটা বাড়লে বাতাস সারফেসের পানি উড়িয়ে নিয়ে যেতে শুরু করবে। সূক্ষ্ম স্প্রের মত উড়ে বেড়াবে পানি–সেও আরেক দেখার জিনিস। মিলিয়ন মিলিয়ন টন পানি গুঁড়ো হয়ে উড়বে শূন্যে।

বৃষ্টির পানিই হচ্ছে হারিকেন নামের দানবীয় শক্তির আসল চালিকাশক্তি। যে এলাকার ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তার প্রতি স্কয়্যার মাইলে গড়ে আধ মিলিয়ন টন করে ঝরে। ভেজা মাটি অবিশ্বাস্য তাপ ছড়ায় এ সময়ে, এই তাপ ঝড়ের পাক খাওয়ার বেগ আরও বাড়ায়।

ভয়াবহ, প্রচণ্ড ক্ষমতাধর এক টারবাইন ক্যারিবীয় অঞ্চলের হারিকেন। ম্যাবেল তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর–তিনশো মাইল বিস্তৃত অকল্পনীয় ক্ষমতাশালী এক উন্মত্ত তাণ্ডব। পথের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে রেখে যায়।

দিমিত্রিওস ম্যানোসকে মাটি চাপা দেয়ার কাজ সেরে উঠলেন কনসাল ফুলারটন, বেলচায় ভর দিয়ে হাঁপাতে লাগলেন ভীষণভাবে। সারা শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। ঠোঁট ফ্যাকাসে, কাঁপছে অল্প অল্প। এত ক্লান্তি, ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে।

কিন্তু কাজ শেষ হয়নি তাঁর, এখনও বাকি আছে কিছুটা। মেয়েদের নিরাপদ করতে হবে। গর্তে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে এখনই। বাঁ হাত-কাঁধ হঠাৎ করে অসাড় হয়ে আসতে আরম্ভ করেছে কেন? ভাবলেন বৃদ্ধ, বুকের বাঁদিকে চাপ চাপ অনুভূতি হচ্ছে কেন? মাথাও অল্প অল্প ঘুরছে। নিশ্চই পরিশ্রমের ফল, নিজেকে বোঝালেন তিনি। এই বয়সে…আর কত?

নিজের বেলচা ফেলে কাপড়ে হাত মুছল ক্রিস্টিনা, চোখ কুঁচকে বৃদ্ধকে দেখল। 'আপনার শরীর খারাপ লাগছে নাকি, মিস্টার ফুলার?'

'অ্যাঁ? না, খারাপ লাগছে না।' হাসলেন তিনি। 'আমার বাঁ পকেটে খানিকটা রাম আছে, বের করো তো?' কবরের দিকে তাকালেন। 'কাজটা শেষ করা গেছে, এখন এক ঢোক রাম পাওনা হয়েছে।'

কিন্তু বৃদ্ধের চেহারা দেখে তাঁর বক্তব্য মেনে নিতে ভরসা হলো না ওর। তবু কাছে এসে ছোট বোতলটা বের করল, ছিপি খুলে খানিকটা ঢেলে দিল বৃদ্ধের মুখে।

'ধন্যবাদ। তোমরাও খানিকটা করে খেয়ে নাও। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে, গা গরম রাখা দরকার এখন।'

নিচে, শহরমুখী রাস্তার দিকে তাকালেন ফুলারটন। আঁধার হয়ে আসায় ঝাপসা দেখাচ্ছে। তবে আঁধারের মধ্যেও কেমন যেন চাপা একটা আলোমত আছে, একটু লালচে–অনেকটা অল্প ওয়াটের বাতির মত। অশুভ লাগছে পরিবেশ।

বাতাস বাড়ছে, সমস্ত কলাগাছ উত্তরে মাথা হেলিয়ে পাতা দোলাচ্ছে। সপ্ সপ্ শব্দ উঠছে। শিউরে উঠলেন তিনি, বাতাসে ঠাণ্ডার মাত্রা বাড়ছে। 'গোলাগুলির শব্দ বোধহয় থেমে গেছে,' বললেন নিজের মনে।

মাথা ঝাঁকাল ক্রিস্টিনা। চেহারা বিকৃত হয়ে আছে, গলা বুক জ্বলছে রামের কড়া স্বাদে। 'হ্যাঁ। অনেকক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছে না।'

'এবার একটু বিশ্রাম নেয়া উচিত।'

'হ্যাঁ। চলুন, গর্তের কাছে গিয়ে বসি।'

'একটু দাঁড়াও।' বেলচা ফেলে সোজা হলেন কনসাল। 'এসো, দিমিত্রিওসের জন্যে প্রার্থনা করে যাই।'

বিড় বিড় করে কি সব বলছে যেন মিসেস জোনস, বিরক্ত হয়েছে বোঝা যায়। কাছে আসছে না। 'আপনি আসছেন?' বলল ক্রিস্টিনা।

চেহারা দেখে মনে হলো কড়া কিছু জবাব দিতে গিয়েও কি ভেবে নিজেকে সামলে নিল মহিলা, এগিয়ে এল। কপাল কুঁচকে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। মিনিট দুয়েক কেটে গেল নীরবে। প্রার্থনা সেরে বুকে ক্রস এঁকে ঘুরে দাঁড়ালেন কনসাল। 'চলো।'

গর্তের কাছে এসে ধপ্ করে বসে পড়লেন, আর চলছে না দেহ, হাত-পা একযোগে বিদ্রোহ করে বসেছে। দু'ঠোঁট আরও ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে, বাঁ দিকের আড়ষ্ট ভাব বাড়ছে। বুকের চাপটাও। তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ক্রিস্টিনা।

'ঘাবড়িয়ো না,' ওর চোখে উদ্বেগ দেখে বললেন তিনি। 'এ কিছু নয়। বুড়ো হয়েছি তো, বেশি পরিশ্রম সয় না।'

'এত ঘাম...?'

'ওই যে, বললাম না?' হাসির ভঙ্গি ফুটল ফুলারটনের মুখে। তবে ওটা যে অনেক কষ্টে ফোটানো, বুঝতে দেরি হলো না ওর। তিনিও বুঝলেন। ওর এক হাত মুঠোয় নিয়ে হালকা চাপ দিলেন। 'আমার হার্টের অসুখ আছে, সিরিয়াস কিছু নয় অবশ্য। একটু বিশ্রাম পেলেই সুস্থ হয়ে উঠব। চিন্তা কোরো না।'

আধ ঘণ্টা পর পুরোপুরি আঁধার হয়ে উঠল চারদিক। ঘন মেঘের ওদের মাথা ছুঁয়ে উড়ে যাওয়া দেখে বুক কেঁপে গেল ক্রিস্টিনার। যা আসছে, তা চলে যাওয়ার পর বেঁচে থাকবে তো ওরা?

বাজ পড়ার বিকট হুঙ্কারে কেঁপে উঠল সবাই।

তারপরই এল বৃষ্টি।

নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় লাগছে রানার। দুধের শিশুর মত, একেবারে কিছুই যার করার নেই। এত ভয় আর কিছুতে পায়নি ও, এতবড় বিপদেও কখনও পড়েছে কি না সন্দেহ আছে তাতে।

কত-শত বিপদে যে জীবনে পড়েছে, কত ভয়ঙ্কর সব শত্রুর মোকাবিলা করেছে, অজস্রবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে, মরতে মরতে বেঁচে এসেছে দুর্দান্ত সাহস, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি, আর অনমনীয় হার না মানার মানসিক শক্তিবলে, তার কোন লেখাজোখা নেই। ভয় প্রত্যেকবারই পেয়েছে, কখনও অসহায়ও মনে হয়েছে, কিন্তু ওসবের সাথে আজকের কোন তুলনাই চলে না। ম্যাবেলকে খোলা জায়গায় বসে মোকাবিলা করতে গিয়ে ওর কেবলই মনে হচ্ছে ওসব ছেলেখেলা

ছিল। নিতান্তই হাস্যকর ছেলেখেলা।

আজই প্রথম সত্যিকার উপলব্ধি করতে পারছে রানা বিপদ কাকে বলে। কাকে বলে ভয় পাওয়া। ক্যাপ সারাতে, ইম্পিরিয়ালে, এই বিপদ সম্পর্কে জ্যাক কি কি বলেছে ভোলেনি ও কিছুই। সবই মনে আছে। কিন্তু শুনে শুনে মনে ম্যাবেলের যে ছবি ও কল্পনায় ধরে রেখেছিল, তার তুলনায় এই ম্যাবেল বহু-বহু গুণ ভয়ঙ্কর। অকল্পনীয়, অচিন্তনীয়, অবিশ্বাস্য।

ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত বসে আছে ও। মনে হচ্ছে যেন কয়েক যুগ হয়ে গেছে, তবু কমার লক্ষণ তো নেই-ই, বরং তেজ আরও বাড়ছে ঝড়ের।

কনুই দিয়ে জ্যাকবসনের পাঁজরে মৃদু গুঁতো মারল জারভিস কুপার গলা ফাটিয়ে বলল, 'আর কতক্ষণ চলবে?'

ওর কালো কাঠামোটা ঘুরল, মাথা এগিয়ে এল লেখকের দিকে। 'কি?'

'আর কতক্ষণ চলবে?'

'এখনও তো শুরুই হয়নি!' সে-ও চ্যাঁচাল প্রাণপণে। 'আরও আট ঘণ্টা!'

'ওরে বাবা! তারপর?'

'কিছু সময়ের রেস্ট।'

'তারপর?'

'আবার শুরু হবে। দশ ঘণ্টার ধাক্কা। অন্যদিক থেকে আসবে।'

'অ্যাঁ!' পরপর কয়েকটা হার্ট বীট্ মিস হলো তার, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল, যেন কঠিন মানসিক আঘাত পেয়েছে। 'আরও খারাপ হবে অবস্থা?'

মাথা দোলাল জ্যাকবসন। 'অবশ্যই! অনেক খারাপ হবে। খারাপ হওয়া তো শুরুই হয়নি।'

বৃষ্টির আঘাত থেকে মাথা আড়াল করে রানা ভাবল, ইয়া মাবুদ! এরচেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে?

ঘড়ি দেখে হতাশ হলো ও—মাত্র সাতটা। আকাশের দুর্ভেদ্য অন্ধকার চিরে বেশ ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তবে বাজ পড়ছে কি না বোঝার উপায় নেই, আওয়াজ আসছে না নিচ পর্যন্ত, এতই গতি পেয়েছে ঝোড়ো বাতাস। জ্যাকবসন পরিবর্তনটা টের পাচ্ছে, বুঝতে পারছে বাতাস ক্রমেই তীক্ষ্ণ, ধারাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে। যন্ত্রপাতি ছাড়া বোঝার উপায় নেই এখন ঠিক কত মাইল বেগে বইছে, তবে এ-ও ঠিক, পুরানো দিনের বিউফোর্ট স্কেলের সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই।

কুপারের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে কি না, প্রশ্নটা খেয়াল হতে আপনমনে শ্রাগ করল জ্যাকবসন। প্রকৃতির এই ভয়াবহ তাণ্ডবের শক্তি সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই মানুষটার। যদি তাকে জানানো হয়, ম্যাবেলের মধ্যে এখন একটা পারমাণবিক বোমা ফাটানো হলেও কারও বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না, এনার্জির কণাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, সব বেমালুম গিলে খেয়ে ফেলবে ম্যাবেল, হয়তো বিশ্বাস করবে না সে, হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সেটাই আসলে সত্যি।

ম্যাবেল শক্তিশালী, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চাইতে বহুগুণ গতিসম্পন্ন ঝড়ও হয় মাঝেমধ্যে। রেকর্ড আছে সেসবের। মাউন্ট ওয়াশিংটনে একবার এক

ঝড় রেকর্ড করা হয়–বাতাসের গতি ছিল দুইশো একত্রিশ মাইল। গতি আরও বেড়েছিল, কিন্তু ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় ইন্সট্রুমেন্ট অকেজো হয়ে পড়ে বলে পরেরটুকু আর জানা যায়নি। তারপর আছে টর্নেডো।

টর্নেডোর বাতাসের গতির সঠিক মাত্রা ধরার মত যে দুয়েকটা যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে, আসল সময়ে দেখা গেছে সেগুলো তেমন কাজে আসে না। বিশ্বাস করা কঠিন, তবে সে ঝড়ের যেগুলো খুব বেশি শক্তিশালী, তার কোন কোনটার বাতাসের গতি ঘণ্টায় ছয়শো মাইলেরও বেশি হয়। এক ইঞ্চি পুরু কাঠের তক্তা ফুটো করে বেরিয়ে গেছে শুকনো খড়, এমন ঘটনাও ঘটে টর্নেডোয়–রেকর্ড আছে।

তবে টর্নেডোর আকার হয় ছোট, আক্রমণ করে অল্প জায়গার ওপর। তার সাথে হারিকেনের তুলনা করতে গেলে ফাইটার আর বম্বারের দৃষ্টান্ত টানা যেতে পারে। প্রথমটা প্রচণ্ড গতিশালী, দ্বিতীয়টা ধীর। ধ্বংস ক্ষমতা বম্বারের মত ব্যাপক। টর্নেডো বা অন্য যে কোন ঝড়ের চাইতে হারিকেন অনেক বেশি শক্তিশালী। '৫৩ সালে ভয়াবহ এক হারিকেন আটলান্টিক অতিক্রম করে ইংল্যান্ডের উত্তরে আছড়ে পড়েছিল, বাতাসের টানে নর্থ সী-র পানি প্রায় পুরোটা তুলে নিয়ে ফেলেছিল ইস্ট অ্যাংলিয়ার ওপর। হল্যান্ডের শহর রক্ষা বাঁধ পর্যন্ত তলিয়ে যায় পানির তোড়ে।

একশো বছরের ইতিহাসে সেটা ছিল ইওরোপের সবচেয়ে বড় হারিকেন।

মাঝরাতের একটু পর ম্যাবেল তার সর্বোচ্চ গতির শিখরে উঠল।

বাতাসের এত গর্জন, এত হুঙ্কার, শুনতে শুনতে সবাই যেন বধির হয়ে গেছে ওরা। মনে হচ্ছে কয়েক লক্ষ আহত সিংহ একযোগে আর্তনাদ করলেও এত আওয়াজ হবে না। ক্ষণে ক্ষণে গায়ের পশম উঠে দাঁড়াবে না ভয়ে। প্রকৃতির দানবীয় গোঙানি মনের জোর বলে কিছুই আর বাকি রাখেনি, শুষে নিয়ে ছোবড়া বানিয়ে ফেলেছে সবাইকে।

এখন আর বড় ফোঁটার বৃষ্টি নেই, আগেই থেমে গেছে। পড়ছে, তবে অণু সাইজের গুঁড়োর মত। বাতাস নিচের সমস্ত পানি তুলে নিয়ে গেছে টান মেরে–মিলিয়ন মিলিয়ন টন পানি সূক্ষ্ম স্প্রের মত মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একশো মাইলেরও বেশি গতিতে। বিদ্যুতের ঝলসানি মুহূর্তের জন্যেও বিরতি দিচ্ছে না, নীলচে দ্যুতিতে মোটামুটি ভালই দেখা যায় চারদিক। ভয়ে ভয়ে ওপরে তাকাল মাসুদ রানা, ভেবেছিল নিশ্চই দেখা যাবে নেগ্রিটোর মাথা নেই। ছিঁড়ে নিয়ে গেছে বাতাস। ভুলটা ভাঙতে হাঁপ ছাড়ল–আছে।

মাটির গভীরে শেকড় গেড়ে অটল গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়শ্রেণী। এর গায়ে মাথা কুটতে কুটতে একসময় শক্তি হারাবে ম্যাবেল, আহত হয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে যাবে তার জন্মস্থলে।

চোখের সামনেই কিছু একটা আছড়ে পড়তে দেখে চমকে উঠল ও। জিনিসটা বড়, ফ্ল্যাট–বিদ্যুতের আলোয় ক্ষণিকের জন্যে ঝলসে উঠল ওটা, শূন্যে তাসের মত পাক্ খেতে খেতে এসে আছড়ে পড়ল। গর্তের পাঁচ গজ দূরে পড়েই ফের

উঠে পড়ল, সাঁ করে চোখের আড়ালে চলে গেল। খুব সম্ভব করোগেটেড আয়রনের টিন, ভাবল ও।

গর্তের হাঁটু সমান থকথকে কাদার মধ্যে পড়ে আছে ওরা। আঠাল মাটি। শীতে কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। বাতাসে গায়ের কাপড় যত শুকাচ্ছে, তত বাড়ছে কাঁপুনি। বাতাসের তেজ পরখ করে দেখার জন্যে একবার গর্তের ওপর হাত তুলেছিল রানা ছয় ইঞ্চিখানেক, এত জোরে ছুটে গিয়ে আরেক পাশের দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে ওটা যে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠেছিল ও, ভেবেছে ভেঙে গেছে নিশ্চই। যদি ও বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে বসা না থাকত, তাহলে অবশ্যই ভাঙত।

এমনকি জ্যাকবসন পর্যন্ত ম্যাবেলের তাণ্ডব দেখে চরম বিস্মিত। সে-ও এতটা আশঙ্কা করেনি। পাঁচদিন আগে যখন প্লেনে চড়ে এই ঝড়ের কেন্দ্রে ঢুকে মোটামুটি নিরাপদে বের হয়ে আসতে পেরেছিল, পরোক্ষ একটু গর্ব অনুভব করেছে সে। নিজের বীরত্বের জন্যে নয়, মানুষ ওরকম ঝড়ে ঢুকে আবার বের হয়ে আসার মত বাহন সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে। কিন্তু উন্মুক্ত জায়গায় তারই মুখোমুখি হওয়া যে এত কঠিন, এত অসম্ভব হবে, কল্পনাও করেনি সে। এ অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। আজ প্রাণে বাঁচলে আরও পড়াশুনা করতে হবে এ নিয়ে, ভাবছে সে। প্রচুর পড়াশুনা করতে হবে।

দেহের সাথে মস্তিষ্কও ক্রমে অসাড় হয়ে পড়তে শুরু করল ওদের। ব্যাপারটা মস্তিষ্কের নিজেকে রক্ষা করার স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, ওটা নিজেই নিজের পরিচালক। অস্বাভাবিক কিছু সহ্য করার সীমা ছাড়িয়ে গেলে মস্তিষ্ক, দেহ, নিজেই তার বিরুদ্ধে নিজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। প্রকৃতির দেয়া ক্ষমতা এটা।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ফল হলো। এত শব্দ, এত গর্জন, বাতাস, সবকিছু ওদের পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশের মত হয়ে উঠল। ফলে এখন আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না কেউ। পাচ্ছে না মানে, পাচ্ছে, তবে অনুভব করতে পারছে না কিছু। ওদিকে অ্যাড্রেনাইল রক্ত পাম্প করা থামিয়ে দিয়েছে, ফলে শিথিল হয়ে আসতে শুরু করল দেহ। কাদামাটিতে নেতিয়ে পড়ে থাকল রানা, জ্যাকবসন, কুপার। অস্বাভাবিক তন্দ্রায় ঢুলতে লাগল।

ভোর তিনটে থেকে একটু একটু করে কমতে শুরু করল বাতাসের তেজ। ওদের অভ্যস্ত কান তক্ষুণি সনাক্ত করতে পারল ব্যাপারটা। বৃষ্টি বা স্প্রে, কোনটাই নেই। শুধু বাতাস। তারও সেই টানা গোঙানি নেই, হুঙ্কার নেই। আছে, থেমে থেমে, যেন দ্বিধায় পড়ে গেছে। ইতস্তত করছে। দমকা হয়ে এখনও মাঝে-মধ্যে গতি চড়ছে, তবে তার সাথে প্রতি মুহূর্তেই কমছে অল্প অল্প করে।

চারটের দিকে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। টলছে একটু একটু। ঘড়ির কাঁচের কাদা পরিষ্কার করে লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল। এখনও আকাশের দেখা নেই, কালিগোলা অন্ধকার চারদিকে। বিদ্যুতের ঝলসানি বেশ কমেছে, বজ্রপাতের আওয়াজ শোনা যায়।

'চলো,' জ্যাকবসনকে বলল ও। 'বাইরে কি অবস্থা দেখা যাক।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল বিধ্বস্ত বিশেষজ্ঞ। উঠে পড়ল দু'জন। দেখাদেখি লেখকও উঠল। এখনও যথেষ্ট জোর আছে বাতাসে, তবে উল্টোদিকে দেহের ভর

চাপিয়ে সামলে নিল ওরা। বিউফোর্ট স্কেলের চূড়ার কাছাকাছি আছে মাত্রা, ভাবল জ্যাকবসন। ওপরে পা রাখতেই রানার কৌতূহল সক্রিয় হয়ে উঠল, চারদিকের অবস্থা ঘুরে দেখার ইচ্ছে জাগল। বন্ধুর কানের কাছে মুখ নিয়ে কথাটা জানাতে রাজি হয়ে গেল সে খানিক ইতস্তত করে। কুপার পিছিয়ে গেল ভয় পেয়ে—সাহস হয় না।

তাকে অপেক্ষা করতে বলে বুকে হেঁটে ওপরদিকে চলল রানা ও জ্যাকবসন। একটু একটু করে। পিঠে চাপ দিয়ে বাতাস ঠেসে রাখল ওদের কাদার সাথে। যতই কমুক, বুঝল রানা, গর্তে আর খোলা জায়গায় এখনও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যত সহজ হবে ভেবে বেরিয়েছে, তত সহজ মনে হচ্ছে না এখন ব্যাপারটা। খোলা জায়গায় থাকলে এতক্ষণে পরিণতি কি হত ভেবে শিউরে উঠল রানা। কষ্টেসৃষ্টে বিশ গজের মত উঠে খানিকটা সমতল জায়গা পেয়ে থামল ওরা।

একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার উঠতে শুরু করল। প্রায় আধঘণ্টা পর চূড়ায় উঠল দু'জনে, কিছুক্ষণ খোলা জায়গায় শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে সাবধানে উঁকি দিয়ে ওপাশে তাকাল।

প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। তবে আওয়াজটা শুনতে পেল দু'জনেই। পানির শব্দ। ঢেউয়ের বাড়ি খাওয়ার শব্দ। ভুরু কুঁচকে জ্যাকবসনের দিকে তাকাল রানা, তাকে দেখবে বলে নয়, আওয়াজটা ভাল করে শুনবে বলে।

ঠিকই আছে, প্রথমবার যা শুনেছে, ভুল শোনেনি। পানিরই আওয়াজ। ঢেউ ভেঙে পড়ার আওয়াজ।

চোখ পিট্ পিট্ করে আবার তাকাল। আকাশ ঝলসে উঠল, সে আলোয় সামনের দৃশ্য দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে এল, দম বন্ধ হয়ে এল মাসুদ রানার।

নেগ্রিটোর দক্ষিণপাশে, ওদের বড়জোর দুশো ফুট নিচে খলখল, ছলছল আওয়াজ করছে পানি। উঠে এসেছে ক্যারিবিয়ান—আবর্জনা বোঝাই নোংরা পানির বুকে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে তার। বাতাস ঢেউয়ের ছিটকে ওঠা মাথার খানিকটা পানি তুলে এনে ফেলল ওদের নাকেমুখে। চেটে দেখল রানা—লোনা!

সেইন্ট পিয়েরের অস্তিত্বই নেই। সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে।

দশ

বেঁচে থাকার আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল ক্রিস্টিনা ম্যালোরি। 'বাতাস পড়ছে!' চেঁচিয়ে বলল। 'বাতাস পড়তে শুরু করেছে, শুনতে পাচ্ছেন?'

তন্দ্রায় ঢুলছিলেন কনসাল, লাল চোখ মেলে তাকালেন। চুপ করে শুনলেন কিছুক্ষণ। 'হ্যাঁ,' হাসি ফুটল তাঁর ফ্যাকাসে, চুপসানো মুখে। 'কমছে। বেঁচে গেলাম তাহলে এ যাত্রা।' সোজা হয়ে বসলেন।

'ওহ্, গড!' বলল ও। 'কখন বেরোতে পারব এই দোজখ থেকে? কিন্তু পায়ের যা অবস্থা, হাঁটতে পারব কি না জানি না। বসে থেকে থেকে পুরো অবশ

হয়ে গেছে, একটুও সাড়া পাচ্ছি না।'

মুখ তুলে আকাশ দেখছিল মিসেস জোনস, বলে উঠল, 'আর কোথাও গিয়ে বসা গেলে ভাল হত। কাদায় গা চুলকাচ্ছে আমার।'

'এখনই না,' কনসাল মাথা নাড়লেন। 'বাতাস আরও কমতে দিন, আলো হোক, তারপর দেখা যাবে।'

প্রায় দু'ঘণ্টা পর যথেষ্ট আলো ফুটতে কাদামাটি ঠেলে উঠে পড়ল ওরা। বাতাসের গতিও অনেক কমেছে। হাঁটতে খানিকটা জোর খাটাতে হচ্ছে বটে, তবে অসুবিধে হচ্ছে না। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত আঠাল, চটচটে কাদা ঠেলে চূড়ায় উঠে এল দলটা। নিচে তাকিয়ে চোখ কপালে উঠল প্রত্যেকের। চারদিকে থৈ-থৈ করছে পানি। এর মধ্যে অনেকটা নেমে গেছে অবশ্য। তবে কোন পর্যন্ত উঠেছিল, পাহাড়ের গায়ে লেগে থাকা জঞ্জাল দেখে বোঝা যায়। কম করেও পঞ্চাশ ফুট–অনুমান করলেন কনসাল।

অনেক নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে গ্র্যান নেগ্রিটো নদী। এমনিতে সরু, পাহাড়ী নদী। স্যান্টিগো বের সাথে গিয়ে মিশেছে। বন্যার পানির তোড়ে ফুলেফেঁপে ওটা এখন প্রায় পাঁচ গুণ হয়েছে পাশে–সীসার মত নোংরা পানি দুই কূল ছাপিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ধেয়ে চলেছে সাগরের দিকে।

পাহাড়ে জমা সমস্ত পানি সাগরে নামছে, স্রোতের ধাক্কায় দুই তীরের বড় বড় মাটির চাঙ হুড়মুড় করে ধসে পড়ছে ঘন ঘন। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়েও স্রোতের আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সবাই। সেইন্ট পিয়েরে যাওয়ার পথে আমেরিকানদের বসানো একটা বেইলি ব্রিজ আছে নদীর ওপর, পাড় যে হারে ভাঙছে, তাতে আর কতক্ষণ টিকবে ওটা বলা কঠিন।

'আরে!' বলে উঠল মিসেস জোনস। 'ওরা কারা?'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিচে, ডানে তাকালেন কনসাল ও ক্রিস্টিনা। বেশ কিছু লোককে পাহাড়ের ঢালে দেখা গেল এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে। 'এখানকারই হবে নিশ্চই,' বললেন ফুলারটন। 'হয়তো আমাদের মত গর্তে বসেছিল, বিপদ কেটে যেতে বেরিয়েছে।'

'প্ল্যান্টেশন ফার্মের কর্মচারী হবে বোধহয়,' মন্তব্য করল ক্রিস্টিনা।

'হতে পারে।'

'ভালই হলো,' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল মহিলার। 'আমি ওদের কাছে চললাম।'

চোখ কুঁচকে তাকাল ক্রিস্টিনা। 'মানে?'

'মানে তোমাদের দু'জনের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি আমি, তাই আর একসঙ্গে থাকার ইচ্ছে নেই। তাছাড়া খুব খিদে পেয়েছে আমার। এই জিনিসটা একেবারেই সহ্য করতে পারি না, তাই চলে যাচ্ছি।'

'বোকামি করবেন না। বিপদ সবে অর্ধেক কেটেছে, বাকি অর্ধেক আসছে। এখন নিচে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'তবু আমি যাচ্ছি,' মেয়েটি এগোতে যাচ্ছে দেখে ছিটকে সরে গেল মহিলা। কঠিন সুরে বলল, 'তুমি আমাকে বাধা দিতে পারো না। আমি যা খুশি তাই করব

এখন। তাছাড়া হারিকেন আবার আসবে, তোমাদের এই কথাটাও বিশ্বাস করি না। এমন আজগুবি কথা জন্মেও শুনিনি। তুমি মেয়েটা এ পর্যন্ত অনেক জ্বালিয়েছ আমাকে। সবকিছুতে আমাকে দায়ী করেছ, অনেক ত্যক্ত করেছ। আমি তোমার মায়ের বয়সী, আমাকে চড় পর্যন্ত মেরেছ। তোমার মত বয়স আর গায়ের জোর আমার থাকলে এসব করতে পারতে না তুমি। সে যাই হোক, আর থাকছি না আমি তোমাদের সাথে।'

ওকে আবার দু'পা এগোতে দেখে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে দ্রুত। পানিতে জুতো ভেসে গেছে, তাই খোঁড়াচ্ছে খালি পায়ে হাঁটার অভ্যেস নেই বলে। হাস্যকর ভঙ্গিতে হেলেদুলে ছুটছে। ক্রিস্টিনা তার পিছু নিতে যাচ্ছে দেখে ডেকে উঠলেন বৃদ্ধ, 'যেতে দাও, যেতে দাও! অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে ও, গেলে বাঁচি।'

'কিন্তু বিপদে পড়বে তো মহিলা!' দ্বিধা ফুটল ওর গলায়।

'মহিলা নিজেই তো এক চলমান বিপদের ডিপো। যাক্ না, গিয়ে বুঝুক ঠ্যালা কাকে বলে। তখন বুঝবে মজা।' হঠাৎ টলে উঠলেন তিনি, দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে পড়লেন এক খণ্ড পাথরের ওপর। 'ওফ্! খুব টায়ার্ড লাগছে।'

দ্রুত ভদ্রলোকের সামনে এসে দাঁড়াল ক্রিস্টিনা। 'কি হয়েছে?'

'তেমন কিছু না। মাথা ভার ভার লাগছে। মনে হয় ভেজা কাপড়ে বেশিক্ষণ বসে থাকার ফল।'

রিজের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। জ্যাকবসনও আছে সঙ্গে। দু'জনেই স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে শহরের দিকে। সদ্য ফোটা দিনের আলোয় ওদিকে যা দেখা যাচ্ছে, বিশ্বাস হতে চাইছে না ওদের কারও।

পানি এর মধ্যে অনেক নেমে গেছে বলে সেইন্ট পিয়েরের বুকের ধ্বংসের উৎকট চেহারা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। বাতাস একদম স্থির, কোথাও একচুল নড়ছে না পানি। সাধারণ ইঁটের তৈরি বাড়ি একটাও খাড়া আছে বলে মনে হয় না, অন্যসব সস্তা উপকরণের ঘরবাড়ি উধাও। ভিটে ছাড়া কোন চিহ্নই নেই ওসবের। ইম্পিরিয়াল হোটেলসহ কিছু আধুনিক কংক্রিটের ইমারত আর পুরানো আমলের পাথরের বাড়ি অক্ষত আছে। আর আছে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ। সরকারী সেনাবাহিনীর কোন চিহ্নই নেই।

জ্যাকবসন তাকিয়ে আছে অনেক উত্তরে, যেখানে কাল বিকেলেও ছিল ক্যাপ সারাত বেজ। ওটার চারশো ফুট উঁচু ল্যাটিস টাওয়ার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, পানির তলা থেকে টিলাটা কেবল জেগে আছে। 'বিশ্বাস করার মত নয়,' পকেট থেকে ওয়াটারপ্রুফ সিগারেট কেস বের করল রানা। জ্যাকবসনকে একটা দিয়ে লাইটার জ্বালতে ব্যাপারটা চোখে পড়ল। আগুনের লম্বা শিখা সম্পূর্ণ স্থির—একচুল পরিমাণও কাঁপছে না। সিগারেট ধরিয়ে বন্ধুর দিকে তাকাল। 'ঝড়ের চোখের মধ্যে আছি আমরা,' মন্তব্য করল ও।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল সে। 'একদম মাঝখানে। দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে ফের শুরু হয়ে যাবে। এবার ভারী বৃষ্টি হবে না। অবশ্য যদি চলার ওপর থাকে

ম্যাবেল। নইলে হবে।'

দু'হাতে কিছুক্ষণ কান ডলল রানা। 'কানে ব্যথা করছে।'

'আমারও। বাতাসের লো প্রেশারের জন্যে ব্যথা হচ্ছে। দম নিয়ন্ত্রণ করো, আস্তে আস্তে বাতাস ছাড়ো। সেরে যাবে।' হাত তুলে শহরের জমা পানি দেখাল সে। 'লো প্রেশারের জন্যে নামতে পারছে না পানি, নইলে অনেক আগেই মাটি জেগে উঠত। প্রেশার আর হিউমিডিটি, দুটোই লো। ওই দেখো,' মাটি ইঙ্গিত করল। 'বাষ্প উড়ছে। খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে মাটি।'

কাদামাটি-মাখা ভূতের মত চেহারা নিয়ে টিপার এসে দাঁড়াল ওদের পাশে। আতঙ্কের ছায়া এখনও পুরো দূর হয়নি দানবের চেহারা থেকে। 'টাই (জনাব) ফ্যাভেল আপনাদের ডেকেছেন,' বলল সে। 'নাস্তা রেডি।'

নেতার সাথে সহকারীরা থাকবে, তাই তার আশ্রয় তৈরি হয়েছে অন্য কায়দায়। মেঝে বাইরের দিকে সামান্য ঢালু রেখে ঘরের মত পাঁচ ফুট উঁচু এবং দৈর্ঘ্যে ও আড়ে আট ফুট করে পাশাপাশি কয়েকটা খুপরি তৈরি করা হয়েছে, মাঝে তিন ফুট দেয়াল রেখে। গোল ফোকর আছে দেয়ালে, ওর মধ্যে দিয়ে একটা থেকে আরেকটায় যাওয়া যায়। ছাত যাতে ধসে পড়তে না পারে সে জন্যে মোটা মোটা কাঠের বীম আর তক্তা দিয়ে ওপরের মাটি ঠেকিয়ে রাখার জন্যে সিলিঙও আছে।

যথেষ্ট নিরাপদ আয়োজন। ওদেরও এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু খোলা গর্তে থেকে হারিকেন পর্যবেক্ষণ করবে বলে আসতে রাজি হয়নি জ্যাকবসন্। রানাকেও তাই বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছে ওর সঙ্গে। কুপার ছিল স্রেফ অপরাধবোধ থেকে রেহাই পেতে। ওই অবস্থা হবে জানলে কস্মিনকালেও থাকত না।

নাস্তার ফাঁকে পরের ধাক্কা নিয়ে জ্যাকবসনকে নানা প্রশ্ন করল বিদ্রোহী নেতা। আজ বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে, সিগারেট টেনে চলেছে একটার পর একটা। জানাল, ঘণ্টাখানেক আগে পুব নেগ্রিটোয় এক রেজিমেন্ট সৈন্য পাঠিয়েছে সে অবস্থা দেখতে। ওকাচার জন্যে গতকাল ওদিকে যেতে পারেনি তার ইভ্যাকুয়েশন ফোর্স, তাই আজ পাঠিয়েছে ওখানকার মানুষজনকে সাহায্য করতে।

মানুষটার দূরদৃষ্টি আছে, ভাবল রানা। এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও সে কথা ভোলেনি। কোন সন্দেহ নেই, খুব অল্পদিনে জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠবে ফ্যাভেল। আধঘণ্টা পর বেরিয়ে এল ওরা, কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতে আবার ডাক পড়ল রানার। ওকে দেখে মৃদু হাসি ফুটল ফ্যাভেলের মুখে। 'আপনার জন্যে একটা সুখবর আছে।'

তার হাসি দেখে সন্দেহ হলো ওর, কিন্তু বিশ্বাস করতে ভরসা হলো না। 'কিসের সুখবর?'

'আপনার বান্ধবীর খোঁজ পাওয়া গেছে।'

'কোথায়!' বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

'পুবে, নেগ্রিটোয় আছে সে,' কাছে দাঁড়ানো এক সৈনিককে দেখাল। 'এ খবরটা জানাতে এসেছে।'

তাকে দেখল ও, দীর্ঘ দুই পদক্ষেপে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। খপ করে চেপে ধরল বাহু। 'কোথায় দেখেছ তাকে? দেখতে কেমন সে, চুলের রঙ কি, বয়স...' থেমে গেল রানা লোকটাকে অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকতে দেখে। খেয়াল হলো উত্তেজনার মাথায় ইংরেজিতে প্রশ্ন করে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

জ্যাকবসন এগিয়ে এল। 'আমাকে দেখতে দাও।' দুই মিনিট তার সাথে নেটিভ ফ্রেঞ্চে কথা বলে ঘুরল সে। 'এ নিজে ওকে দেখেনি, অন্যের মুখে শুনে জানাতে এসেছে। তবে বর্ণনা যা দিল তাতে মনে হয় ঠিকই আছে, ওটা ক্রিস্টিই।'

'ওকে জিজ্ঞেস করো কে কোথায় দেখেছে ওকে,' কর্কশ গলায় বলল রানা। 'জায়গাটা কোথায়।' আকাশের দিকে তাকাল। গম্ভীর হয়ে উঠল মেঘ দেখে। 'আর কত সময় আছে?'

'খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা, হয়তো।'

ফ্যাভেলের পাশে বসা এডওয়ার্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'গাড়ির চাবি দিন।'

ইতস্তত করতে লাগল যুবক। 'এই অবস্থায়...যাবেন?'

'প্লীজ!'

চাপা স্বরে ফ্যাভেল বলল, 'দিয়ে দাও।'

পাঁচ মিনিট পর, ম্যাপে নির্দিষ্ট জায়গাটা দেখে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'আমি যাচ্ছি।'

'দাঁড়াও,' ডেকে উঠল জ্যাকবসন। 'আমিও যাব।' দ্রুত ফ্যাভেলকে কিছু নির্দেশ দিল সে। ঘুরে রানাকে না দেখে এক দৌড়ে বেরিয়ে এল। পিছন পিছন খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ফ্যাভেল, এডওয়ার্ড ও টিপার। পাহাড়ের গা বেয়ে ল্যান্ড রোভারের এঁকেবেঁকে নেমে যাওয়া দেখছে।

'এ সময়ে যেতে দেয়া ঠিক হয়নি,' এডওয়ার্ড মন্তব্য করল। 'বিপদে পড়ে যেতে পারে ওরা।'

মুখ তুলে আকাশ দেখল ফ্যাভেল, ভুরু কুঁচকে উঠল। উত্তর আকাশে মেঘ জমেছে, বেশ দ্রুত ছড়াচ্ছে। 'বাধা দিলে মানত না মাসুদ রানা। যেতই। বিপদের ভয়ে ও যে বসে থাকার মানুষ নয়, সে কথা তুমিও জানো, আমিও জানি।' কি ভেবে মাথা ঝাঁকাল। 'চিন্তা নেই। ওদের জন্যে বেঁচে যাওয়া হাজার হাজার মানুষের অন্তরের কথা হানরাকেন বুঝবেন।'

ঘুরে দাঁড়াল নেতা। 'টিপার, সবাইকে জানিয়ে দিয়ে এসো বাতাস শুরু হলে যেন গর্তে ঢুকে পড়ে।'

রাস্তা মোটামুটি ভালই আছে দেখে ঝড়ের বেগে গাড়ি ছোটাচ্ছে রানা। কঙ্কালের হাড়গোড়ের মত রাস্তাই আছে শুধু সেইন্ট পিয়েরের, আর আছে ভিটে। মোড়ে মোড়ে টায়ারের বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলে বাঁক নিচ্ছে ল্যান্ড রোভার, গতি প্রায় কমাচ্ছেই না ও। প্রতিবার উল্টে পড়তে পড়তেও শেষ মুহূর্তে সামলে নিচ্ছে, যেন কোন অদৃশ্য দানবীয় হাত ধরে সোজা করে দিচ্ছে ওটাকে, পড়তে দিচ্ছে না।

একমনে ড্রাইভ করছে রানা, কথা প্রায় বলছেই না।

ভয়ে ভয়ে শক্ত হয়ে বসে আছে জ্যাকবসন, সাহস পাচ্ছে না কিছু বলতে রানা যে এ মুহূর্তে নিজের মধ্যে নেই, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তার। উল্কা বেগে শহর ছেড়ে সেইন্ট মিচেল রোডে পড়ল ওরা, এটা ক্যাপ সারাত যাওয়া রাস্তা। দু'পাশে উপড়ে পড়ে থাকা বড় বড় গাছ, লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া কলা আনারসের বাগান দেখে আফসোস হলো জ্যাকবসনের। মনে হচ্ছে মুগুরপেট করে মাটির সাথে সমান করে দেয়া হয়েছে সব। এই ধাক্কা সামাল দিতে বে কয়েক বছর লাগবে সান ফের্নান্দেজের। শহর ছেড়ে মিনিট পাঁচেক এগোবার প সোজা হয়ে গেল সে সামনের দৃশ্য দেখে।

ভয়াবহ আওয়াজের সাথে স্যান্টিগো বের দিকে ছুটে চলেছে গ্র্যান নেগ্রিটো প্রচণ্ড স্রোত, পাড় ভাঙতে ভাঙতে এত চওড়া হয়েছে যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় মাত্র দু'দিন আগে একে দেখে গেছে সে শীর্ণ, শান্ত। পাহাড় ধুয়ে নেমে আসা কাদায় ধূসর রঙ পেয়েছে এখন পানি, তার সাথে আছে খড়কুটো, ঘাস, কলা আর আনারস গাছ, হুড়মুড় করে ছুটছে ওর মধ্যে পাক্ খেতে খেতে। ছোটখাট সাগরই হয়ে গেছে নদীটা।

সেতু দেখে আঁতকে উঠল সে। একদিকে কাত হয়ে আছে, দু'মাথার মাটি মনে হয় আলগা হয়ে গেছে, দুলছে ওটা। খসে পড়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। পানি ছলাৎ ছলাৎ শব্দে বাড়ি খাচ্ছে তলায়।

'রানা, গাড়ি নিয়ে ব্রিজ পার হওয়া যাবে না,' বলল বিশেষজ্ঞ কোনরকমে। 'হেঁটে যেতে হবে।'

'এসো দেখি কি অবস্থা,' গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল ও। পায়ে পায়ে ব্রিজের দিকে এগোল। সত্যিই অবস্থা সুবিধের নয়। বেশ নাজুক হয়ে পড়েছে, এমনিতে এখনই হয়তো ধসে পড়বে না, কিন্তু ল্যান্ড রোভার যথেষ্ট ভারী। ওটার চাপ সহ্য করতে পারবে না হয়তো।

ঘুরে সাগরের দিকে তাকাল রানা। বেশ দূরে বলে বোঝা যায় না, তবে মনে হলো ঢেউ আছে। মাথায় সাদা ফেনাও, তার মানে বেশ বড় ঢেউ। আকাশের চেহারাও ভীতিকর–মেঘে ঢাকা পড়তে শুরু করেছে। ঢেউয়ের মত গড়াগড়ি করছে ধূসর মেঘ।

'দেরি করা ঠিক হবে না, রানা। গাড়ি রেখেই চলো, জোরে হাঁটলে জায়গামত পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'গাড়ি নিয়েই যাব আমি,' দৃঢ় গলায় বলল ও। 'ওপারে গাড়ি দরকার হতে পারে। তুমি হেঁটে পার হও।'

'না,' জবাব দিতে এক সেকেন্ড ইতস্তত করল জ্যাকবসন। 'একসঙ্গে যাব দু'জন।'

একটু একটু করে ব্রিজে উঠল গাড়ি, খানিকটা কাত হয়ে। সময় নষ্ট করল না রানা অবস্থা দেখতে গিয়ে, ফার্স্ট গিয়ারে এগিয়ে চলল ধীরগতিতে। ককিয়ে উঠল ব্রিজ, দোল অনেক বেড়ে গেছে। নিচে প্ল্যাঙ্ক সরে গেছে বোধহয় একটা, চড়াৎ শব্দে ফেটে গেল ওটা। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল ওদের, কলজে একলাফে গলার

কাছে উঠে এলেও থামল না রানা। গ্রাহ্য করল না ব্রিজের দুলুনি। যেদিকে কাত হয়ে ছিল, একটু একটু করে আরও খানিকটা সেদিকে ঝুঁকল গাড়ি, চাকা পিছলে যেতে শুরু করেছে, উল্টোদিকে হুইল ঘুরিয়ে প্রাণপণে সোজা রাখার কসরৎ করছে রানা।

আরেকটা চড়াৎ শব্দ হলো, আরও ইঞ্চি দুয়েক কাত হলো ল্যান্ড রোভার। প্রায় একই মুহূর্তে ওপাশের রাস্তা স্পর্শ করল সামনের দুই চাকা। চেপে রাখা দম ছেড়ে গতি খুব সামান্য বাড়াল রানা। তখনই আর্তনাদ করে উঠল ব্রিজ, ঝপ্ করে গাড়ির পিছনটা দেবে গেল। আত্মা উড়ে গেল, চট্ করে এক্সিলারেটর চেপে ধরল রানা। পিছনটা লাফিয়ে উঠল গাড়ির, টের পেল পিছনের চাকা ঘুরছে বন্ বন্ করে। এক সেকেন্ড শূন্যে ভেসে থাকল গাড়ির পিছন দিকটা, তারপর পথে আছড়ে পড়েই গোলার বেগে ছুটল।

কপালের ঘাম মুছে পিছনে তাকাল ওরা। নেই ব্রিজ–হাওয়া হয়ে গেছে। যেন ছিলই না কোনকালে।

'গেছে,' বিড় বিড় করে জ্যাকবসন বলল। 'ফ্যাভেলের কাজ বাড়িয়েছ।'

বড় একটা অক্ষত গাছের দিকে তাকাল ক্রিস্টিনা, বাতাসের টানে ওটার ডালপালা সোজা হতে শুরু করেছে, যেন হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে চাইছে। 'আমাদের এবার ওঠা দরকার,' খিদে তেষ্টায় কাহিল হয়ে পড়েছে ও, আওয়াজ বের হতে চায় না।

'হ্যাঁ। বাতাস বেশ বেড়েছে, চলো।'

ঘণ্টাখানেক আগে ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের গায়ে বড় এক ফাটল খুঁজে পেয়েছে ওরা। ঠিক হয়েছে এবার আর গর্তে নয়, ওখানেই থাকবে। ফুলারটনকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ক্রিস্টিনা, অবস্থা ভাল নয় বৃদ্ধের। চেহারা দেখে মনে হয় টানা ছয় মাস অসুখে ভুগে এইমাত্র উঠে এসেছেন বিছানা ছেড়ে। শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত, সংক্ষিপ্ত। কথা বলতে গেলে অল্পে হাঁপিয়ে পড়েন, ঘেমে ওঠে মুখমণ্ডল। চেহারার স্বাভাবিক রঙ হারিয়ে গেছে। সীসার মত রঙ পেয়েছে। চোখ গর্তে গেঁথে গেছে প্রায়।

হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর, বোঝা যায়। নড়াচড়া খুব ধীর।

ক্রিস্টিনার চেহারা দেখে হাসির ভঙ্গি করলেন কনসাল। 'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছ?'

'হ্যাঁ। অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার।'

'একটু একটু খারাপ লাগছে অবশ্য। বুড়ো হয়েছি তো, পাহাড়ে ওঠা-নামা, মাটি খোঁড়া, এত উদ্বেগ, সব মিলিয়ে কাহিল করে ফেলেছে, বুঝলে? ও ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা কোরো না।'

কিন্তু ক্রিস্টি মেনে নিতে পারল না বৃদ্ধের বক্তব্য, বরং চিন্তা আরও বাড়ল। অল্প সময়ের মধ্যে বাতাসের গতি অনেক বেড়ে গেছে দেখে তাড়াতাড়ি এগোতে চাইছে ও, কিন্তু কনসালের জন্যে হচ্ছে না। এখন আরও ধীর হয়ে পড়েছেন। কপালে স্বেদবিন্দু জমতে শুরু করেছে হাঁটার পরিশ্রমে।

ফাটল পর্যন্ত প্রায় এসে পড়েছে, এমন সময় চোখের পলকে ঘটে গেল

ব্যাপারটা। বড় একটা গাছ পেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েছে ওরা, আর আট-দশ পা গেলেই নিরাপদ আশ্রয়, এমন সময় পিছনে এক অপার্থিব চড় চড়, পট্ পট্ আওয়াজ উঠল। চমকে ঘুরে তাকাতেই চোখ কপালে উঠে গেল ক্রিস্টিনার। যে গাছটা ওরা এইমাত্র পেরিয়ে এসেছে, বাতাসের টানে উপড়ে পড়তে শুরু করেছে সেটা।

প্রথম ঝড়ের সময়ই গোড়া আলগা হয়ে গিয়েছিল, শেকড়ের সাথে আটকে ছিল কোনমতে, আর পারল না ঠেকাতে, দানবীয় শক্তিতে গোড়ার মাটিসুদ্ধ টেনে তুলে ফেলল ওটাকে বাতাস। কাত হয়ে ওদের ওপরই পড়ছে–ক্রিস্টিনা যখন ঘুরে তাকাল, তখন শেষ সময়। ডালপালা দিয়ে ওর মাথার ওপরের আকাশ প্রায় ঢেকে ফেলেছে গাছটা। একটা চিৎকার কেবল বের হলো গলা দিয়ে, 'সাবধান!' বলেই এক হাতে বৃদ্ধকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েই নিজেও সরে যেতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু সময় হলো না।

মাথায় মোটা এক ডালের বাড়ি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ক্রিস্টিনা, ডালটা পড়ল ওর দুই পায়ের ওপর, মাটির সাথে পিষে ফেলার জোগাড় করল ওকে। চোখের সামনে খুব দ্রুত পাক খেতে শুরু করল পৃথিবী, আঁধার হয়ে আসছে। ওর মনে হলো পা বোধহয় জন্মের মত গেছে–অসহ্য যন্ত্রণা। চোখের সামনে অনেক রঙের নাচানাচি, লাল, হলুদ, ফিকে। আশেপাশে প্রচুর ডালপালা পড়ল, আবছাভাবে টের পেল সে। তারপরই গাছের কাণ্ড।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলায় সে শব্দ অবশ্য শুনতে পেল না ক্রিস্টিনা।

ওদিকে তার ধাক্কা খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন বেসামাল ফুলারটন, হোঁচট খেয়ে কয়েক পা যেতে না যেতে পাশ থেকে আরেকটা ডাল ছুটে এসে তাঁর ডান বাহুতে আঘাত করল। স্রেফ উড়ে গেলেন বৃদ্ধ, আট দশ হাত দূরের একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। ব্যাপার তখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি।

আছাড়ের ঝাঁকিতে বুকের বাতাস সব বেরিয়ে গেছে, একটা অদৃশ্য হাত যেন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে হৃৎপিণ্ড। অক্সিজেনের জন্যে সংগ্রাম করতে লাগলেন বৃদ্ধ শুয়ে শুয়ে, নড়তে ভয় করছে। বেশ কিছুক্ষণ পর দম একটু সহজ হতে ধীরে ধীরে উঠলেন। গর্তের দেয়ালের জন্যে মেয়েটিকে দেখতে পেলেন না তিনি, কেবল ডালপালা চোখে পড়ছে।

'ক্রিস্টিনা! কোথায় তুমি?' জোরেই ডাকার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ, কিন্তু আওয়াজ বের হলো ক্ষীণ। বাতাসের জন্যে নিজেই ঠিকমত শুনতে পাননি। আরও কয়েকবার ডাকলেন, কিন্তু সাড়া এল না।

গর্তের কিনারা দেখা গেল বড়জোর তিন ফুট উঁচু, কিন্তু তাকেই হিমালয়ের মত বাধা মনে হচ্ছে। অনেক কষ্টে ওপরে উঠলেন তিনি, কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন দৃশ্য দেখে। বাতাসে প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছে গাছটার পাতা, তার ফাঁক দিয়ে নিথর মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে।

মরে গেছে! চমকে উঠলেন বৃদ্ধ, তাড়াতাড়ি এগোতে চাইলেন, কিন্তু বাতাস ঠেলে রেখেছে। একটু একটু করে এগিয়ে চললেন তিনি। গাছের অনেক কাছে পৌঁছে গেছেন, এমন সময় হঠাৎ ভীষণভাবে ঘুরে উঠল মাথা। থমকে গেলেন বৃদ্ধ,

দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড়—পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলেন সীমাহীন যন্ত্রণায়। দু'হাতে বুক চেপে ধরে হাঁটুর ওপর ধপ্ করে বসে পড়লেন। তাঁর মনে হলো, কে যেন আগুনে পোড়ানো টকটকে লাল, তীক্ষ্ণধার তরবারি দিয়ে বুকটা এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করে দিয়েছে।

প্রচণ্ড ব্যথায় আবার চেঁচিয়ে উঠলেন ফ্লোরটন, চিত হয়ে পড়ে গেলেন। বাতাস ঠেলে নিয়ে আবার সেই গর্তে ফেলল তাঁকে।

মাসুদ রানার মনে হলো প্রথমবারের সেই তেজ নেই এবারের ধাক্কায়। বৃষ্টির জন্যে হবে বোধহয়, ভাবছে ও, বৃষ্টির পরিমাণ অনেক কম এবার।

অনেকটা আচমকা এসে পড়েছে ম্যাবেলের দ্বিতীয় চোট, তাই বেশিদূর এগোতে পারেনি ওরা। পাহাড়ের পাশে একটা নিরাপদ জায়গায় গাড়ি রেখে ওপরে উঠে এসেছে। বাতাস বাড়ার আগেই গর্ত করে তৈরি হয়ে নিয়েছিল ফ্যাভেলের রেজিমেন্ট, তার একটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে ওদের জন্যে।

রেজিমেন্ট কমান্ডারকে খুঁজে বের করল রানা। একটু অবাক হলো তাকে দেখে, চেনা লোক। কাল ওকাচার বাহিনীর ওপর আর্টিলারি আক্রমণ এরই নেতৃত্বে চালানো হয়েছে। সে-ও বিস্মিত হলো। 'আপনি কেন এলেন কষ্ট করে? আমরাই তো চেষ্টা করছি!'

'কিসের কথা বলছেন?'

'আপনার বান্ধবীর কথা,' হাসল অফিসার।

বিস্মিত হলো রানা। 'বুঝলাম না।'

'মিস ম্যালোরি আপনার বান্ধবী না?'

'আপনি জানেন কিভাবে?'

অফিসারের হাসি চওড়া হলো। 'ফ্যাভেল বলেছে। আপনি তাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছেন, সে-কথাও বলেছে।'

অবাক চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল রানা-জ্যাকবসন। 'তাই নাকি?' বিশেষজ্ঞ বলল।

'সেই জন্যেই তো ফ্যাভেল তাকে খুঁজতে পাঠিয়েছে আমাদের। মিস ম্যালোরির খোঁজ পেয়ে খবর দেয়ার জন্যে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি আমি।'

'কে দিল খোঁজ?' রানা প্রশ্ন করল।

'এখানে কিছু ইন্ডিয়ান আছে, তারা বলেছে। আজ সকালে আপনার বান্ধবীকে তারা পাহাড়ে দেখেছে। চিন্তা করবেন না, ঝড় থামুক, খুঁজে বের করব তাকে আমরা। এখানকার মানুষদের শেল্টারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল, নইলে এতক্ষণে বের করে ফেলতাম।'

'তাহলে তো ফ্যাভেলকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত,' বলল ও। 'কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত এ জন্যে।'

'ধন্যবাদ!' বিস্মিত দৃষ্টিতে ওদের দেখল অফিসার। 'কৃতজ্ঞতা! কি বলছেন এসব, টাই মাসুদ রানা? আপনি···আপনারা দু'জন আমাদের ন্যাশনাল হিরো, আমরাই বরং কৃতজ্ঞ হব আপনাদের কোন উপকারে লাগতে পারলে।'

আবার শুরু হলো ম্যাবেলের ধ্বংসযজ্ঞ। সাগরের দিক থেকে ছুটে আসা প্রচণ্ড ঝড়ে আরেকবার তছনছ হলো সান ফের্নান্দেজ। বাতাসের গতি এবার মনে হলো যেন আগের চাইতে কম করেও দশ মাইল বেশি। কয়েক লাখ বৈদ্যুতিক হাতুড়ি যেন সগর্জনে একটানা দশ ঘণ্টা ধরে সমানে পিটিয়ে গেল নেগ্রিটো পাহাড়শ্রেণীকে।

এক সময় জ্যাকবসনের সন্দেহ হলো, বাতাসের গতি কম করেও দুশো মাইলে উঠেছে। আশঙ্কা জাগল ল্যাভপাইড না শুরু হয়ে যায়, মাটি ফেটে পানির ফোয়ারা না উঠতে শুরু করে। নেগ্রিটোর সর্বোচ্চ চূড়ার মাটি না উড়ে যায়।

এরকম শক্তির আর কয়েকটা হারিকেন যদি আঘাত করে–হতে পারে দশ-বিশ বছর, কি পঞ্চাশ বছর পর, অথবা একশো বছর পর ইতিহাসে ঠাঁই পাবে সান ফের্নান্দেজ। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে।

তাণ্ডব চালিয়ে যেতে থাকল ম্যাবেল, প্রচণ্ড আক্রোশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চষে বেড়াল দ্বীপ, ছোট ঘাস ছাড়া অবশিষ্ট সবুজের চিহ্ন প্রায় মুছে ফেলল সেইন্ট পিয়েরের। পাহাড়ে নিয়ে আসা হাজার হাজার গবাদি পশু মরল, গৃহস্থের পোষা ভেড়া-ছাগল, কুকুর, স্রেফ উড়ে চলে গেল। বুনো কুকুর নিজের গর্তে মাটি আর পাথর চাপা পড়ে মরল। বাসা ছেড়ে পালাতে হাজারে হাজারে পাখি আকাশে উড়াল দিল বটে, কিন্তু ওড়া আর হলো না। ডানা ভেঙে খড়-কুটোর মত বাতাসে ভেসে চলে গেল সাগরে।

আর মানুষ?

মোটামুটি ষাট হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল পাহাড়ে, সময়ের অভাবে সবার জন্য গর্ত খোঁড়া যায়নি। অনেক মানুষ মরল। আশ্রয়ে থেকেও অনেকে মরল শীতে, ভয়ে–কেউ কেউ বিভিন্ন দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে। শারীরিকভাবে দুর্বল শিশু আর বুড়োরা মরল বেশি। যাদের হার্ট দুর্বল, তারাও।

তারপরও ভাগ্য ভাল যে ষাট হাজারই মরেনি।

এগারোটার দিকে হারিকেন তার সর্বোচ্চ গতিসীমায় পৌঁছল, তারপর পড়তে শুরু করল বাতাস–খুব ধীরগতিতে। পরিস্থিতি ভিন্ন হলে দ্রুত কমত ঝড়ের বেগ, কিন্তু হারিকেনের চোখ যে এলাকার ওপর দিয়ে যায়, সেখান থেকে সহজে সরে না বাতাস, দীর্ঘ সময় ধরে চলে। তিনটের দিকে মোটামুটি নিরাপদ দেখে উঠে পড়ল রানা ও জ্যাকবসন। অবশ্য তখনও ঝুঁকিমুক্ত হয়নি বাইরে বেরনো।

অফিসারকে বলল রানা, 'আমরা আগে যাচ্ছি। আপনি বাতাস আরও কমলে লোকজন নিয়ে আসুন।'

'আপনারা যেতে পারলে আমরাও পারব,' বলে গর্ত ছাড়ল সে। তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল বাজিয়ে লোক জড়ো করতে লাগল।

বাতাসের সাথে ঘণ্টাখানেক লড়াই করে ক্যারিব ইন্ডিয়ানদের এক গ্রামে পৌঁছল ওরা। একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থা গ্রামের। চারদিকে আহতদের চিৎকার আর গোঙানি। যারা সুস্থ আছে, তারা ধরণীতে থেকেও যেন নেই–কেউ ফ্যাল ফ্যাল করে আকাশ দেখছে, কেউ লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করছে। এক

মহিলাকে দেখল রানা কোলে শিশু নিয়ে বসে আছে। মাথা অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝুলছে বাচ্চাটার, মরে গেছে। কিন্তু মায়ের সেদিকে খেয়াল নেই। পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে রেখেছে সে সন্তানকে।

প্রচুর ইন্ডিয়ান আছে নেগ্রিটোর এই অংশে। ওকাচার বাহিনীর জন্যে এ পর্যন্ত কাল আসতে পারেনি ফ্যাভেলের ইভ্যাকুয়েশন কর্মীরা। কোনরকমে যদি ম্যাবেলের খবরটা এদের জানানো যেত, মৃতের সংখ্যা অনেক কম হত সন্দেহ নেই। নিজেদের ব্যবস্থা এরা নিজেরাই করে নিতে পারত। এত লাশ, দেখে অসুস্থ হয়ে পড়ল জ্যাকবসন।

পিছনে ধুপ্ ধাপ্ পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল ওরা। অল্প বয়সী এক সৈনিক ছুটে আসছে। 'আমি এক ব্ল্যাঙ্ককে দেখেছি!' কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে।

'মেয়ে?' প্রশ্ন করল জ্যাকবসন। 'কোথায়?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'ওই যে রাইজ দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে আছে।'

সবটুকু শোনার ধৈর্য হলো না রানার, দৌড় দিল। বেশি দূরে নয় রাইজটা, এক দৌড়ে তিন মিনিটে পৌঁছে গেল ওরা। ওটার ওপাশে শ'খানেক ইন্ডিয়ানকে দেখা গেল, তাদের সাথে বসে আছে মিসেস জোনস। আশপাশে ক্রিস্টিনা আছে কি না ব্যগ্র চোখে খুঁজল রানা, নেই দেখে একটু হতাশ হলো। তাড়াতাড়ি মহিলার কাছে এসে দাঁড়াল। হাতে ওর স্পর্শ পেয়ে ঘুরে তাকাল সে, পরমুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। 'আরে! আপনারা?'

'ক্রিস্টিনা কোথায়?' বলল রানা। 'আর সবাই?'

চেহারায় রাগের আভাস ফুটল মহিলার। 'ওরা লোকটাকে মেরে ফেলেছে,' বলল স্বভাবসুলভ বাঁশির মত তীক্ষ্ণ সুরে।

শক্ত হয়ে গেল ও। 'কাকে?'

'গুলি করে মেরে ফেলেছে! বেয়োনেট দিয়ে বারবার...ও মাই গড্! রক্তে সব একাকার হয়ে...'

মহিলার হাত ধরে জোরে ঝাঁকি দিল রানা। 'কাকে মেরে ফেলেছে? ফুলারটন, না দিমিত্রিওসকে?'

'গ্রীক লোকটাকে,' বলে নিজের হাত উল্টেপাল্টে দেখল সে, যেন ওখানে রক্ত লেগে আছে। 'কিন্তু এজন্যে ওরা আমাকে দায়ী করেছে। অথচ আমার কোন দোষ ছিল না, আমি কিছুই করিনি। তবু আমাকে দায়ী করেছে...'

'কে দায়ী করেছে আপনাকে?'

'ওই শয়তান মেয়েটা!' ফুঁসে উঠল মিসেস জোনস। 'অসভ্য, অভদ্র মেয়েটা। বলেছে আমি নাকি তাকে খুন করেছি। অথচ আমি কিছু করিনি, সরকারী সৈন্যরা গুলি করে, বেয়োনেট দিয়ে মেরেছে লোকটাকে।'

'সে কোথায়?' জ্যাকবসন জানতে চাইল। 'ক্রিস্টিনা?'

'জানি না!' খেঁকিয়ে উঠল মহিলা। 'জাহান্নামে গেছে! হারামজাদী ছুঁড়ি আমার গায়ে হাত তুলেছে, তাই ওদের ছেড়ে চলে এসেছি আমি।'

পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো দুই বন্ধুর। রানা বলল, 'কি ঘটেছে সব

পরে শুনব, এখন বলুন মেয়েটা আর কনসাল, এঁরা কোথায় আছেন?'

'বলব না!' মুখ ঝামটা মেরে উঠল সে। 'ওদের···ওদের আমি ঘৃণা করি। ওঁরা অনেক···'

'মিসেস জোনস!' শীতল কণ্ঠে ডাকল রানা। ডাকটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে মহিলা তো বটেই, জ্যাকবসন পর্যন্ত কেঁপে উঠল। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল তার দেখতে দেখতে। 'কোথায় ক্রিস্টিনা?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ওকে দেখল সে কয়েক মুহূর্ত, ঠোঁট কাঁপছে। 'ওই···ওই ওদিকে। কলাগাছের বাগান আছে পাহাড়ের ওপাশে। তার একটু ওপরে।' আর জিজ্ঞেস করতে হলো না, নিজে থেকেই জায়গাটার পুরো বর্ণনা দিল মহিলা।

রেজিমেন্ট অফিসারের খোঁজে পিছনে তাকাল রানা। আসছে দলবল নিয়ে, তবে যথেষ্ট দূরে আছে এখনও। ওদের অপেক্ষায় না থেকে ছুটল ওরা দু'জন। পিছনে যান্ত্রিক আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল দৌড়ের ফাঁকে—কপ্টার। চারটে প্রকাণ্ড গঙ্গাফড়িঙের মত সামান্য কাত হয়ে উড়ে আসছে।

'মেরিন কপ্টার!' রুদ্ধশ্বাসে বলল জ্যাকবসন। 'কমোডর ফিরে এসেছেন।'

এগারো

একেবারে যা তা অবস্থা এদিকের। বড় বড় মাটির চাঙ উড়ে গেছে বাতাসে, দেখে মনে হয় কোদাল চালনায় নিপুণ কোন শিল্পীর কাজ, অনেক যত্নে কেটেছে। পক্স উঠেছে যেন পাহাড়ের। কলা বাগান সাফ। গাছ বেশিরভাগই নেই, গোড়ার মাটিসহ উড়ে গেছে। যা আছে সটান শুয়ে আছে।

অনেক বড় বড় গাছও পড়ে আছে। এত মাটি নিয়ে উপড়ে পড়েছে ওগুলো, দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। দূর থেকে এরকমই বড় এক গাছের মাথার দিকে একটা নড়াচড়া দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। দেখাদেখি জ্যাকবসনও থেমে পড়ল। 'কি হয়েছে?'

বোধহয় শুনতে পায়নি, চোখ কুঁচকে তাকিয়েই থাকল রানা। প্রথম দেখায় মনে হয়েছে বুঝি আহত, মুমূর্ষু কোন জন্তু বুঝি, বেঁচে থাকার সহজাত তাগিদে বুকে হেঁটে নিরাপদ কোথাও সরে যেতে চেষ্টা করছে। পরক্ষণে আঁতকে উঠল ও, সবেগে ছুটে গেল সেদিকে। বোঝায় কোন ভুল ছিল না রানার, ছিল দেখায়। জন্তু নয় ওটা—মানুষ। কনসাল ফুলারটন।

কাছ থেকে দেখেই বুঝল একেবারে শেষ অবস্থা বৃদ্ধের। চেহারা মরার মত ফ্যাকাসে, মাথার এক পাশ দিয়ে রক্ত পড়ে শার্ট-কোট ভিজিয়ে ফেলেছে। পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছেন হয়তো। মাটি খাবলে এগোবার সময় ডান হাত কোন কাজেই আসছে না তাঁর—সম্পূর্ণ প্যারালাইজড হয়ে গেছে ওদিকটা। কেবল বাঁ হাতের সাহায্যে কোনমতে এগোচ্ছেন ইঞ্চি ইঞ্চি করে।

পাশে বসে পড়ল রানা, পরম যত্নে শিশুর মত শোয়াল তাঁকে হাতের ওপর।

খুব ঘন ঘন দম নিচ্ছেন বৃদ্ধ, ছোট ছোট। একটুপর চোখ মেললেন, ঠোঁট নড়ে উঠল, কিন্তু শব্দ বের হলো না।

'শান্ত হোন,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'আর কোন ভয় নেই।'

আবার কিছুক্ষণ হাঁপালেন তিনি। তারপর অনেক কষ্টে ফিসফিস করে বললেন, 'হা-হার্ট...হার্ট...অ্যাটাক!'

'কোন চিন্তা করবেন না। রিল্যাক্স।'

জ্যাকবসন এসে দাঁড়াল পাশে, তার পায়ে ঠোকর লেগে কয়েকটা নুড়ি গড়িয়ে চলে গেল। অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'বেচারী! হার্ট অ্যাটাক, অবস্থা ভাল না।'

তাঁর সুস্থ হাতের নাড়ি পরীক্ষা করে দেখল সে, মাথা দুলিয়ে হতাশ ভঙ্গি করল। সুতোর মত সরু হয়ে গেছে শিরা, গতি খুবই ক্ষীণ। মরিয়া চেষ্টায় খানিকপর আরেকবার চোখ মেললেন বৃদ্ধ, তাঁর চকচকে দুই চোখের দিকে তাকিয়ে সময় এসে গেছে বুঝল রানা—কোথায় কোন সুদূরে তাকিয়ে আছেন যেন কনসাল। এ জগতের কিছু দেখছেন না বোধহয়। রক্তশূন্য ঠোঁট আরেকবার নড়ে উঠল। 'গাছ...গাছ...ক্রিস্টি...'

হঠাৎ করে নেতিয়ে পড়লেন বৃদ্ধ। যেন এই খবরটা কাউকে জানিয়ে যাওয়ার জন্যেই বেঁচে ছিলেন দীর্ঘ দশ ঘণ্টা, কাজ শেষ হতেই তাঁর পার্থিব আর সবকিছুও ফুরিয়ে গেল। ঘষা কাঁচের মত দু'চোখ তাকিয়ে থাকল আকাশের দিকে।

আলতো করে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিল ও। মনটা ভার হয়ে গেছে, নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে বুড়ো মানুষটাকে এসবের মধ্যে টেনে এনেছিল বলে। আস্তে করে টিপে তাঁর দু'চোখ বুজিয়ে দিল ও। জানে প্রয়োজন নেই, তবু বিড়বিড় করে বলল, 'মারা গেছেন।' একটু বিরতি দিয়ে মাথা দোলাল। 'বেচারী!'

'ক্রিস্টি কোথায় গেল?' খানিকপর নিজের মনে বলে উঠল বিষণ্ন জ্যাকবসন। 'অসুস্থ বুড়ো মানুষটাকে ছেড়ে কোথায় যেতে পারে?'

'নিশ্চই কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল রানা। 'ঠিক তাই,' ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। একসময় নজর আপনাআপনি স্থির হলো কাছেই পড়ে থাকা প্রকাণ্ড গাছটার দিকে। পা বাড়াল ও। 'গাছের কথা কি যেন বলছিলেন কনসাল, এসো দেখি!'

কাছে গিয়ে চারদিকে একবার ঘুরে এল ওরা, কিছুই চোখে পড়ল না। কি চিন্তা করে ঘন ডাল সরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। পরক্ষণে ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'এই তো ক্রিস্টি! চাপা পড়েছে।'

দ্রুত ভেতরে চলে এল জ্যাকবসন। বোকার মত তাকিয়ে থাকল। মোটা একটা ডালের নিচে উপুড় হয়ে পড়ে আছে ক্রিস্টিনা, দু'হাত দুই পাশে ছড়ানো। নখ রক্তাক্ত, মাটিতে আঁচড়ের গভীর দাগ। হয়তো মাটি আঁচড়ে নিজেকে ডালটার তলা থেকে বের করার চেষ্টা করেছিল। মুখের অনেকটা কাদামাটিতে ঢাকা, যেটুকু বেরিয়ে আছে, একদম চকের মত সাদা। রক্তের আভাসও নেই।

একদম অনড়। দম নিচ্ছে কি না বোঝা যায় না। ওর সারাদেহের একটা মাত্র জায়গায় কিছুটা নড়াচড়া দেখতে পেল রানা—সে হচ্ছে চুল। বাতাসে

একগোছা সোনালী চুল নড়ছে।

'বেঁচে নেই বোধহয়,' নিচু কণ্ঠে বলল জ্যাকবসন।

'শাটাপ্!' সব ভুলে প্রচণ্ড এক দাবড়ি লাগাল রানা। 'কি করে বুঝলে?'

'সরি, রানা,' অনুশোচনা ফুটল তার চেহারায়। 'ভুল হয়ে গেছে। এসো, ডাল তুলে ওকে বের করি আগে।'

আধঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর ক্রিস্টিনাকে বের করল দু'জনে। দম ফিরে পেতে সাবধানে ওকে চিৎ করল রানা, বুকে কান ঠেকাল ভয়ে ভয়ে। 'বেঁচে আছে!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল পরমুহূর্তে। 'ক্রিস্টি মরেনি!'

কি ভেবে গায়ের শার্ট খুলে ফেলল জ্যাকবসন, লম্বা একটা ডালের মাথায় ওটা বেঁধে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে সঙ্কেত দিতে শুরু করল। ব্যাপারটা বেজের চোখে পড়তে বেশ সময় লাগল। একটা কপ্টার উঠে পড়ল আকাশে।

বারো

এক ঘণ্টা আগের কথা।

ক্যাপ সারাত বেজের এয়ারস্ট্রিপে অপেক্ষা করছে বিদ্রোহী নেতা জুলিও ফ্যাভেল। তার সিনিয়র অফিসাররা আছে সাথে, এডওয়ার্ড আছে। সাগর পেরিয়ে একটার পর একটা হেলিকপ্টার আসছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

ফ্যাভেল জানত ওরা বিপদ কেটে গেলেই আসবে, এবং আমেরিকানদের কাছ থেকে কিছু আদায় করার এটাই হবে উপযুক্ত সময়, তাই বহু কষ্টে ওদের আগে আগে এসে বসে আছে সে। গ্র্যান নেগ্রিটোর ব্রিজ ভেঙে গেছে, তাই নদীর উৎসে যেতে হয়েছে তাকে প্রথমে, এক পাহাড়ী ঝরনার কাছে। ওটা পার হয়ে তবে ক্যাপ সারাত আসতে হয়েছে, বহু পথ ঘুরে।

কমোডর হ্যানসেনের প্রশংসা না করে পারল না ফ্যাভেল, ভারি কাজের মানুষ। ঝড়ের বেগ কমতেই কপ্টার পাঠিয়ে দিয়েছে। এ হচ্ছে সবে শুরু, জানে সে। এরপর আসতে শুরু করবে রিলিফ বোঝাই বড় বড় প্লেন–বেজের ধারণক্ষমতা যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ আসতেই থাকবে।

মনে মনে হাসছে ফ্যাভেল, কারণ কমোডরের জন্যে একটা চমক অপেক্ষা করছে। অবশ্য ব্যাপারটা সাময়িক। সঙ্গে একদল সৈন্য আছে তার, তাদের এনেছে সে বেজ 'দখল' করবে বলে। আসলে চালাকি–চাপ দিয়ে আমেরিকানদের বাধ্য করবে সে বেজের বাৎসরিক ভাড়া বাড়াতে। দু'দেশের চুক্তি অনুযায়ী সে চাইলে বেজ দখল করে নিতেও পারে, কিন্তু সেরকম ইচ্ছে ফ্যাভেলের নেই। বাস্তব বুদ্ধির মানুষ সে। চুক্তিতে বলা আছে, যদি কখনও মার্কিন কর্তৃপক্ষ ক্যাপ সারাত ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে যায়, তখন দেশের সরকার ইচ্ছে করলে চুক্তি বাতিল করে বেজের দখল নিয়ে নিতে পারবে।

ফ্যাভেলের এই চাতুরির পিছনে ছোট হলেও যুক্তি একটা আছে। তা হচ্ছে,

ভাড়া অনেক কম দিচ্ছে আমেরিকানরা। ত্রিশ বছর আগে যা দিত, এখনও তাই দেয়। একে ঠকানো ছাড়া আর কি বলে? কাজেই বাড়তি ভাড়া তো বটেই, এ মুহূর্তের প্রয়োজনীয় রিলিফও পাওনা হয়েছে তার সরকারের।

একটুপর কমোডর এলেন, তাঁকে দেখে হাসি মুখে এগোল সে। 'ওয়েলকাম ব্যাক টু ক্যাপ সারাত।' ডান হাত বাড়াল সে। 'আমি জুলিও ফ্যাভেল।'

'হ্যানসেন। কমোডর, ইউএস নেভি।'

বেজের কন্ট্রোল টাওয়ারে সান ফের্নান্দেজের ফ্ল্যাগ দেখেও তাঁকে না দেখার ভান করতে দেখে ফ্যাভেল বুঝল, ইশারাতেই কাজ হয়েছে। আর কিছু প্রয়োজন নেই। পরক্ষণে তাঁর কথায় তা প্রমাণও হলো।

'বলুন, মিস্টার ফ্যাভেল, দেশের এই অবস্থায় কি সাহায্য করতে পারি আমরা আপনাকে। কি চাই শুধু বলুন, এবং কোথায় চাই।'

মাথা দোলাল সে। 'সবই চাই, কমোডর। অনেক কিছু চাই। তবে প্রথমে ডাক্তার, ওষুধপত্র, কম্বল আর খাবার চাই। তারপর লার্জ স্কেলের টেম্পোরারি হাউজিঙ। তাঁবু হলেও চলবে আপাতত।'

'অবশ্যই! এই সময়ে আপনাদের সাহায্য করতে পারলে আমরা খুশি হব। মালপত্র নিয়ে পুয়ের্টো রিকো আর মায়ামিতে ট্রান্সপোর্ট প্লেন রেডি হয়ে আছে, আমি সিগন্যাল পাঠালেই রওনা হবে। এই মুহূর্তে পাঁচ কপ্টার মেডিক আছে আমার সাথে, কোথায় পাঠাব ওগুলো?'

'উত্তর নেগ্রিটোয়।'

কপাল কুঁচকে উঠল কমোডরের। 'নেগ্রিটোয়! তার মানে আপনি শহর সময়মত খালি করতে পেরেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আপনাদের সহকারী ওয়েদার অফিসার এবং তাঁর এক বন্ধুর সাহায্যে।'

'জ্যাকবসনের বন্ধু, কে সে?'

'এক বাংলাদেশী, মাসুদ রানা। ভেরি ফোর্সফুল অ্যান্ড পার্সুয়েসিভ ইয়াং চ্যাপ। আসলে তাঁর জন্যেই এখনও বেঁচে আছে সেইন্ট পিয়েরের মানুষ। নইলে আপনাদের এসব রিলিফের কোন প্রয়োজন হত না আমাদের।'

'আই সী!'

বেজের ছোট্ট হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে ক্রিস্টিনা ম্যালোরি। ওর মাথার কাছে বসা মাসুদ রানা। মুঠোয় ধরে আছে মেয়েটির একটা হাত। আধ ঘণ্টা হলো জ্ঞান ফিরেছে তার। হাড়গোড় ভাঙেনি, ঠিকই আছে সব। এখন আর ভয় নেই।

জ্ঞান ফিরতে বেঁচে থাকার আনন্দে কেঁদেছে ও, এখন কাঁদছে কনসালের মৃত্যুর খবর শুনে। এখানকার মর্গে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁর লাশ, আমেরিকানদের ব্যবস্থাপনায় দুয়েক দিনের মধ্যে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হবে। বৃদ্ধের জন্যে রানারও খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই ক্রিস্টিনাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা জোগাচ্ছে না। আসলে সে চেষ্টাই করছে না ও। স্রেফ চুপ করে বসে আছে। এত ভয়াবহ, প্রচণ্ড এক তাণ্ডবের পরও বেঁচে আছে বলে নীরবে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

জানে না, এ দেশের ইতিহাসে চিরস্থায়ী এক জাতীয় বীরের মর্যাদা পেতে

যাচ্ছে ও। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে শতাধিক ভাষায় কাল ছাপা হতে যাচ্ছে ওর একটা শহরের গোটা জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে দেয়ার অবিশ্বাস্য বীরগাথা। সেইন্ট পিয়েরের লিবারেশন নোইয়ের স্কয়্যারে যেখানে এতবছর সেরারিয়েরের ব্রোঞ্জের মূর্তি সদম্ভে দাঁড়িয়েছিল, জানা নেই, আর ক'দিন পর সেখানে বসানো হবে ওদের দুই বন্ধুর ব্রোঞ্জের মূর্তি—ড্যানিয়েল জ্যাকবসন ও মাসুদ রানার।

এসবের কিছুই জানে না রানা, শুধু জানে ভীষণ ক্লান্ত ও। জানে, এতকিছুর মধ্যেও বড় এক ব্যর্থতা রয়ে গেছে—পনেরো হাজার সরকারী সৈন্যকে রক্ষা করতে পারেনি ও। দোষ যারই হোক, ওরই সহজ-সরল এক পরামর্শকে উল্টোভাবে কাজে লাগিয়ে তাদের খতম করেছে জুলিও ফ্যাভেল। প্রাণ বাঁচানোর কোন সুযোগই পায়নি মানুষগুলো। অন্তত আত্মসমর্পণের সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল ওদের। এই দুঃখ কোনদিনও যাবে না মাসুদ রানার।

***